আবদুর রহমান আয্‌যাম

মহানবী (সা)-এর শাশ্বত পয়গাম

আবু জাফর
অনূদিত

পারিবারিক গ্রন্থাগার
তামরীনা বিনতে মুজাহিদ

এই বই প্রকাশে
যাঁরা সহযোগিতা
ও বিরোধিতা করেছেন
তাঁদের উদ্দেশে—

www.nagorikpathagar.org

This is an authorised Bengali Translation from English version (translated from Arabic by Caesar E. Farah Ph.D.) of the original book Al-Risalah Al-Khalidah by Abd-al-Rahman Azzam.

Permission to translate the book into Bengali for publication in Bangladesh has been granted to the translator by the Devin-Adair Company, Old Greenwich Conn. U.S.A.

C

Copyright for translation into Bengali and publication in Bangladesh reserved by the translator.

www.nagorikpathagar.org

মুখবন্ধ

এই গ্রন্থের লেখক ইসলামী বিশ্ব ও আরবদের দৃষ্টিতে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। আরব লীগের জনক ও প্রথম সেক্রেটারী জেনারেল হিসেবে তিনি আরব জাহানের ঐক্য ও শক্তিকে এমনভাবে জোরদার করেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ বছরগুলিতে পুরান দেশগুলিতে একটা নব-জীবনের সূচনা হয়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, আযযাম পাশার নেতৃত্বের বছরগুলি (১৯৪৫-১৯৫২) ছিল বলিষ্ঠ আশা এবং ব্যাপক ও আন্তরিক উচ্চাভিলাষের কাল। এরপর থেকে এতে ভাটা পড়তে শুরু করে। শতাব্দীর পুরান অথচ চিরনতুন প্রতিজ্ঞা, যা তাঁর এ গ্রন্থটিকে প্রকাশ লাভ করেছে একটি বিশেষ আঙ্গিকে, তা হলো ইসলামের আন্তর্জাতিকতা, একতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের অঙ্গীকার।

বস্তুত আরব লীগের প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আযযাম তাঁর লোকদের কাছ থেকে আরও বহু বিষয়ে কৃতজ্ঞতার দাবিদার। ভূ-মধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকার ইসলামী দেশগুলির জন্য তিনি অবিরাম কাজ করেছিলেন, একের অধিক দেশ বা এলাকা তা স্মরণ করে। এ গ্রন্থে আলোচিত যে আদর্শটি আযযাম তাঁর নিজের জীবনেই রূপায়িত করেছেন, তা হলো—কোন ইসলামী রাষ্ট্রের যে কোন নাগরিক সকল ইসলামী রাষ্ট্রেরই নাগরিক। এই আন্তর্জাতিকতাবাদ—যা ইসলামী বিশ্ব ও বিশ্ব সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত প্রেরণা, তা কয়েক দশক ধরে তাঁর অনন্যসাধারণ ব্যাপক প্রচেষ্টাকে বিপুল অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে, যদিও সম্ভবত এ বিষয়ে বর্তমানের মত অতটা স্পষ্ট বক্তব্য তিনি পূর্বে রাখেননি। বালক অবস্থাতেই তিনি তুরস্কের পক্ষে (অর্থাৎ ইসলামের জন্য) বলকান যুদ্ধে যোগদানের জন্য পালিয়ে যান, লিবিয়ার মরুভূমিতে তিনি আট বছর ধরে ইতালীর বিরুদ্ধে লড়েন, মিসরের আইন সভা ও কূটনীতির ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন, বর্তমানে তিনি কতিপয় জটিল আলোচনায় সৌদী আরবের বাদশাহ্র প্রতিনিধিত্ব করছেন। দামেশক, জাকার্তা, ইস্তাম্বুল ও বাগদাদে এই ব্যক্তি একজন সাহসী পুরুষরূপে এবং মনের প্রসারতার জন্য সুপরিচিত। আশু তাঁর হাতে যত জরুরী কাজ থাকুক না কেন, যুদ্ধ যত নাজুক পর্যায়েই উপনীত হোক না কেন, তাঁর ঐতিহ্যগত ধর্মীয় চিন্তা চর্চার জন্য, কুরআন ও তার ব্যাখ্যা পাঠ করার জন্য এবং নবী করীম (স)-এর আদর্শ অনুধাবনের জন্য আযযাম সময় করে নিতেন। অতীত দিনের মুসলমান মুজাহিদগণ, যারা পাশ্চাত্যবাসীর কাছে গাযী সালাহ্উদ্দীনের ভাবমূর্তির

www.nagorikpathagar.org

'The Eternal Message of Muhammad' বইখানা পড়ার পর তা বাংলায় অনুবাদ করার ইচ্ছা জাগে। সহকর্মী ও বন্ধু জনাব মাহবুবুল হক এ কাজে আমাকে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর অবদানও আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় জনাব হাফেজ মঈনুল ইসলাম এবং বন্ধুবর জনাব আজিজুল ইসলাম ও জনাব শেখ ফজলুর রহমান যে কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। এঁদের সবার কাছ থেকেই আমি সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতা পেয়েছি। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

অনুবাদ কাজে আমার স্ত্রী কুম-কুম-এর নীরব সাধনাও জড়িয়ে রয়েছে। তার অবদানকেও আমি অস্বীকার করতে পারছিনে।

জগত-জোড়া প্রসিদ্ধ এ বইখানির ভাষান্তরের সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। পাঠকদের কাছে তা সমাদৃত হলে আমার শ্রম সার্থক হবে।

ঢাকা
২৩শে জুন, ১৯৮০

আবু জাফর

www.nagorikpathagar.org

প্রকাশকের কথা

আরব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারী জনাব আবদুর রহমান আয্‌যাম বর্তমান শতকের একজন খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর রচিত 'আল-রিসালা আল-খালিদা' বইটি প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথেই ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়। ফলে এটি সুবিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা 'মেন্টর বুকস্' ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করে। ইংরেজী অনুবাদে এটির নাম রাখা হয় 'দি ইটার্নাল ম্যাসেজ অব মুহাম্মদ'। ইংরেজী ভাষায় অনুবাদের ফলে বইটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিন্তা-জগতকে সমভাবে আলোড়িত করে। এই বইটিতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর জীবনাদর্শের নানাদিক তুলে ধরে তাঁর বাণীর মৌলিক নীতি, পরিকল্পনা, মূল্যবোধ, সুভ্রাতৃত্ব, সংহতি, ন্যায়বিচার ইত্যাদি বিষয়েও গভীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ইসলামী রাষ্ট্রের মৌল উপাদান, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, চুক্তি, ন্যায় যুদ্ধ, ইসলামী বিধানে যুদ্ধের নিয়মাবলী ও যুদ্ধকালে শিষ্টাচার, পরস্পরের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায়, কৌশল ও এসবের রূপরেখা কী এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। মোট কথা, সুমহান ইসলাম মানব জাতিকে যে সভ্যতা দান করেছে তা কিভাবে সংরক্ষণ করা যাবে এবং ইসলামী জীবন বিধানের উপাদানের আলোকে একটি সামগ্রিক বিশ্ব সভ্যতা গড়ে তোলা যাবে তারও নির্দেশনা রয়েছে এ বইটিতে। বইটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' নামে ১৯৮০ সালে প্রথম প্রকাশ করে। বাংলা ভাষায় এটি অনুবাদ করেন বিশিষ্ট লেখক জনাব আবু জাফর। এই বইটি বর্তমানে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করা হচ্ছে।

আমরা আশা করি এবারও এটি আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
প্রকাশনা বিভাগ

www.nagorikpathagar.org

অনুবাদকের কথা

আরবী ভাষায় লিখিত জনাব আবদুর রহমান আয্যামের 'আল-রিসালা আল-খালিদা' গ্রন্থখানি Mr. Caesar E. Farah Ph.D. ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করেন এবং অনূদিত গ্রন্থের নামকরণ করেন The Eternal Message of Muhammad. 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' উক্ত অনূদিত গ্রন্থেরই বঙ্গানুবাদ।

ইসলামের সাম্য, মৈত্রী, যুদ্ধ, সন্ধি, গণতন্ত্র, ভ্রাতৃত্ব তথা এই বিশ্বে শান্তির সমাজ গড়ে তোলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলো এবং একই সাথে বর্তমান বিশ্বে অশান্তির কারণ ও তা দূরীকরণের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে এ গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। শুধু মুসলমানের কাছে নয়, বাংলা ভাষাভাষীদের কাছে এ গ্রন্থখানি বিশেষভাবে সমাদৃত ও তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অধ্যাপক শাহেদ আলীর সুপারিশ মুতাবিক এই গ্রন্থখানির নামকরণ 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' করা হয়েছে। তাঁরই পরামর্শক্রমে আমি প্রকাশক Devin-Adair Company-র কাছ থেকে বইখানা বাংলায় অনুবাদ করার অনুমতি গ্রহণ করি। 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সহকারী সম্পাদক, গবেষক ও চিন্তাবিদ জনাব আখতার-উল-আলম বইখানির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম অধ্যায় 'হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন-বৃত্তান্ত'-এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রাক্তন পরিচালক জনাব আহমদ হোসাইন। বইখানির সম্পাদনার দায়িত্ব যাঁরা পালন করেছেন, তাঁরা আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। এই দায়িত্ব তাঁদের ওপর ন্যস্ত হওয়ায় আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি। বইখানির অস্তিত্বের সাথে তাঁদের সবার নাম জড়িত থাকা উচিত– সবার অবদান আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

www.nagorikpathagar.org

মাধ্যমে পরিচিত, খাঁটি ইসলামী আদর্শে তাঁদের চিন্তা ও কর্মধারাকে আয্‌যাম তাঁর জীবনে সমন্বিত করেছিলেন।

আয্‌যাম পাশা—যদিও এ ধরনের খেতাব বর্তমানে অবলুপ্ত—তবুও আমরা অভ্যাসবশত তাঁর নামের সাথে এ খেতাবটি যুক্ত করে আয্‌যাম পাশা নামে তাঁকে স্মরণ করি। মিসরের এক জমিদার পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বহু শতাব্দী পূর্বে আরব উপত্যকায় এ পরিবারের উদ্ভব হয়। তাঁর পরিবার বহু আগে থেকেই সংসদীয় সরকার চালু করে এবং মিসরীয় ব্যবস্থাপক সভায় সব সময়ই একজন আয্‌যাম থাকতেন। আয্‌যাম সব সময়ই মিসরীয় সংসদীয় গণতন্ত্রের শক্তি ও প্রাণবন্ততার উপর জোর দিয়ে থাকেন, কারণ তাঁর মতে এক শতাব্দী পূর্বে এই পদ্ধতিই ছিল অত্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মিসরীয়দের রাজনৈতিক অধিকার প্রকাশের পক্ষে তা ছিল একটা স্বাভাবিক মাধ্যম। এই কথাটি প্রায়ই বিস্মৃতির তলে পড়ে যায়। বৃটিশ আধিপত্যকালীন দলিত মথিত এই গণতন্ত্র রক্ষার জন্য তিনি অস্ত্র আর উট নিয়ে মরুভূমিতে খোলাখুলি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর প্রথম দিককার কয়েকটি বছরের কৃতিত্বের কথা লিবিয়ায় বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এই দেশটি তিনি নিজের দেশের মতই মনে করতেন। আরও কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের মত লিবিয়ার জাতীয় জাগরণে তাঁর যে অবদান, তার মূল্যায়ন এখনও সম্যকভাবে করা হয়নি।

প্রায় সাতাশ বছর আগে কায়রোতে আমি প্রথম আবদুর রহমান আয্‌যামের সাথে পরিচিত হই আমাদের পুরান বন্ধু জর্জ এ্যান্টোনিয়ামের সৌজন্যে। জর্জ এ্যান্টোনিয়াম ('আরব পুনর্জাগরণ' গ্রন্থের লেখক) তখন আমাকে বলেছিলেন এবং তিনি নিজেও বিশ্বাস করতেন যে, আয্‌যাম আরব বিশ্বের জন্য একটি নতুন আশার আলো। তেজস্বী আয্‌যাম—যাঁকে একটি উষ্ট্রারোহী বাহিনীর নেতৃত্বে ধাবমানরূপে কল্পনা করা সহজ ছিল—তিনি তখন আইনসভা ত্যাগ করে কূটনীতির নবজীবন শুরু করতে যাচ্ছিলেন এবং বাগদাদ ও তেহরানে মিসরের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছিলেন। সেইখানেই তিনি সম্ভাব্য মুসলিম ঐক্যের উপায় আবিষ্কারে আত্মনিয়োগ করেন, তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্যরূপে নয় বরং প্রান্তিক লক্ষ্যরূপে। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর এ চিন্তাধারা আরব লীগের গঠনতন্ত্রে প্রকাশ লাভ করে। তখন থেকে বিভিন্ন স্থানে ও বিভিন্ন সময়ে—অনেক সময় ঘন্টার পর ঘন্টা আয্‌যামের সাথে আলোচনা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমাদের প্রতিটি আলোচনা ছিল আলোকবর্তিকাস্বরূপ। যেমন ফ্রাঙ্কলিন সম্পর্কে জেফারসন বলেছিলেন, "আমি তাঁর সান্নিধ্যে এসে তেজোদ্দীপ্ত না হয়ে কখনও ফিরে যাই না" আয্‌যাম যখন আরব লীগের অফিস পরিচালনা করতেন, তখন প্রশাসনিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি ব্যাপারে তাঁর অনেক সময় ব্যয় হতো সত্য কিন্তু বৃহত্তর

www.nagorikpathagar.org

পরিপ্রেক্ষিতে গবেষণা, গভীর চিন্তা ও পর্যবেক্ষণের জন্য তিনি সাধারণ প্রশাসনিক কর্মব্যস্ততা থেকে তাঁর মন-মগজকে মুক্ত করতে সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। তাঁর মন কখনও কিছুতে আটকা পড়ত না, ইচ্ছাক্রমেই তিনি উঠে আসতে পারতেন। আমি প্রায়ই মনে করতাম, কুরআন ও তার ব্যাখ্যা পাঠ করার ফলে ইসলামী নীতি ও দর্শন বিশ্লেষণের ফলশ্রুতিরূপে তিনি এ বস্তু নিরপেক্ষতার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন—যা সাধারণ প্রশাসন কর্মীদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায় না। এ পুস্তকের পাঠকগণ লক্ষ্য করবেন, কুরআনের বাণী উদ্ধৃত করে এবং তার উপর স্থির থেকেও তিনি তার তাৎপর্য সম্বন্ধে আপন অনুসন্ধান চালিয়েছেন এবং এভাবে তিনি আধুনিক বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ইসলামী মতবাদের উদ্ভাবন করেছেন। তিনি বলেন, শব্দসম্ভারের অপ্রতুলতার জন্য ইংরেজী ভাষায় কতক ইসলামী ধ্যান-ধারণার ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণ করা সব সময় সহজ নয়। অথবা বলা যায়, সেসব ধারণা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত ইংরেজী পরিভাষা খুবই সূক্ষ্ম। রাষ্ট্র, জাতীয়তা ও নাগরিকত্বের ধারণা, এমন কি আইন সম্পর্কীয় ধ্যান-ধারণার একটা সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা এবং বাচনভঙ্গি ইংরেজীতে আছে যা মুসলিম চিন্তাধারার প্রকাশভঙ্গির সাথে হুবহু মেলে না। কারণ মুসলিম চিন্তাধারার সূত্রগুলি একটি বিশ্বাসের আওতায় স্থাপিত, আন্তর্জাতিক সমাজ ব্যবস্থার চেতনায় নিবিড়ভাবে সন্নিবিষ্ট। আধুনিক পরিভাষায় এই চেতনাকে প্রকাশ করে আয্যাম আরও একটি অবদান রেখেছেন যার কৃতিত্ব একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য।

একটি মহৎ জীবনের অপরাহ্নে একজন সম্ভ্রান্ত আরববাসী এবং গভীর চেতনাসম্পন্ন ইসলামী বিশ্বনাগরিক আমাদেরকে তাঁর অভিজ্ঞতা, গবেষণা এবং জ্ঞানের অংশীদার করার পক্ষে কিছু সময় পেয়েছেন। আমরাই লাভবান হয়েছি। বহু বছর গত হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে এমন মর্মস্পর্শী আলোচনা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি। নিশ্চিতভাবেই আমরা অনুভব করি, যে বিশ্বাসটি তাঁকে চিরজীবন অনুপ্রাণিত করেছে, আয্যাম সর্বোপরি সেই বিশ্বাসেরই খিদমত করেছেন।

ভিনসেন্ট শিয়ান
(Vincent Sheean)

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

গ্রন্থাকারে 'The Eternal Message of Muhammad' লেখার কোন পরিকল্পনা আমার ছিল না। মূল প্রবন্ধগুলো লেখার আমার উদ্দেশ্য ছিল ঃ মুসলমানদের জন্য, তাদের সমাজ, বিশ্বাস এবং ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত আইনের কতিপয় মৌলনীতি ও উৎস সম্বন্ধে ধারণাপুষ্ট করে তোলা এবং তাদের পয়গম্বরের জীবন সম্পর্কে তাদের অবহিত করা। ইসলামের পক্ষে কৈফিয়তের ভঙ্গিতে কিছু বলা বা অমুসলিমদের মধ্যে ধর্ম প্রচার আমার উদ্দেশ্য ছিল না।

হয়ত বা জড়বাদী চিন্তাধারার ভয়াবহতা আমাকে এ কাজে উৎসাহিত করেছিল। কারণ ইতিমধ্যেই ইউরোপের কয়েকটি দেশের প্রাচীনতর সংস্কৃতি বস্তুবাদের আঘাতে মৃত্যুবরণ করেছে।

খৃস্টান ঐতিহাসিক C. H. Dawson লিখেছেন, "ইসলাম যুগপৎভাবে একটি সংস্কৃতি ও একটি ধর্ম। ধর্ম থেকে আলাদা করে ইসলামী সংস্কৃতির কথা চিন্তা করা যায় না।" ফলে মুসলমানরা তাদের ধর্মকে হারিয়ে ফেললে একই সাথে তাঁদের সংস্কৃতিকেও তাঁরা হারান এবং এভাবে তাঁরা একটা সামাজিক বিপর্যয় বা ভাঙনের মুখে পতিত হন। তাছাড়া যে আরব জাতিটা (আমি যার অন্তর্ভুক্ত) ইসলামী সংস্কৃতি, জাতি, একটি মানবগোষ্ঠী অনিবার্য ভাঙনের পরিণতি হিসেবে তার অস্তিত্বই বিলোপ হয়ে যাবে।

সুতরাং বেঁচে থাকার গরজে আমাদের প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, আমাদের সমাজকে বিজাতীয় সংস্কৃতির আঘাত থেকে রক্ষা করা, বিশেষ করে, সেই সব সংস্কৃতির প্রভাব থেকে, 'বস্তুবাদ' যাদেরকে গ্রাস করে ফেলেছে।

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে মুসলমান সমাজ ও তাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ইউরোপীয় সংস্কৃতির আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে। ফলে মুসলমানদের জীবনাদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর বস্তুবাদের যে প্রভাব পড়েছে, তা সব সময় তাদের স্বার্থের অনুকূল হয়নি। ইউরোপীয় সংস্কৃতি যে পুরাতন ধর্ম ও কৃষ্টির সাধারণ দৃশ্যপটে উদ্ভূত হয়েছে, মুসলিম সমাজও সেই একই উৎস থেকে অনুপ্রেরণা ও শক্তি সঞ্চয় করেছে। বস্তুত কুরআনে স্বীকৃত হয়েছে যে ইসলাম, খৃস্ট ধর্ম ও য়াহূদী ধর্ম অনুরূপ উৎস থেকে উদ্ভূত যাতে তাদের একটি সাধারণ মিলনক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ (পূর্ব ও পশ্চিম) তার উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া কয়েক শতাব্দীর সনাতন ধর্মীয় কৃষ্টিকে ক্রমশ ভুলে গিয়ে আজকের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি সাফল্যে গর্বিত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে। বর্তমান বিশ্বের একটা বড় অংশই তার নিজের প্রতিমূর্তিকে পূজা করছে। অপরপক্ষে 'মার্কসীয়' সমাজতন্ত্রবাদ ও কল্যাণমূলক ধনতন্ত্রবাদ একইভাবে পাশ্চাত্যে ও সাম্যবাদী প্রাচ্যে জড়বাদী আদর্শ ও দর্শনকে একেবারে ধর্মীয় বিশ্বাসে পরিণত করেছে।

য়াহূদী, খৃস্টান, মুসলিম তথা সমগ্র বিশ্বের একটি বিপুল মানবগোষ্ঠী তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করে সেখানে একটা মূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং তাঁকে সবাই নতজানু হয়ে পূজোপহার দিচ্ছে। এই মূর্তিটার নাম হলো 'উন্নত মানের জীবন' (A high standard of living)। বর্তমানে এই বস্তুবাদী জগতে এই জিনিসটা সবার কাছ থেকেই সমান শ্রদ্ধা পাচ্ছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—এই উভয় দিক থেকে এ বিগ্রহের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ও টানের মধ্যে থেকেও মুসলমানরা 'বস্তুবাদ' নামক বিগ্রহের প্রতি আকৃষ্ট হতে ইতস্তত করছে। তাহলেও 'উন্নত মানের জীবন' যাপনের সম্ভাবনায় তাঁরা কিছুটা আকৃষ্ট না হয়ে পারছেন না।

আমাদের কিছু কিছু লোককে বস্তুবাদী বিশ্বাসে দীক্ষিত করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বেশির ভাগ মুসলমানই এখনও এ ব্যাপারে মনস্থির করে উঠতে পারেননি। কারণ তাঁরা অনন্তকাল ধরে জেনে আসছেন যে, তাঁদের আলাদা একটা ধর্ম আছে—আছে তাঁদের জন্য একটা ঐশ্বরিক বিধান, একটা আলাদা সমাজ ও রীতিনীতি, যার সমন্বয়ে এমন একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে যেটা একেবারে ধর্মনিরপেক্ষও নয় আবার পুরোহিততন্ত্রও নয় বরং সম্ভবত এ দুটোর সংমিশ্রণ। তাই রাষ্ট্র স্বৈরতান্ত্রিক বা গণতান্ত্রিক নয়। মুসলিম সমাজ সাম্য ও ব্যক্তি স্বাধীনতার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতপক্ষে, মুসলিম সমাজ স্বাধীন ও শ্রেণীবিহীন। এই শ্রেণীহীনতার কারণ কোন অর্থনৈতিক মতবাদ নয়। এর ভিত্তি হচ্ছে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভিত্তির আইন ও বিধান। এই বিধান ঐশ্বরিক আইনের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যবোধ ছাড়া অন্য কোন সামাজিক বৈষম্য বা সম্মানকে স্বীকৃতি দেয় না এবং এর মূলনীতি হলো সার্বজনীন, মানবিক ও গণতান্ত্রিক। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য আজ যা প্রচার করছে, মুসলমানদের কাছে তা নতুন কিছু নয়। মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মতবাদ যাচাইয়ের জন্য যুক্তির প্রয়োগই গোড়ার কথা। স্বাধীনভাবে যুক্তির ব্যবহার মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রের চারটা উৎসের একটা অন্যতম উৎস।

সুতরাং যখন মুসলিম জনগণকে বলা হয়, এ সমস্ত আধুনিক মতবাদ হচ্ছে বিজ্ঞানের চরম উন্নতি ও অত্যাধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার ফল, তখন তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁরা তখন নিজেদেরকে প্রশ্ন করেন : বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার অবদানকে

www.nagorikpathagar.org

উপভোগ করার জন্য সত্যিই কি বিশ্বস্রষ্টাকে ত্যাগ করতে হবে ? আধুনিক সভ্যতার অবদান উপভোগ করতে হলে সত্যি সত্যিই কি তাদের প্রিয় নবীকে পরিত্যাগ করতে হবে ? বর্জন করতে হবে কি তাঁদের সহনশীল সার্বজনীন সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধকে? মানবিক সমাজ ব্যবস্থা ও সহজ অনাড়ম্বর জীবন ব্যবস্থাও কি তাঁরা ত্যাগ করবেন ? সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ই মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা এবং তাঁরই আয়ত্তে মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—একথাও কি তাঁরা অবিশ্বাস করবেন ? তাঁরা বিশ্বাস করতে রাযী নন যে, মানব জাতির ভবিষ্যৎ বা তাদের ইতিহাস একটি শ্রেণীবিহীন সমাজ ব্যবস্থা প্রবর্তনের গরজে শ্রেণী-সংগ্রাম নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। তাঁরা এ-ও বিশ্বাস করতে রাযী নন যে, ইতিহাসের পূর্ণত্ব বা মানব জাতির ভাগ্য বস্তুবাদী আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এই অনন্ত বিশ্ব এ ধরনের একটা অর্থনৈতিক মতবাদ বা উন্নত মানের জীবন যাপনের আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে প্রস্তুত হয়ে রয়েছে—এই অবাস্তব দাবি মুসলমানদের বুদ্ধিতে অকল্পনীয়। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন আবহমান কাল থেকে যাঁদের সুখ-দুঃখের তারা অংশীদার, যাদের সাথে তাঁরা এতদিন সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে চলে আসছেন—তাঁরা কি তাঁদের সেই সংহতি এবং পারস্পরিক কল্যাণকামী সমাজ ব্যবস্থা ত্যাগ করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নাস্তিক সমাজ ব্যবস্থার গড্ডলিকা প্রবাহে শরীক হওয়ার জন্য সবেগে ধাবিত হবেন ?

বিশ্বের ষাট কোটি মুসলমানের মধ্যে যাঁরা সচেতন ও দায়িত্বশীল, ভাষা বা বর্ণ তাঁদের যাই হোক না কেন, তাঁদের মনে আজ এসব প্রশ্ন তোলপাড় করছে। এই পুস্তকে আমি এরূপ প্রশ্নের কতক জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

ইসলাম য়াহূদীবাদ থেকে আলাদা। আল্লাহ্র কাছে সার্বজনীন আত্মসমর্পণের জীবন ব্যবস্থা ইসলামে কোন বিশেষভাবে 'মনোনীত জাতি' বা আল্লাহ্র সাথে নির্দিষ্ট 'চুক্তি' রূপ ধারণা স্থান পায়নি। খৃস্টানদের 'স্বর্গে আল্লাহ্র রাজত্ব' এবং মর্ত্যে 'সিজারের রাজত্ব' ইত্যাকার মতের সাথেও মুসলমানদের মতপার্থক্য লক্ষণীয়। হিন্দু, বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্ম থেকেও ইসলাম ধর্ম আলাদা। ইসলাম একটা বিশ্বাস, একটা বিধি, একটা জীবন বিধান, একটা 'জাতি' এবং একটা 'রাষ্ট্র'। এর একটা আইনশাস্ত্র আছে, যা বিশ্বের শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে এবং আল্লাহ্র সার্বভৌমত্বের আওতায় মানবজাতির চাহিদা মেটাতে গিয়ে ক্রমাগতভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। ইসলাম-সম্মত 'পৃথিবীতে আল্লাহ্র রাজত্ব'—ইসলামের বিশ্বাস, আইন, সমাজ, রাষ্ট্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির সমন্বয়ে যে আল্লাহ্র রাজত্ব তা পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতি এবং উপায় বিশেষ।

অন্যান্য ধর্মের বিশেষত, খৃস্ট এবং য়াহূদী ধর্মের অনেক বিশ্বাস এবং অনুশাসনে মুসলমানরা বিশ্বাসী বটে, কিন্তু তাঁদের জীবন বিধানের সাথে আধুনিক বস্তুবাদভিত্তিক

www.nagorikpathagar.org

ভাবধারার সাধারণ মিলনক্ষেত্রের পরিধি খুবই সীমিত। ইসলাম স্বীকার করে যে, ইহজগতের গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে কিন্তু তা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কেন ? কেন এমন একটি জীবনাদর্শ গ্রহণ করতে হবে, যার অনুষ্ঠানাদি কেবল অর্থনীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ? এ ধরনের আদর্শের সাথে ইসলামের আপসের কোন সম্ভাবনা নেই ; কারণ ইসলাম একাধারে একটা ধর্ম, একটা সংস্কৃতি, একটা জীবন বিধান ও স্বতন্ত্র আইনশাস্ত্রসহ একটা অবিভাজ্য জাতি। আমি এ পুস্তকে এই কথাই তুলে ধরবার চেষ্টা করেছি, ইসলামের শ্রেণীহীন সমাজ সম্পূর্ণ একটা আলাদা দর্শন থেকে উদ্ভূত। কিছুতেই ইসলাম তার অবিভাজ্য সংস্কৃতি ও বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে কোন পরিকল্পিত অর্থনীতি গ্রহণ বা তথাকথিত কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের আদর্শের সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। ইসলামের প্রতিষ্ঠানগুলো অনন্যসাধারণ, এগুলি কোন বস্তুবাদী অন্ধবিশ্বাসের সাথে আপস-রফা করতে পারে না। ব্যক্তিগত জীবনের শুচিতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, প্রত্যেকটি আত্মীয়ের কল্যাণে ব্রতী পাকাপোক্ত বন্ধনে আবদ্ধ পরিবার এবং একটি শ্রেণীবিহীন কল্যাণকামী সমাজ—এই ভিত্তিগুলির ওপর ইসলাম সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত।

The Eternal Message of Muhammad বইখানাতে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদান কিছু না থাকলেও আজকের জগতের জীবন-জিজ্ঞাসাগুলির উত্তরে মুসলিম পক্ষের বক্তব্যগুলোকে তুলে ধরবার একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা এতে রয়েছে। ১৯৪৬ সালে প্রথম বইখানা প্রকাশিত হয় আরবী ভাষায়। পরে মুসলিম পণ্ডিতগণ কর্তৃক বইখানা অনূদিত হয়ে ইন্দোনেশিয়া ও তুরস্কে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে কায়রোতে এর দ্বিতীয় আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয়, যাতে মুসলিম রাষ্ট্র ও সংবিধান শীর্ষক একটি নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়। বর্তমান ইংরেজী ভাষায় অনূদিত আমি সরাসরিভাবে ইংরেজীতে লিখিত রসূলুল্লাহ্‌র জীবনীর ওপর আর একটা অধ্যায়সহ কতিপয় ব্যাখ্যা ও নোট সংযোজন করেছি। এ বই সম্বন্ধে যা কিছুই বলা হোক না কেন, এর কোন তথ্য সম্পর্কে এ পর্যন্ত কোন মুসলিম দেশের কোন মুসলিম আইনবিদ কোন বিতর্ক তুলেছেন বলে আমি জানতে পারিনি।

নিউইয়র্ক সিটি

আবদুর রহমান আয্যাম

www.nagorikpathagar.org

প্রসঙ্গ কথা

আবদুর রহমান আয্যাম রচিত ও আবু জাফর অনূদিত 'মহানবীর শাশ্বত পয়গাম' পুস্তকখানি যখন সম্পাদনা করেছিলাম, তখন ঘটনাচক্রে জনৈক বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক লেখকের একটি রচনা নজরে পড়ে। রচনাটি পড়ে অবাক হলাম এ কারণে যে, গতযুগে পাশ্চাত্য জগৎ ইসলাম, মহানবী (স) ও কুরআন সম্পর্কে এ ধরনের অনেক আজগুবী ধারণাই পোষণ করত। এ যুগে এসে পাশ্চাত্যবাসীরা নিজেরাই যেখানে সেসব ধারণা ত্যাগ করে নতুনভাবে ইসলামকে চিনতে ও বুঝতে চাইছে, সেখানে কম্যুনিস্ট বিশ্বের একজন খ্যাতনামা লেখক ইসলাম সম্পর্কে সেই বাতিল যুগের ধ্যান-ধারণা নিয়ে কেন মানুষকে ধোঁকা দিতে চাইছেন। কেন এই চেক লেখক পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট ইতিহাস অস্বীকার করে বলতে চেয়েছেন যে, কুরআন এক সময়ের একাধিক লোকের রচনার সমাহার। প্রসঙ্গত, উক্ত চেক লেখক ইসলাম, মহানবী (স) ও কুরআন সম্পর্কে লেনিন, মার্কস ও এঞ্জেলস্-এর বহু সংখ্যক বিদ্বেষপূর্ণ, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর বক্তব্য তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, আধুনিক বিশ্বে ইসলামের যে জাগরণ, তা স্থায়ী হতে পারে না, স্থায়ী হবে শুধু কম্যুনিস্টদের মিথ্যাচার।

চেক লেখকের ওই রচনাটি পড়ছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম—ভদ্রলোককে যদি আবদুর রহমান আয্যামের এ বইটি একবার পড়াতে পারতাম। কিন্তু সে আশা কি পূরণ হতে পারবে ? মনে পড়ছিল, ষাট দশকের দিকে এই ঢাকায় এসেছিলেন অন্যতম চেক লেখক ও গবেষক ডঃ দুসান জবোভিতেল। সে সময়ে তাঁর সাথে আলোচনায় তাঁকে দিয়ে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ইসলাম চর্চার ওপর ইংরেজীতে একটি নিবন্ধ রচনা করাতে পেরেছিলাম। রচনাটি তদানীন্তন ইসলামিক একাডেমীর মুখপত্র মাসিক 'দিশারী'তে তরজমা করে ছেপেও দিয়েছিলাম। ডঃ দুসানের অনুসন্ধিৎসার সাথে আলোচ্য চেক লেখকের গোঁড়ামির পার্থক্য সহজেই বোধগম্য। কিন্তু যে কথা বলছিলাম—আল্লামা আয্যামের এ বইটি The Eternal Message of Muhammad নামে এটি আরবী থেকে ইংরেজীতে তরজমা করেছেন সিজার ই. ফারাহ পি-এইচ. ডি.। ইংরেজী পুস্তকখানির ভূমিকা লিখেছিলেন ভিনসেন্ট শিয়ান। এটি একই সঙ্গে লণ্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে 'মেন্টর বুক' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল। আয্যাম ছিলেন আরব লীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং ১৯৪৫-১৯৫২ সাল পর্যন্ত

www.nagorikpathagar.org

তিনি ছিলেন এই আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল। নিউইয়র্ক টাইমস এই পুস্তকের আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন ঃ One of the great statesmen of contemporary Islam। ওয়ার্লড এ্যাফেয়ার্স ম্যাগাজিন এ পুস্তকের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন ঃ A very penetrating and stimulating book, আর মেন্টর বুকস প্রকাশক এই পুস্তকের ব্যাক কভারে একে আখ্যায়িত করেছেন A great Islamic classic বলে। সেজন্যই বলছিলাম, চেক কম্যুনিস্ট লেখককে যদি এ বইখানি পড়াতে পারতাম। কিন্তু চেক কম্যুনিস্টরা না পড়ুক, এদেশের মুক্ত মন ও অনুসন্ধানী দৃষ্টির অধিকারী বলে খ্যাত তরুণ-তরুণীরা যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে এ বইটি পড়েন, তাহলে তাদের মনের অনেক ধাঁধা কেটে যাবে, অনুসন্ধানের বহু অজ্ঞাত এলাকায় সত্যের আলোক প্রতিফলিত হবে এবং দৃষ্টির ঘোরও যাবে কেটে। কিন্তু এ বইটি পড়ার মত সৎসাহস তাদের হবে কি ? যদি সে সৎ সাহস কারো থাকে, আমি এ পুস্তকখানি দিয়েই তাদেরে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তাঁরা আয্‌যামের অনুরক্ত ভক্তে পরিণত না হয়ে পারবেন না।

আমি নিজে আয্‌যামের একজন নগণ্য অনুরাগী। যদিও তাঁর কিছু কিছু রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে আমার ভিন্ন মত রয়েছে। একজন ইসলামী চিন্তাবিদ হিসাবে আধুনিক বিশ্বে ইসলামকে তুলে ধরার ব্যাপারে আয্‌যাম যে ভূমিকা পালন করেছেন এবং যে অবদান রেখেছেন, মনে হয় খুব কম লেখকের পক্ষেই তা সম্ভব হয়েছে। আমার যতটুকু ধারণা হয়েছে, সৈয়দ আমীর আলীর 'স্পিরিট অব ইসলাম'-এর পরে আয্‌যামের এ পুস্তকখানি আর একটি 'মাইল স্টোন'। সৈয়দ আমীর আলীর মতই আয্‌যামের এ্যাপ্রোচ বহুলাংশে ব্যতিক্রমধর্মী, যেমন তাঁর বাকভঙ্গি তেমনি তাঁর যুক্তি ও পাণ্ডিত্য। অবশ্য আলোচ্য পুস্তকের পাঠককে এসব জানতে হবে এ অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদ যদিও অনুবাদ মাত্র—মূল নয়, তবুও সেটুকু জানা থেকেই পাঠক আল্লামা আয্‌যামের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হতে সক্ষম হবেন। বলা অনাবশ্যক যে, আবু জাফরের এ বহু পরিশ্রমের তরজমা সম্পাদনার দায়িত্ব নিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করেছি একমাত্র এ কারণেই। অনেক ক্ষেত্রে আবু জাফরের তরজমা আমাকে ডঃ ফারাহ্ অনূদিত ইংরেজী পুস্তকের ভাব ও ভাষার অন্তরালে বিধৃত বক্তব্য বুঝতে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। আবু জাফরের হাত মিষ্টি। তরজমা বেশ ঝরঝরে। কোন কোন ক্ষেত্রে সরলীকরণের ঝোঁক দেখা গেছে—তবে তা বাংলা ভাষার নিজস্ব রীতির কারণেই হয়েছে এবং এতে করে অনূদিত পুস্তক হয়েছে আরও হৃদয়গ্রাহী ও সহজবোধ্য। সম্পাদনাকালে অনেক ক্ষেত্রে আমাকে তেমন কোন বেগ পেতে হয়নি। বহু ক্ষেত্রে আবার এত বেশি বেগ পেতে হয়েছে যে, হিমশিম খেয়ে গেছি। কিন্তু বেশির ভাগ

www.nagorikpathagar.org

ক্ষেত্রেই যেটা লক্ষ্য করেছি, তা হলো বিভিন্ন ধরনের কায়দা কোশেশ করে শেষ পর্যন্ত আবু জাফরের তরজমাকেই নিখুঁতভাবে রেখে দিতে হয়েছে। সুতরাং সুবিখ্যাত এই পুস্তকের এই বাংলা অনুবাদের ব্যাপারে যাবতীয় কৃতিত্ব আবু জাফরের প্রাপ্য। আর এর মধ্যে যদি কোন দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা বা ব্যর্থতা থেকে থাকে, তবে তা একান্তভাবে আমার। পুস্তকখানি বাংলা ভাষায় ইসলামী চিন্তাধারার ক্ষেত্রে এক মূল্যবান সংযোজন হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ইতি।

সম্পাদকীয় বিভাগ
দৈনিক ইত্তেফাক
ঢাকা
২৫ জানুয়ারী, ১৯৮০

আখতার উল-আলম

www.nagorikpathagar.org

আপনার পালনকর্তা আদেশ দিচ্ছেন ঃ তোমরা যেন আর কারোর ইবাদত মোটেই না করো—একমাত্র তাঁকে ছাড়া। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাঁদের মধ্যে একজন কিংবা দু'জনই তোমাদের সামনে বুড়ো বয়সে উপনীত হন, তাহলে তাঁদের সমক্ষে 'উহ্' শব্দটিও উচ্চারণ করবে না, তাঁদেরকে ধমক দেবে না, আর তাঁদের সাথে অত্যন্ত বিনয় ও আদবের সাথেই কথা বলবে। অত্যন্ত বিনয়াবনত হয়ে যাবে তাঁদের সম্মানে ; আর তাঁদের জন্য দু'আ করবে ঃ হে পালনকর্তা আমার, তাঁরা আমাকে যেভাবে শৈশবে লালন-পালন করেছেন, ঠিক তেমনি তাঁদের প্রতি আপনি মেহেরবানী করুন।

(কুরআন ঃ ১৭ ঃ ২৩-২৪)

www.nagorikpathagar.org

সূচী

প্রকাশকের কথা / ৫
অনুবাদকের কথা / ৬
মুখবন্ধ / ৮
লেখকের কথা / ১১
প্রসঙ্গ কথা / ১৫
প্রথম অধ্যায়
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনবৃত্তান্ত / ২৩
দ্বিতীয় অধ্যায়
মহানবীর বাণীর মৌলিক নীতি / ৪৮
মৌলিক দুটি নীতি / ৪৮
এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস / ৪৯
তৌহিদে বিশ্বাসের ফল / ৫৫
সৎকর্ম ঃ অনুকম্পার অভ্যাস / ৬২
সৎকাজ ঃ ভ্রাতৃত্ব / ৬৮
তৃতীয় অধ্যায়
সমাজ সংস্কার / ৭৪
নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন / ৭৪
সংহতি / ৭৮
পরোপকার / ৮৬
ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা / ৯৪
চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্র / ১০১
ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় মূলনীতি / ১০১
পঞ্চম অধ্যায়
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক / ১১২
প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বৈদেশিক নীতি / ১১২
প্রতিশ্রুতি, চুক্তি এবং সন্ধি / ১১৬
ন্যায়যুদ্ধ / ১২৫

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে যুদ্ধ / ১৩১
যুদ্ধের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার / ১৩৭
স্থায়ী শান্তি / ১৪৫
ষষ্ঠ অধ্যায়
বাণীর বিস্তার / ১৫০
বিধর্মীদের মধ্যে বাণী প্রচার / ১৫০
খৃস্টানদের মধ্যে বাণী প্রচার / ১৫৯
ক্রুসেডারদের ইসলাম গ্রহণ / ১৬৫
ইউরোপে ইসলাম প্রচার / ১৬৯
সপ্তম অধ্যায়
বিশ্ব-অশান্তির কারণ / ১৭৬
উপনিবেশবাদ / ১৭৬
শ্রেণী-সংগ্রাম / ১৮১
বর্ণগত ও জাতিগত বিরোধ / ১৯২
আধ্যাত্মিক শক্তির পরাজয় / ১৯৮
দুর্নীতির ত্রিমুখী ক্ষমতা / ২০৩
অষ্টম অধ্যায়
সভ্যতার আধ্যাত্মিক রক্ষাকবচ / ২০৯
সভ্যতার যিম্মাদার / ২০৯
সভ্যতার সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ / ২১৩
নতুন বিশ্ব-বিধান / ২২০
অধিকার বনাম কর্তব্য / ২২৬
তথ্যপঞ্জি / ২৩১
নির্ঘণ্ট / ২৫১

www.nagorikpathagar.org

মহানবীর শাশ্বত পয়গাম

www.nagorikpathagar.org

তোমরা ঘোষণা করে দাও ঃ আমরা আল্লাহ্ পাকের ওপরে ঈমান এনেছি ; আমাদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার ওপরে আমরা আস্থা স্থাপন করেছি ; যা ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর সন্তানদের কাছে নাযিল হয়েছে, মূসা ও ঈসা যা কিছু পেয়েছেন, অন্য নবীগণ তাঁদের পালনকর্তার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন তার ওপরেও ঈমান এনেছি, তাঁদের মধ্যে কোনও পার্থক্য আমরা করি না ; একমাত্র তাঁরই কাছে আমরা আত্মসমর্পণ করেছি (আমরা মুসলিম)।
(আল-কুরআন ২ ঃ ১৩৬)

www.nagorikpathagar.org

করেছ, তাদের দেবতাগুলোকে অপমান করেছ, তাদের ধর্মকে লাঞ্ছিত করেছ, এমনকি তাদের পূর্বপুরুষদের নিষ্কলুষ চরিত্র এবং পবিত্র বিশ্বাসকেও তুমি অস্বীকার করেছ।"

মুহাম্মদ (স) বললেন, "আমি শুনছি।"

উৎবা বললেন, "তুমি যদি ধনরত্ন চাও, আমরা সবাই মিলে আমাদের মধ্যে তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী বানিয়ে দেব। সম্মান ও ক্ষমতা লাভই যদি তোমার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, আমরা তোমাকে নেতা বানাব এবং তোমাকে ছাড়া কোন ব্যাপারেই আমরা সিদ্ধান্ত নেব না বলে প্রতিজ্ঞা করছি। যদি রাজকীয় সম্মান চাও, আমরা তোমাকে রাজা নির্বাচিত করব। যে ব্যাপারের অভিজ্ঞতা (ওহী) তোমার হচ্ছে আর যাকে (জিবরাঈল) তুমি দেখতে পাও বলছ, যদি এরা তোমার নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত হয় আর এদের প্রতিরোধ করা তোমার ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়ে থাকে, আমরা টাকা-পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করিয়ে তোমাকে রোগমুক্ত করে তুলবো। রোগমুক্তির উপায় খুঁজে না পাওয়া পর্যন্ত কোন লোকের পক্ষে একটি অদৃশ্য শক্তির হাতে পর্যুদস্ত হওয়া অসম্ভব কিছু নয়।"

মুহাম্মদ (স)-এর জবাব মক্কার এই মহাপ্রতিনিধির কাছে ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক। মুহাম্মদ (স) সম্মানের সাথে বললেন, "হে আবুল ওয়ালিদ, দয়া করে আমার কথাগুলো শুনুন"—এই বলে তিনি তাঁর নতুন ধর্মের মৌলিক নীতিসমূহ কুরআন থেকে আবৃত্তি করে শোনালেন।[২০]

আলোচনা ব্যর্থ হলো, কারণ আপস সম্ভব ছিল না। নতুন ধর্মের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণের চাইতে ন্যূনতম কোন দাবি মুহাম্মদ (স)-এর ছিল না। তিনি নিজে ছিলেন একজন সংবাদবাহক মাত্র। আল্লাহ্র আদেশ বিশ্বাসের সাথে পালন করাই ছিল তাঁর মিশন।

পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ আকার ধারণ করল। মক্কার শাসকচক্র নতুন জামা'আতের দরিদ্র ও নিরীহ সদস্যগণের উপর হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথ বেছে নিল। অভিজাত বংশের রক্ত ও তাঁর মর্যাদার দোহাই দিয়ে নগরীর ক্রীতদাস ও নগণ্য লোকদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তারা মুহাম্মদ (স)-কে তিরস্কার করল। তারা বলল, "চিন্তাশক্তিহীন ঘৃণ্য নীচাশয় লোকগুলোই ত তোমার অনুসরণ করছে।"[২১]

কিন্তু মুহাম্মদ (স)-কে শুধু অভিজাত লোকদের জন্যই পাঠান হয়নি—তিনি ছিলেন সকল মানুষের জন্য সংবাদবাহক। আল্লাহ্র নির্দেশে সমগ্র মানবজাতিকে তিনি আহ্বান জানাচ্ছেন। বলছেন, "শোন হে মানবজাতি ! আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি আর আমিই তোমাদেরকে বিভিন্ন জাত আর গোষ্ঠী-গোত্রে বিভক্ত করেছি, যেন তোমরা একে অন্যকে জানতে পার

www.nagorikpathagar.org

(বন্ধুত্বের বন্ধন গড়তে পার) নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বেশি সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন, যে নাকি চরিত্রগুণে তোমাদের মধ্যে সবার বড়।"[২২]

রসূলুল্লাহ্‌র অনুসারীদের উপর অব্যাহতভাবে অত্যাচার চলতে থাকে। অবশেষে মক্কার নেতৃবৃন্দ গোত্রীয় সংহতি রক্ষার্থে মুহাম্মদ (স)-এর কাছে আবেদন জানায়। মূর্তির অবমাননা করলে কুরায়শদের কি পরিণতি হবে, মক্কা শহরের কি দুর্দশা হবে, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারা আরবদের বলল, "আমরা যদি তোমার সাথে সঠিক পথে চলি তাহলে আমাদেরকে বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হবে।"[২৩] এ কথার দ্বারা তারা বোঝাতে চাইল যে, তাদের এবং আরব বেদুইনদের মধ্যে কোন পার্থক্য আর থাকবে না এবং তাদের গৃহের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে।

মুহাম্মদ (স)-এর মনে এ ধরনের কোন ভীতি ছিল না। যে আল্লাহ্ তাঁকে নির্দেশ করেছেন, তিনিই বিশ্বাসীদেরকে রক্ষা করবেন এবং আল্লাহ্‌র আইন যাঁরা মেনে চলবেন, তাঁদেরকে আল্লাহ্ বিজয়ী করবেন। তাদের বোঝা উচিত যে, ঐ মূর্তিগুলো অসহায় পাথর ছাড়া আর কিছুই নয়, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং তিনিই সব কিছুর স্রষ্টা। তাদের আরও স্বীকার করা উচিত যে, একদিন সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে এবং শেষ বিচারের দিন আল্লাহ্‌র ভক্তি ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না।

কিন্তু তারা বিচার-বিভীষিকাকে ঘৃণা এবং পুনরুত্থানের কথা অবিশ্বাস করল। উমাইয়া ইবনে খালাফ্ নামে জনৈক বিখ্যাত নেতা কবর থেকে একটা ক্ষয়িষ্ণু হাড় তুলে নিয়ে মুহাম্মদ (স)-এর কাছে গিয়ে বলল, "তুমি কি বলতে চাও এটা আবার পুনরুজ্জীবিত হবে ?"

উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, "যিনি এটাকে পয়লা সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি আবার তা জীবিত করতে পারেন।"

এভাবে বাদানুবাদ চলার সাথে সাথে রসূলুল্লাহ্‌র অনুসারীদের উপরও চরম অত্যাচার চলতে থাকে। মুহাম্মদ (স) তখন তাঁদেরকে লোহিত সাগরের অপর পাড়ে খৃস্টান শাসিত আবিসিনিয়ায় (ইথিওপিয়া) গিয়ে বসবাস করতে বললেন। তাঁরা ইথিওপিয়ার সম্রাট (Negus)-এর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলে সম্রাট তাঁদেরকে আশ্রয় দেন। প্রথাগতভাবে তাঁরা সম্রাটের কাছে এভাবে আবেদন করেন ঃ

"হে সম্রাট! আমরা অজ্ঞতা, অপবিত্রতা ও মূর্তিপূজায় নিমগ্ন ছিলাম, সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত, আমরা মিথ্যা বলতাম, আতিথেয়তার নীতি লংঘন করতাম। তারপর আমাদের মধ্যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটে। ছোটবেলা থেকেই আমরা তাঁকে জানি। তাঁর উত্তম আচরণ, বিশ্বস্ততা এবং নৈতিকতা সম্পর্কে আমরা সুবিদিত। তিনি আমাদেরকে এক আল্লাহ্‌র উপাসনা করতে, সত্য কথা বলতে,

৩—

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাস ভংগ না করতে, আত্মীয়-স্বজনকে সহায়তা করতে, অতিথি সেবার কর্তব্য পালন করতে এবং সমস্ত অপবিত্রতা ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার উপদেশ দেন। নামায, রোযা ও দান করার নির্দেশও তিনি দেন। আমরা তাঁকে বিশ্বাস করে তাঁর অনুসরণ করলাম। কিন্তু আমাদের দেশবাসীরা আমাদের ওপর অত্যাচার চালাল, নির্যাতন করল এবং ধর্মত্যাগ করতে বাধ্য করবার চেষ্টা করল। তাই আমরা আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনি কি আমাদের আশ্রয় দেবেন না ?"

মুসলিম শরণার্থীরা যীশু ও কুমারী মরয়মের প্রশংসাসম্বলিত কুরআনের অংশ বিশেষ পড়ে শোনালেন। কথিত আছে যে, সম্রাট ও তাঁর বিশপগণ তখন বুঝতে পারলেন, শরণার্থী মুসলিম ও খৃস্টানদের ধর্মের উৎস একটি। অন্যদিকে মক্কাবাসীরাও চুপ করে বসে ছিল না। তারা উপঢৌকনসহ আবিসিনিয়ায় দূত পাঠিয়ে পলাতক ক্রীতদাস ও অন্যান্য দেশত্যাগীকে ফেরত পাবার জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন জানাল। কিন্তু তাদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ওদিকে মক্কায় মুহাম্মদ (স) ও কতিপয় অনুসারী, যাঁরা গোত্রীয় রীতি ও বংশগত প্রথার আওতায় নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করতে সক্ষম ছিলেন, তাঁরা তাঁদের ধর্মে অটল রইলেন, আগের মত পরম নিষ্ঠার সাথে তা প্রচার করতে লাগলেন এবং কা'বায় গিয়ে প্রকাশ্যে মূর্তিপূজার প্রতিকূলে এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতে লাগলেন।

কুরায়শরা ইতিপূর্বেই মুহাম্মদ (স)-এর স্বগোত্রীয় বনূ হাশিমের কাছে তাকে হত্যা করার প্রস্তাব এবং পরিবর্তে রক্তপণ আদায়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তারা এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। অবশেষে মক্কার শাসকরা নিরুপায় হয়ে আবূ তালিবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের মতে আবূ তালিবই ধর্মদ্রোহিতার মূল আশ্রয়দাতা, যদিও তিনি তখনও ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর ধর্মে অদীক্ষিত এবং মক্কার পৌত্তলিকতাভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অতি সম্মানিত পৃষ্ঠপোষক। তারা তাঁকে একটা চরম পত্র দিতে ঐক্যবদ্ধ হল। তাদের সাবধান বাণী পেয়ে বৃদ্ধ আবূ তালিব বিচলিত হয়ে পড়েন। তিনি তাঁর ভাইপোকে ডেকে এনে বললেন যে, তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছে। "আমার ভয় হচ্ছে, আরবের জনগণ আমার বিরুদ্ধে তাদের সাথে সমবেত হবে। সুতরাং তুমি নিজে বাঁচ এবং আমাকে বাঁচতে দাও। আমার শক্তির বাইরে আমার উপর বোঝা চাপিও না।"

মুহাম্মদ (স) কেঁদে বললেন, "আল্লাহ্! তুমি সাক্ষী থাক। এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য ও বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবুও আমি আমার প্রচার ত্যাগ করব না, এর চেয়ে বরং আমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।" এরপর তিনি চলে যেতে উদ্যত হলে তাঁর চাচা তাঁকে ডেকে বললেন, "যাও বৎস, তুমি যা বিশ্বাস কর তা বলে যাও। কোন অবস্থাতেই আমার সহায়তায় ছেদ পড়বে না।"

www.nagorikpathagar.org

কোন কারণ ছিল না। কিন্তু মক্কার নেতৃস্থানীয় কিছু লোক তাঁর দলে যোগ দেবে, প্রকাশ্য দিবালোকে যাদুকরটি তাদের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষ্যাপাবে, তাদেরকে ভয় দেখাবে, এটা ত কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

নেতারা বিচলিত হল, একটা কার্যকর পন্থা অবলম্বনের জন্য তারা বদ্ধপরিকর হল। এ যাবত তারা নতুন এই ধর্ম প্রচারককে শুধু উপহাসই করেছে। এখন তাদেরকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু সরাসরি মুহাম্মদ (স)-কে আঘাত করার সাহস তারা পেল না। কারণ তিনি মক্কার এক অভিজাত বংশের সন্তান। দৈন্যদশাগ্রস্ত হলেও সেই বংশ নগরীতে শ্রদ্ধাভাজন। এই বংশের সর্দার, মক্কাবাসী যাঁকে শ্রদ্ধা করে, তিনিই মুহাম্মদের পালক পিতা এবং অভিভাবক। অন্যান্য মুসলমান নেতাকেও আক্রমণ করা নিরাপদ নয়। কারণ এতে গোত্রে গোত্রে একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ঝুঁকি খুব হালকা নয়।[১৯] অগত্যা তারা এই ন্যক্কারজনক দলে যোগদানকারী নিগ্রো ক্রীতদাসদের উপর অহেতুক অত্যাচার চালিয়ে ঘৃণ্য আত্মতুষ্টি লাভ করতে বাধ্য হল।

সংঘর্ষ আস্তে আস্তে ঘনীভূত হল। মক্কার অভিজাত শাসকচক্র খুবই বিচলিত হয়ে পড়ল। কিন্তু মুহাম্মদ (স) একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চললেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র দূত এবং আল্লাহ্র আদেশেই তিনি কাজ করতেন। মক্কার মূর্তিগুলো দেবতা নয় বা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র অংশীদারও নয়। তারা নিঃসহায় ও নিষ্প্রয়োজনীয়। আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (স)-এর বিশ্বাসের এই পবিত্রতম একত্ববাদ কুরায়শদের পক্ষে গ্রহণ করা অসম্ভব ব্যাপার। মক্কার বহুত্ববাদ আবহমানকাল থেকেই চালু ছিল। এটা শুধু তাদের পূর্বপুরুষদের ধর্মই ছিল না বরং আরবে তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির মূল উৎসও ছিল এই বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতা। এটি ধূলিসাৎ হলে তাদের মান-সম্মান, ক্ষমতা, সম্পদ—সবকিছুই ভেস্তে যাবে। মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন আবদ্ মানাফ, হাশিম ও আবদুল মুত্তালিবের বংশধর। বংশ-পরম্পরায় তাঁরা ছিলেন কুরায়শ বংশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং ক্ষমতার ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বপ্নসাধ পূর্ণ করার প্রতিশ্রুতিতে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে একটা মীমাংসা করলে কেমন হয় ?

মক্কার জনৈক প্রখ্যাত নেতা উৎবা ইবন্ রাবি'আকে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে আলোচনার জন্য নিয়োগ করা হল। উৎবা মুহাম্মদ (স)-কে কা'বা গৃহে ডেকে নিয়ে প্রস্তাবগুলো তাঁর সম্মুখে পেশ করলেন। বললেন ঃ

"হে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আমাদের কুরায়শদের মধ্যে তোমার স্থান কত উর্ধে তা তুমি জান। তোমার পূর্বপুরুষরা আমাদের বংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তোমার গোত্র সবার শীর্ষস্থানে এবং শক্তিশালী। তুমি তোমার আপনজনকে আঘাত দিয়েছ এবং চিন্তান্বিত করেছ। তুমি তাদের একতা ভেঙে দিয়েছ, তাদের বুদ্ধিমত্তাকে উপহাস

www.nagorikpathagar.org

প্রথমে তিনি কাবার পার্শ্ববর্তী 'সাফা' পাহাড়ে, যেখানে মক্কার মূর্তিগুলোর প্রশংসা কীর্তিত হত, সেই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশে বলেন, "আমি যদি এখন আপনাদের বলি, এই পাহাড়ের পশ্চাৎ দিক থেকে শত্রুপক্ষের একদল অশ্বারোহী সৈন্য আপনাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হচ্ছে, আপনারা কি তা বিশ্বাস করবেন?"

তারা জবাব দিল, "আপনি মিথ্যা কথা বলেন, একথা ত আমরা কখনও শুনিনি।"

তখন তিনি বলেন, "আমি আপনাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি বাণী পেয়েছি, আমি সতর্কবাণী বাহক, একটি ভয়াবহ শাস্তি সম্পর্কে আমি পূর্বাহ্নে সাবধান করে দিতে চাই। এ জগতে আমি আপনাদের রক্ষা করতে পারব না, পরজগতে সহায়তার কোন প্রতিশ্রুতিও দিতে পারব না যদি না আপনারা ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই।"[১৭]

তারা তাঁকে বিদ্রূপ করে চলে গেল। এভাবে মক্কায় তাঁর দশ বছরের সংগ্রাম ও নিপীড়নের জীবন শুরু হয়। কিন্তু অবিশ্বাসী মক্কা নগরীর ওপর ভয়াবহ শাস্তি আপতিত হবে—একথা বলা থেকে তিনি নিবৃত্ত হলেন না। আল্লাহ্‌র সংবাদবাহকদের কথায় কর্ণপাত না করায় আরবদেশের প্রাচীন গোত্রগুলোকে কিভাবে আল্লাহ্ শাস্তি দিয়েছিলেন, সেসব কাহিনী প্রাথমিককালে অবতীর্ণ সূরাগুলোর[১৮] তেজোদ্দীপ্ত ভাষায় তাদেরকে বললেন। নূহ (আ)-এর কথা না শোনার জন্য কিভাবে একটা জাতি বন্যার কবলে পড়ে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সেকথাও তিনি তাদেরকে শোনান।

প্রকৃতির মনোরম দৃশ্যাবলী, মধ্যাহ্নের ঔজ্জ্বল্য, নিশীথের অন্ধকার, গৌরবময় দিবালোকের শপথ করে তিনি ঘোষণা করলেন, তারা যদি মূর্তিপূজা ত্যাগ না করে আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন না করে, তবে তারা অবশ্যই অনুরূপভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রূপক শোভিত এমন ওজস্বিনী ভাষায় তিনি তাঁর প্রচার চালাতে থাকেন যাতে তা মানুষের মর্ম স্পর্শ করে। তিনি তাদের শোনালেন শেষ বিচারের দিনের কথা, যেদিন তাদের কৃতকর্মের ন্যায়ভিত্তিক নিকাশ হবে, প্রাচ্য দেশীয় রূপক অলংকারের সাহায্যে বেহেশত ও দোযখের কথা বললেন। মানুষ মুগ্ধ হল ও ভীত হল। ধর্মান্তর ক্রমেই বেড়ে চলল।

কুরায়শদের টনক নড়ল। মূর্তিপূজা যদি উঠেই যায় তাহলে তাদের কি হবে? মূর্তির রক্ষক হিসেবেই ত আরবদেশে তাদের খ্যাতি। কা'বা ঘরে রক্ষিত দেবদেবীর উপাসনা করতে যে সব উপজাতি আসত তাদের আনুগত্য কিভাবে তারা টিকিয়ে রাখবে? কিছু সংখ্যক লোক 'যাদুকর' বা 'পাগল' মুহাম্মদের প্রলাপ শুনে মক্কার মনোরম দেবদেবীর উপাসনা ত্যাগ করে এক আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে করুক, উদ্বেগের

www.nagorikpathagar.org

বিশেষজ্ঞ এবং সত্যসন্ধ পণ্ডিতগণেরও এই ছিল মনোভাব। তাঁরা আগেও তাঁর নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও সরলতায় আস্থা পোষণ করতেন এবং এখনও করেন। ত্রিশ বছর আগে আমি লণ্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিজের তৎকালীন ডীন Sir Denison Ross-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তিনি মুহাম্মদ (স)-এর সরলতা ও সত্যনিষ্ঠায় আস্থা স্থাপন করেন কিনা। উত্তরে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই। তিনি কখনও মিথ্যা বলেননি বা প্রতারণা করেননি। তিনি সরল ও সত্যবাদী ছিলেন।" আমি আরও জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনি কি বিশ্বাস করেন যে তিনি আল্লাহ্‌র নবী?" এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "এটা আলাদা ব্যাপার।" আধুনিক কালের পণ্ডিত ব্যক্তিরা তাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে এখন আর কোন সন্দেহ পোষণ করেন না।

Tor Andrae-র মতে ঃ

"অতীতে মানুষ ভাবত যে তাঁর চরিত্রে বিশেষ একটা পূর্ব পরিকল্পনা ও হিসেবী রকমের চতুরতা প্রকাশ পেয়েছিল। যাঁরা অনুপ্রেরণার মনস্তত্ত্ব জানেন তাঁদের মধ্যে কেউ এই দাবির বিরোধিতা করেন না যে মুহাম্মদ (স) সরল বিশ্বাসে কাজ করে গেছেন। যে বাণী তিনি প্রচার করেন তা যে তাঁর নিজস্ব কোন আদর্শ বা মতবাদের প্রকাশ ছিল না, এটা কেবল তাঁর বিশ্বাস সংক্রান্ত একটা মতবাদই ছিল না বরং এটা তাঁর অভিজ্ঞতাপ্রসূত ব্যাপারও ছিল—এ সম্পর্কে তিনি কোনদিন সন্দেহ পোষণ করেননি। সম্ভবত সেই অশ্রুতপূর্ব আওয়াজটির সূত্র সম্বন্ধে তিনি নিজেও প্রথম দিকে সন্দিহান ছিলেন যে, এটা কি সত্যি সত্যিই স্বর্গীয় দূতের মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছে, যাকে তিনি মক্কার পর্বতমালায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন, না এটা সাধারণ একটা জিনের কারবার।"[১৫]

কিছুদিন মুহাম্মদ (স) এক আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর বিশ্বাসের কথা নিভৃতে প্রচার করেন। যে ক'জনকে তিনি তাঁর ধর্মে দীক্ষিত করেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু আবূ বকর, একজন জ্ঞানী, সম্মানিত ও ধনী ব্যবসায়ী ; এরপর উসমান ও তালহা ; এঁরাও ছিলেন মক্কার ধনী ও গণ্যমান্য কুরায়শ ; আর কয়েকজন দরিদ্র নাগরিক ও ক্রীতদাস। তারপর তিনি প্রকাশ্যে প্রচার করতে আদিষ্ট হন, "আমি তোমাকে (হে মুহাম্মদ) পাঠিয়েছি এমন এক জাতির মধ্যে যাদের পূর্বে অনেক জাতি গত হয়ে গিয়েছে—এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি তাদেরকে পড়ে শোনাবে যা আমি তোমার নিকট নাযিল করেছি আর এজন্যেই আমি কুরআন (একটি নিদর্শনরূপে) আরবী ভাষায় নাযিল করেছি।[১৬] আল্লাহর এই আদেশ পাওয়ার পর মুহাম্মদ (স) মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করেন এবং তাদেরকে কিয়ামত ও শেষ বিচারের বিশ্বাসের কথা বলেন।

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (স)-এর বয়স যখন চল্লিশ বছর, তখন তাঁর অন্তরের নিভৃতে উপাসনার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং নগরের বাইরে 'হেরা' নামক পর্বতের গুহায় গিয়ে তিনি ধ্যানমগ্ন হতেন। দেশবাসীর মধ্যে পবিত্র বলে বিবেচিত এক মনে এমনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একদিন তিনি একটা আওয়াজ শুনতে পেলেন, যাতে তাঁকে বলা হল ঃ 'পড়।' উত্তরে তিনি বললেন, "আমি পড়তে পারি না।" কিন্তু তিনি পুনরায় আদিষ্ট হলেন, "পড়, তোমার প্রভুর নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন জমাট রক্ত থেকে। পড়, তোমার প্রভু অতি দানশীল, যিনি কলম দিয়ে (লিখতে) শিখিয়েছেন এবং তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না।"[১৩]

ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মুহাম্মদ (স) দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে খাদীজার কাছে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেন। খাদীজা (রা) তাঁকে সান্ত্বনা ও সাহস দেন। স্বল্প বিরতির পর তিনি আবার সেই আওয়াজ শুনতে পেলেন, "আপনি আল্লাহ্র সংবাদবাহক আর আমি জিব্রাইল।" ভয়ে ভীত এবং অবসন্ন অবস্থায় তিনি খাদীজার কাছে ফিরে এলেন এবং কাপড় দিয়ে তাঁর শরীর মুড়ে দিতে বললেন। তারপর তিনি পুনরায় সেই আহ্বান শুনতে পেলেন, "ওহে বস্ত্রাবৃত ব্যক্তি ! উঠে দাঁড়াও এবং সাবধান বাণী শোনাও ; নিজ প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর, তোমার পরিধেয় পরিষ্কার কর, অপবিত্রতা বর্জন কর, বিনিময় লাভের আশায় কৃপা প্রদর্শন করো না ; তোমার প্রভুর খাতিরে ধৈর্য ধারণ কর।"[১৪]

তখনই মুহাম্মদ (স) বুঝতে পারলেন, জনগণের জন্য তাঁর 'মিশন' কি হবে এবং এভাবেই তাঁর প্রচার জীবন শুরু হয়। এই পুস্তকের বিষয়বস্তু হচ্ছে এই বিশেষ 'মিশন' যা মানুষের মন জয় করেছিল এবং ক্রমবর্ধমান প্রাণশক্তি নিয়ে তেরশ বছর পরও করে যাচ্ছে।

মুহাম্মদ (স)-এর আন্তরিকতায় সন্দেহ পোষণ করতেন না তাঁরা—তাঁর স্ত্রী, তাঁর সহচর বনাম সেক্রেটারী, তাঁর গৃহে বাসরত তাঁর চাচাত ভাই আলী—যাঁরা তাঁকে ভাল করে জানতেন ; এঁরাই ছিলেন তাঁর হাতে প্রথম দীক্ষাপ্রাপ্ত। চাচা আবূ তালিবকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করাতে পারেননি—এই মর্মপীড়া তাঁকে সহ্য করতে হয়েছিল বটে, কিন্তু আবূ তালিব কখনও ভাইপোর সত্যনিষ্ঠায় বিশ্বাস হারান নি। যখন তাঁর ছেলে আলী ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁকে বলেন, "যাও বাবা, সে তোমাকে ভাল কাজে ছাড়া কোন মন্দ কাজে কখনই আহ্বান জানাবে না।"

মুহাম্মদ (স)-এর 'মিশন' কি সত্যিই খাঁটি ছিল ? তিনি কি সত্যিকার বিশ্বাসেই আহ্বান জানিয়েছিলেন ? এ ব্যাপারে মুসলিমদের মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে যখন তিনি কথা বলতে শুরু করেন, তখন তাঁর স্বগোত্রীয়েরা তাঁর বিরুদ্ধাচরণ এবং নানাভাবে তাঁর ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়ন করতে শুরু করে।

আবূ তালিবের পরিবারের অন্য যুবকদের মতে মুহাম্মদকেও হাশিমী বংশের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার্থে কঠোর পরিশ্রম করতে হত। হাশিমীরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের চাইতে কম সম্পদশালী হলেও তাদের ক্ষমতা ও গর্ব আগের মতই ছিল। প্রথম জীবনে মুহাম্মদ (স) মেষপালক ছিলেন এবং পরে যখন ব্যবসা করতে শুরু করেন, তখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও অন্য লোকেরা তাঁকে 'আল-আমীন' বা সত্যবাদী উপাধি দেন।

পঁচিশ বছর বয়সে তিনি খাদীজা নাম্নী চল্লিশ বছর বয়স্কা এক আত্মীয়া ও ধনাঢ্য মহিলাকে বিয়ে করেন। পঁচিশ বছর যাবত তাঁরা সুখে-শান্তিতে দাম্পত্য জীবন যাপন করেন। মুহাম্মদ (স)-এর ঔরসে খাদীজার গর্ভে চার কন্যা ও দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁর যে সব কন্যা বিবাহিত হন, তাঁদের মধ্যে হযরত ফাতিমাই সন্তান রেখে মারা যান।[১১] মুহাম্মদ (স) অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন এবং সাধারণভাবে শিশুদের প্রতি তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ। খাদীজার সাথে পঁচিশ বছরের দাম্পত্য জীবনে তিনি আদর্শ স্বামী হিসেবে চিহ্নিত হন। খাদীজার মৃত্যুর পর কয়েক বছর যাবত তিনি বিপত্নীক জীবন যাপন করেন। এমন কি নানা কারণে তিনি কয়েকটি বিয়ে করলেও খাদীজার কথা কখনও ভুলেননি। তিনি বলতেন, "আমি যখন দরিদ্র ছিলাম, সে-ই আমাকে ধনী করেছিল, যখন সবাই আমাকে মিথ্যুক বলত, সে একাই আমাকে সমর্থন করত।" এ ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, খাদীজাই সর্বপ্রথম মুহাম্মদ (স)-এর নুবূওতে অর্থাৎ নবীর মর্যাদা লাভে বিশ্বাস করেছিলেন, যখন তিনি নিজেও তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারছিলেন না।

পল্লীর অদূরে এক নির্জন স্থানে মুহাম্মদ (স) যখন ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রথম 'ওহী' প্রাপ্ত হন, তখন ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। খাদীজা তাঁকে সান্ত্বনা-বাণী শুনিয়ে বলেন, "না, আপনার ভয় পাবার কিছু নেই ; আল্লাহ্ কখনও আপনার প্রতি বিরূপ হতে পারেন না, কারণ আপনি আপনার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি সদয়, আপনি বিচক্ষণ ও ধৈর্যশীল, আপনি গরীবকে সাহায্য করেন, অতিথিদের প্রতি আপনি উদার এবং অসহায় ও বিপন্ন লোকের দুঃখ দূর করার ব্যাপারে আপনি কোন দিনই পিছপা হননি।"[১২]

এই ছিল মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র এবং এর সাক্ষ্য দিয়েছেন এমন একজন মহিলা, যিনি তাঁকে ওহী এবং নুবূওত প্রাপ্তির পূর্বেও অতি নিবিড়ভাবে জানতেন। এখন দেখা যাক যে মহানাটক তাঁর দেশ ও জাতি তথা সমগ্র বিশ্বে এক মহারূপান্তর সাধনের জন্যে নির্ধারিত হয়েছিল, সেই নাটকে তাঁর কি ভূমিকা ছিল।

www.nagorikpathagar.org

তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন এবং সব সময়ই তাঁর পাশে পাশে রাখতেন। এমনকি কাবা[৮] গৃহে যে সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা হত তখনও তিনি তাঁকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। তাঁর চাচারা তাঁকে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করলে পিতামহ তাঁদেরকে এই বলে বাধা দিতেন, "তাকে থাকতে দাও, আমার এই ছেলেই বড় হয়ে এই জাতির নেতা হবে।"

পিতামহ আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর মুহাম্মদ (স)-এর অভিভাবকত্ব তাঁর পিতৃব্য আবূ তালিবের উপর বর্তায়। মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাঁর স্নেহ ও ভালবাসা কোন অংশেই আবদুল মুত্তালিবের চেয়ে কম ছিল না। ইসলামে বিশ্বাস এবং এই ধর্মের প্রচার দায়িত্ব ঘোষণার বহুদিন পর পর্যন্ত মুহাম্মদ (স) চাচা আবূ তালিবের ভালবাসা ও ছত্রছায়া লাভ করেন। আবূ তালিব মুহাম্মদ (স)-এর নতুন ধর্মে দীক্ষিত না হলেও আমৃত্যু তাঁকে স্নেহ করেন এবং আশ্রয় দেন। এজন্য তাঁকে অনেক নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। মুহাম্মদ (স)-এর পঞ্চাশ বছর বয়ঃক্রমকালে আবূ তালিব মারা যান।

ঐতিহ্যবাহী মক্কা নগরী আরব দেশের ধর্ম ও বাণিজ্য—উভয়ের প্রাণকেন্দ্র ছিল। মক্কা ছিল পূর্ব-পশ্চিম ওউত্তর-দক্ষিণের বাণিজ্যিক লেনদেনের সন্ধিস্থল। আবূ তালিবের বংশ সারা আরব জাহানে সবচাইতে বেশি প্রভাবশালী। বনূ আবদ্ মানাফ ছিল তৎকালীন আরব দেশের বিখ্যাত কুরায়শ বংশেরই[৯] একটা অঙ্গ গোত্র। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিসমষ্টি মক্কা ও এর সন্নিহিত অঞ্চলের অধিবাসী গোত্রগুলোর ওপর শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করত, এই আবদ্ মানাফ বংশ এতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। সুতরাং যৌবনে সাধারণ কুরায়শ যুবকদের মতই মুহাম্মদ (স) যুদ্ধ-বিগ্রহ, আপস-মীমাংসা ও আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন এবং সামাজিক জীবনের অধিকার অর্জন ও কর্তব্য পালনে অংশীদার ছিলেন।[১০] একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল যে, বাল্যজীবন থেকে মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা তাঁর স্বভাবে পরিলক্ষিত হত। তাঁকে একবার যখন লা'ত ও উয্যা নামক দুই দেবীর নামে কোন বিশেষ কাজ করার কথা বলা হলো, তিনি বিস্ময়কর এক জবাব দেন। তিনি বলেন, "এই মূর্তিগুলোর দোহাই দিয়ে আমাকে কিছু বলো না, এই মূর্তিগুলোর চাইতে অন্য কিছুকে আমি বেশি ঘৃণা করিনে।"

কিন্তু নিজ গোত্রের এসব দেবতা বা মূর্তির প্রতি এ দৃঢ় অনাস্থা প্রকাশের জন্য তাঁর আত্মীয়-স্বজন বা পরিবার-পরিজন তাঁকে ত্যাগ করেননি বা তাঁদের বন্ধুত্বপূর্ণ সামাজিকতার দ্বার রুদ্ধ হয়নি, কারণ তাঁর মহান চরিত্র, বদান্যতা এবং সততার দরুন তিনি সবার হৃদয় জয় করেছিলেন। এসব গুণের জন্যে সবাই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। চল্লিশ বছর বয়সে তৌহীদ প্রচার করতে গিয়ে বাধ্য হয়ে মূর্তিপূজার

www.nagorikpathagar.org

বিস্ময়কর হলেও মুসলিম জগত খৃস্ট এবং য়াহূদী ধর্ম সম্বন্ধে তার চাইতে অনেক বেশি জ্ঞাত। মুসলিমগণ সর্বদাই খৃস্টান এবং য়াহূদীদের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনকে শ্রদ্ধা ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে দেখেছেন।

দ্বিতীয় কৈফিয়তটা দিয়েছেন আর একজন পণ্ডিত। তিনি বলেন ঃ

'ইতিহাসের গতিধারা এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে, যাতে গোড়া থেকেই পাশ্চাত্যের সাথে অন্যান্য সভ্যতার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তার সম্পূর্ণ বিপরীত সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ইসলামের সাথে। তেরশ বছর যাবত ইউরোপ ইসলামকে প্রায়শ তার একটা প্রবল শত্রু ও ভীতি হিসেবে দেখেছে। তাই এটা মোটেই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে, পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মীয় নেতার তুলনায় পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) খুবই নিম্নস্তরে স্থান পেয়েছেন এবং পৃথিবীর সব ধর্মের মধ্যে ইসলামের মর্মোপলব্ধি পাশ্চাত্যে সবচাইতে কম। কার্ল মার্কস ও কমিউনিজমের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র মুহাম্মদ (স)-ই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন। আদর্শ ও অস্ত্রের এই যুগপৎ আক্রমণ ছিল সরাসরি এবং অত্যন্ত শক্তিশালী।[৭]

মুহাম্মদ (স) জন্মগ্রহণ করেন মক্কানগরীতে। তাঁর জন্মের সঠিক তারিখ নিয়ে কিছুটা মতভেদ আছে, তবে এটা সর্বজনস্বীকৃত যে, ৫৭০ অব্দের কাছাকাছি সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এই অনিশ্চয়তা আরব দেশের জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। কারণ পবিত্র কুরআনেই বর্ণিত আছে যে, আরব দেশ ছিল অক্ষরজ্ঞানহীন লোকদের দেশ। এমনকি বর্তমান যুগেও অনেক প্রখ্যাত ব্যক্তির সঠিক জন্ম-তারিখ নিরূপণ করা কঠিন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বিখ্যাত আবদুল আযীয ইবনে সউদের সঠিক জন্ম-তারিখ নির্ধারণ করা যাচ্ছে না, অথচ তিনি আরব দেশ জয় করেন, তার সংহতি বিধান করেন এবং পঞ্চাশ বছরের অধিককাল রাজত্ব করেন (১৯৫৩ সালে তিনি মারা যান)। তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও জীবনী সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া গেলেও তাঁর জন্ম-তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই।

মুহাম্মদ (স)-এর জীবন তথ্যের অবিসংবাদিত উৎস হচ্ছে কুরআন। আবার রসূলুল্লাহ (স)-কে যাঁরা ব্যক্তিগতভাবে জানতেন এবং যাঁদের মানসপটে তাঁর স্মৃতি ছিল সুস্পষ্ট, তাঁদের বর্ণনার ভিত্তিতে রচিত 'সিয়র' (এক বচনে সীরাত) রূপে গণ্য বহু জীবনীগ্রন্থও রয়েছে।

অল্প বয়সেই তিনি তাঁর মাতাপিতাকে হারান। প্রথমে মারা যান পিতা আবদুল্লাহ্ এবং তার কিছুকাল পরেই মাতা আমিনা। কথিত আছে যে, তাঁর মা যখন মারা যান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ছ' বছর। তখন তাঁর পিতামহ মক্কার বিখ্যাত নেতা আবদুল মুত্তালিব তাঁর লালন-পালনের ভার নেন। কথিত আছে যে, আবদুল মুত্তালিব

www.nagorikpathagar.org

পয়গামের প্রথম থেকে নানা নির্যাতন ভোগ করে বিজয় পর্যন্ত তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পাশে পাশেই ছিলেন। পঞ্চম খলীফা[৪] হলেন আবূ সুফিয়ান-এর পুত্র মু'আবিয়া। আবূ সুফিয়ান ছিলেন বিরোধী দলের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী নেতা। মু'আবিয়ার খিলাফত তাঁর পূর্ববর্তী খলীফাদের চেয়ে দীর্ঘদিন স্থায়ী ছিল। তিনি প্রথমে সিরিয়ার গভর্নর হিসেবে এবং পরে মুসলিম জগতের খলীফারূপে দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবত মুসলিম সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার নেতৃত্ব প্রদান করেন।

কিন্তু আমাদের কাছে ঐতিহাসিক তথ্যের এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগত মুহাম্মদ (স) ও ইসলামকে যত কম জানে বা বুঝে অন্য কোন পয়গম্বর বা ধর্মকে তারা তত কম জানে না বা বুঝে না। যে পাশ্চাত্য জগত কয়েক শতাব্দী ধরে চিন্তার স্বাধীনতায় ও উচ্চমানের শিক্ষায় বিরাট ঐতিহ্যের অধিকারী ও মানুষের শিক্ষণীয় সমস্ত ব্যাপারে যাদের রয়েছে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, তারা আলেকজাণ্ডার এবং সীজারের তুলনায় নবী মুহাম্মদ (স) এবং মানব জাতির ইতিহাসের ধারার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তারকারী মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে অনেক কম জ্ঞাত অথচ মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে আলেকজাণ্ডার বা সীজারের প্রভাব মুহাম্মদ (স) ও ইসলামের[৫] তুলনায় অনেক কম।

যে জগত জানতে বা বুঝতে এত আগ্রহান্বিত, সে জগত ইসলাম সম্পর্কে এত উদাসীন কেন ? এর দু'টি বিবেচনাযোগ্য কৈফিয়ত রয়েছে। প্রথম কৈফিয়তটা দিয়েছেন সুইডেনের একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত। তিনি লিখেছেন ঃ

"কারণটা একটা প্রবাদের সাহায্যে ভালভাবে প্রকাশ করা যায় ঃ আত্মীয়েরা পরস্পরকে সবচেয়ে কম জানে ও বুঝে। একজন খৃষ্টান ইসলামের মধ্যে এমন অনেক কিছুই দেখতে পান, যা তাঁকে তাঁর নিজের ধর্মের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় কিন্তু তিনি তা অত্যন্ত বিকৃত আকারে দেখেন। এখানে তিনি এমন কতগুলো ধারণা বা বিশ্বাসের সূত্র পান, যা তাঁর নিজের ধর্মের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু সেগুলো তাঁর মনে অতি আশ্চর্যজনকভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথ বেয়ে চলে। ইসলাম আমাদের কাছে এত বেশি পরিচিত যে, আমরা অত্যন্ত অসতর্ক উদাসীনতার সাথে তার পাশ কাটিয়ে চলে যাই এবং এতে করে আমরা এমন একটা জিনিসকে উপেক্ষা করি যা আমরা জানি এবং খুব ভাল করেই জানি। তথাপি ইসলাম আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিচিত নয়, যাতে করে আমরা এর অনন্যতা উপলব্ধি করতে পারি, এর মর্মকথা উপলব্ধি করতে সমর্থ হই, যদ্দরুন ধর্মরাজ্যে ইসলাম অধিকার করেছে একটি বিশিষ্ট স্থান এবং অতি সঙ্গত কারণে এখনও সে স্থানটি জুড়ে রয়েছে। যেসব ধর্ম আমাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন ও অপরিচিত তা আমরা অধিকতর সহজে বুঝতে পারি ; যেমন—ভারত ও চীনের ধর্ম। আরবী নবী ও তাঁর গ্রন্থকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে চাই অধিকতর গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা।"[৬] পাশ্চাত্য ইসলাম সম্বন্ধে যতখানি জ্ঞাত,

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনবৃত্তান্ত

বল! আমার সালাত, আমার বন্দেগী, আমার জীবন, আমার মরণ—সবই সারা বিশ্বের প্রভু আল্লাহ্‌র উদ্দেশে। তাঁর কোন শরীক নেই এবং এই মর্মেই আমার নিকট আদেশ এসেছে আর আদেশ পালনকারী মুসলিমদের মধ্যে আমিই সর্বাগ্রগামী। (আল-কুরআন ৬ ঃ ১৬৩-১৬৪)

মুসলিমগণ তেরশ বছরেরও অধিককাল যাবত একটা জাতি এবং বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন অংশে তাদের সংখ্যা ষাট কোটিরও বেশি। নবী মুহাম্মদ (স) এ জাতির সর্বপ্রথম নাগরিক, শিক্ষক এবং পথপ্রদর্শক। ইতিহাসের আলোকোজ্জ্বল স্মৃতিতে তাঁর জন্ম এবং দেহত্যাগ হয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের, ধর্মের ও জাতির ক্রমবিকাশ সর্ববৃহৎ মানবিক নাটকের গতিবেগ অর্জন করেছিল যা প্রত্যক্ষ করেছিল কেবল তাঁর সমসাময়িক মানুষই নয় বরং পরবর্তীকালে সমগ্র বিশ্বের মানুষও তা অবলোকন করেছেন ও করছেন।

সমগ্র আরব উপদ্বীপে তাঁর বাণী প্রচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং মুসলিম জাতি আরব ভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই নাটকের নায়ক তিরোধান করেননি। Bernard Lewis বলেন ঃ 'মুহাম্মদ ও ইসলামের গোড়ার কথা' (Muhammad and the Origin of Islam) শীর্ষক এক প্রবন্ধে Earnest Renan মন্তব্য করেন, "অন্যান্য ধর্ম যেমন রহস্যাবৃত দোলনায় লালিত হয়েছিল, ইসলামের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত ; ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে ইতিহাসের পরিপূর্ণ আলোকে। ইসলামের শিকড়গুলো ভূপৃষ্ঠের দৃশ্যমান স্তরে প্রোথিত এবং তার প্রবক্তা ষোড়শ শতাব্দীর সংস্কারকদের মতই আমাদের কাছে সুপরিচিত!"[১]

রসূলুল্লাহ (স)-এর মৃত্যুর (৬৩২ খৃস্টাব্দ) পর অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর বাণী প্রচার করেন তাঁর পাঁচজন সাহাবী।[২] জাতিকে শাসন করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (স) যে সমস্ত নজীর স্থাপন করে গিয়েছিলেন, এই পাঁচজন সাহাবী তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন। তাঁদের মধ্যে চারজন[৩] তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ বন্ধু ও প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

এভাবে রসূলুল্লাহ্‌র ধর্ম প্রচারের অষ্টম বছরে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা, তাঁর চাচা আবূ তালিব এবং বিশ্বাসী পুত্রের সমর্থনকারী উপজাতির লোকেরা মক্কায় ফিরে যায়।

কিন্তু এখানেই দুঃসময় ও দুঃখ-কষ্টের শেষ হল না। অতি অল্প দিনের মধ্যেই রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর চাচা বনূ হাশিম গোত্রের প্রবীণ নেতা আবূ তালিবকে হারালেন এবং অচিরেই তাঁর অনুসরণ করলেন সর্বপ্রথম মুসলমান, নবীর প্রিয় স্ত্রী, উপদেষ্টা, সন্তানদায়িনী বিশ্বাসী খাদীজা। বয়কট অবসানের কথা শুনে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় গ্রহণকারীদের মধ্যে অনেকেই ফিরে আসেন। তাঁদের উপর অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা এতই বেড়ে যায় যে তাঁদের দুঃখ-কষ্টের আর সীমা রইল না।

মক্কায় ধর্ম প্রচার করা নিরর্থক মনে হল এবং কুরায়শদেরকে উত্তেজিত করাও বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। তাই তিনি নিজ গোত্র ও শহরের আশা ত্যাগ করে অন্য শহর ও গোত্রের কাছে প্রচারের কথা চিন্তা করতে থাকেন। মক্কার সবচেয়ে নিকটবর্তী ও শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল তায়েফ নগরী—মক্কা থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। খাদিম যায়দকে সাথে নিয়ে মুহাম্মদ (স) দূরতিক্রম্য গিরিশ্রেণী অতিক্রম করে তায়েফে গিয়ে পৌছেন। তিনি উপজাতীয় সর্দারদের সাথে দেখা করে অতি নম্রভাবে তাদের সাহায্য কামনা করলেন। কিন্তু তাঁর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং তাঁর সাথে রূঢ় ব্যবহার করা হয়। তাঁর পেছনে ভবঘুরে এবং অর্বাচীন ছেলেদেরকে লেলিয়ে দেয়া হয়। তারা তাঁকে তাড়া করে বেড়ায়, একটু বিশ্রামের সুযোগও দেয়া হয় না। তিনি অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর পা থেকে রক্ত ঝরতে থাকে। অবসন্ন হয়ে তিনি বসে পড়েন এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে দয়া প্রার্থনা করেন। সেদিনকার সেই প্রার্থনাটি সংকটকালে আল্লাহ্‌র কাছে ভক্ত মুসলিম কিভাবে তার আর্ত প্রাণের আকূতি জানায়, তার নমুনাস্বরূপ একটি অতি মূল্যবান উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদরূপে রক্ষিত হয়ে আছে।

অবসন্ন শরীরের সবটুকু শক্তি প্রয়োগে ক্লান্ত পদক্ষেপে তিনি মক্কাভিমুখে প্রত্যাগমন শুরু করেন এবং তিন দিন পরে মক্কার উপকণ্ঠে পৌছান। ভক্ত যায়দ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে হযরতকে জিজ্ঞেস করলেন, যে বৈরী কুরায়শরা মক্কায় ক্ষমতাহীনদের বিরুদ্ধে তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র এবং অত্যাচার অব্যাহত রেখেছে তাদের হাতে নিজেকে ঠেলে দেয়া আশংকাজনক নয় কি ? নবী করীম (স) উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্‌ই তাঁর ধর্ম ও তাঁর নবীকে রক্ষা করবেন।" তায়েফে মুহাম্মদ (স)-এর বিপর্যয়ের কথা মক্কাবাসীরা অবগত হয়েছিল। তারা তাঁর অপমানজনক অভ্যর্থনার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মক্কার যে সব প্রধানের কাছে নবী করীম (স) নিরাপদে শহরে প্রবেশের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন, তাঁরা কেউ তাঁকে সাহায্য করেনি। কিন্তু মুত'ইম ইবন্ আদী

www.nagorikpathagar.org

নামক জনৈক সদয় পৌত্তলিক প্রধান হযরতের নিরাপত্তার ভার নেন এবং তাঁকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দেন। এভাবে এক পৌত্তলিকের আশ্রয়ে, সহ-নাগরিকদের ভ্রূকুটির মুখে, অক্ষম অনুসারীদের করুণাসিক্ত শুভেচ্ছা বহন করে মুহাম্মদ (স) পুনরায় মক্কায় প্রবেশ লাভ করলেন।

উপর্যুপরি দুর্যোগের সেই বেদনাদায়ক বছরটিতে, যখন মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারের বিয়োগান্তক সমাপ্তি অবধারিত বলে মনে হচ্ছিল, তখন একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মি তাঁর উদ্যমকে সতেজ করে তুলল। হজ্জের মৌসুমে এবং পবিত্র মাসসমূহে যখন চিরাচরিত প্রথানুযায়ী আরব দেশে খুনখারাবি আর উৎপীড়ন বন্ধ থাকত তখন সৌভাগ্যক্রমে এক ফাঁকে য়াছরিব (মদীনা)[২৪] থেকে আগত কয়েকজন লোককে তিনি ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার সুযোগ পান। তাঁরা আকাবা নামক স্থানে মিলিত হন এবং নবীর প্রতি তাঁদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। ৬২১ খৃস্টাব্দের বসন্তকালে তাঁরা পুনরায় মক্কায় নবী করীম (স)-এর সাথে মিলিত হয়ে তাঁকে জানালেন যে, য়াছরিববাসীদের অনেকেই ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করছে। এই যাত্রায় তাঁদের সাথে এসেছিলেন য়াছরিবের দুটি প্রধান উপজাতির বারজন প্রতিনিধি। উপজাতি দুটির নাম হল আউস এবং খযরজ—মুসলিম ইতিহাসে এরাই পরবর্তীকালে 'আনসার' (সাহায্যকারী) নামে পরিচিত হয়েছিল। য়াছরিব প্রতিনিধিরা নবীকে জানান যে, তাঁদের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাঁরা প্রতিজ্ঞা করলেন যে, "আমরা আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না, চুরি, ব্যভিচার ও শিশুহত্যা করব না ; কোন অবস্থাতে আমরা কারো দুর্ণাম করবো না বা নবীর কোন ন্যায়ানুগ আদেশ অমান্য করব না।" এটাই পরবর্তীকালে প্রথম 'বায়'আতুল আকাবা' বা আকাবার প্রথম প্রতিশ্রুতি নামে খ্যাত। দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি এলো এক বছর পর অর্থাৎ পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে। এই যাত্রায় সত্তরজন য়াছরিববাসী আকাবার গোপন মিলনে নিজেদের এবং স্বগোত্রীয়দের পক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, তাঁদের স্ত্রী ও সন্তানদের মত নবীকেও তাঁরা রক্ষা করবেন।

মুসলমানদের পক্ষে মক্কায় বসবাস করা আর মোটেই নিরাপদ ছিল না। আবিসিনিয়া থেকে প্রত্যাগত ও নবদীক্ষিত মুসলমানদেরকে নবী করীম (স) তাই মক্কা ছেড়ে য়াছরিবে যাওয়ার নির্দেশ দেন। গোপনে তারা চলে যেতে শুরু করে। কয়েক মাসের মধ্যে একশ'রও বেশি পরিবার মক্কা ছেড়ে য়াছরিবে চলে যায়। কুরায়শরা তাদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখত, কারণ প্রতিদ্বন্দ্বী একটা শহরে নবী করীম (স) চলে গেলে তাদের মারাত্মক ক্ষতি হবে। যে কোন মূল্যেই হোক, এটা তারা হতে দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করল। তারা তাঁকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিল। ঠিক হল যে, সব কটি উপজাতির প্রতিনিধিরা একযোগে তাঁর বুকে তলোয়ার চালাবে, যেন

www.nagorikpathagar.org

হাশিমীরা এই যৌথ দায়িত্বমূলক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং কোন বিশেষ উপজাতির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ ব্যবস্থার পথ রুদ্ধ হয়।

তখন রসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে ছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত সহচর আবূ বকর (রা) ও আলী (রা)। শত্রুকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য হযরত আলী রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিছানায় শয়ন করেন আর রসূলুল্লাহ্ (স) হযরত আবূ বকরকে সাথে নিয়ে মক্কার কয়েক মাইল দক্ষিণে সওর পাহাড়ের একটা অবহেলিত গুহায় গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। মক্কাবাসীরা যখন আবিষ্কার করল যে, নবী তাদেরকে বোকা বানিয়েছে, তখন তারা চতুর্দিকে তল্লাশি চালাল। কিন্তু তারা তাঁকে ধরতে ব্যর্থ হয়। তিন দিন সেই গুহায় অবস্থান করার পর মুহাম্মদ (স) য়াছরিবের পথে যাত্রা করেন। তাঁর য়াছরিবে উপনীত হবার দিন একটি নবযুগের সূর্যোদয় হয়। এই ঐতিহাসিক সত্যের উপলব্ধিতে হিজরত বা 'পলায়ন'-এর বছরটি থেকে মুসলিমগণ ইসলামের নব যুগের সাল গণনা শুরু করেন। ৬২২ খৃস্টাব্দের ১৬ই জুন থেকে হিজরী সন শুরু হয়।[২৫]

উক্ত বছরের গ্রীষ্মকালে মুহাম্মদ (স) যখন য়াছরিবে প্রবেশ করেন, তৎপূর্বেই বহু নেতৃস্থানীয় আনসার ও কয়েকশ অন্য লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। সেখানে আরও ছিলেন মুহাজিরগণ (মক্কাত্যাগী মুসলমান)। শহরের উপকণ্ঠে তারা সবাই মুহাম্মদ (স)-কে স্বাগত সম্বর্ধনা জানায়। পৌত্তলিক ও য়াহূদীরাও তাঁকে স্বাগত জানায়, তবে প্রত্যেকে স্বতন্ত্র কারণে। আরবের য়াহূদীরা ছিল একত্ববাদী এবং তিনটি উপজাতিতে বিভক্ত হয়ে পৌত্তলিক আরবদের প্রতিবেশী হিসাবে তারা বাস করত। আদি নিবাস ইয়েমেন থেকে এসে পৌত্তলিক আরবগণ য়াছরিবে ক্রমে প্রাধান্য অর্জন করে। য়াহূদীরা মনে করল, একত্ববাদী হিসেবে মুহাম্মদ (স) পৌত্তলিক আরবদের এমনকি উত্তর আরবের খৃস্টানদের বিরুদ্ধে তাদের মিত্র হয়ে থাকবেন। পৌত্তলিকদের স্বাগত জানানোর পক্ষে ধর্মীয় কোন কারণ ছিল না। মক্কা ও য়াছরিবের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণেই তারা তাঁকে স্বাগত জানায়। তদুপরি মায়ের দিক থেকে মুহাম্মদ (স) তাদের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর মাতামহীর মা ছিলেন য়াছরিবের সবচাইতে নামকরা খযরজ গোত্রীয়। তাছাড়া 'আমার শত্রুর শত্রু' বলেও ত একটা যুক্তি আছে।

প্রত্যেক দলের সদস্যরা মুহাম্মদ (স)-কে অতিথিরূপে পাওয়ার জন্য তাঁর উটকে নিজ নিজ এলাকার দিকে চালাতে চেষ্টা করে। উটকে তার ইচ্ছানুযায়ী চলতে দেয়ার কথা তিনি সকলকে বললেন। উট যেখানে থামবে, সেখানেই তিনি অবস্থান করবেন এবং তা হবে সকলের জন্যই উত্তম। অবশেষে উট যেখানে এসে থামল সে স্থানেই তিনি তাঁর বাসস্থান নির্ধারণ করেন। আজ সে স্থানটিই সবচেয়ে পবিত্র স্থান এবং সেই

www.nagorikpathagar.org

স্থানেই রসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র কবর বিদ্যমান। প্রতি বছর হাজার হাজার মুসলমান হজ্জযাত্রী তা যিয়ারত করে থাকেন।

সেই স্থানেই তিনি বাস করেন, নতুন জাতির জাতীয় জীবন পরিচালনা করেন এবং সেখানেই তিনি ইসলামের প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। সেই স্থানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তের বছর ধরে টিকে থাকার কঠোর সংগ্রাম করার পর অবশেষে তিনি এই মিত্র শহরে স্থান লাভ করেন। এখানে তিনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলেন এবং এই শহরটিকে তাঁর ভবিষ্যত কর্মযোগের ঘাঁটিরূপে ব্যবহার করেছিলেন।

মক্কার কুরায়শরা চিন্তিত হয়ে পড়ল। আরবের সমস্ত এলাকাতে কায়েমী স্বার্থের ধারকরূপে বহুত্ববাদ ও বিভিন্ন গোত্রীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মূর্তিগুলোর অভিভাবক হিসেবে এবং সমগ্র আরবে সমাদৃত মক্কা তীর্থের নেতৃত্বে সমাসীন হিসেবে কুরায়শরা ছিল বিস্তর ক্ষমতার অধিকারী। তাদের মক্কা নগরী ছিল যুগপতভাবে আরবীয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাংক ব্যবস্থার কেন্দ্র। এই ব্যাংক ব্যবস্থায় মহাজনরা বিভিন্ন গোত্রের লোকের নিকট চড়া সুদে টাকা ধার দিত। তাদের বিদ্রোহী জ্ঞাতি মুহাম্মদ (স) প্রতিদ্বন্দ্বী শহরে আশ্রয় নিয়ে সেখানে একটি শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করেছে সিরিয়া ও উত্তরাঞ্চলের বাণিজ্য পথের ওপর আড়াআড়িভাবে, যাতে এই পথ আগলান তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। তদুপরি মুহাম্মদ (স)-এর সাথে তাদের অনেক ছেলেমেয়েও শত্রু-শিবিরে যোগ দিয়েছে। তারা জানত যে, মুহাম্মদ (স) তাঁর ধর্মের ব্যাপারে কোন আপস করবে না। ফলে তাঁর সাথে শান্তি স্থাপন অসম্ভব।

মুহাম্মদ (স) শুধু তাঁর নিরাপত্তার জন্যই আশ্রয় গ্রহণ করেননি। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ এবং তাঁর কাজ ছিল তাঁর নিজের গোত্র এবং মাতৃভূমি থেকে মূর্তিপূজা উৎখাত করা। তাঁর নতুন জাতিকে অবশ্যই মূর্তিপূজা, সুদ খাওয়া, অসৎ কাজ, মদ্যপান, অনর্থক গোত্রীয় রেষারেষি ত্যাগ করতে হবে এবং সর্বোপরি সকলকেই মুসলিম হতে হবে অর্থাৎ তাদেরকে সেই একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, যার কোন অংশীদার নেই এবং যার কাছে একদিন সবাইকে ফিরে গিয়ে তাদের কার্যাবলীর হিসাব দিতে হবে।

য়াছরিবে যাওয়ার পর মুহাম্মদ (স)-এর সর্বপ্রথম কাজ ছিল মুসলিম জনসাধারণের ইবাদতের জন্য একটা মসজিদ তৈরি করা, যেখানে তাঁরা সমবেত হবেন এবং তাঁদের মধ্যে নানা ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন। আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম দুনিয়ার অন্যান্য বৃহৎ ধর্ম যথা— বৌদ্ধ, হিন্দু বা খৃস্ট ধর্ম থেকে আলাদা। ইসলাম এমন একটি রাজনৈতিক এবং সামাজিক

www.nagorikpathagar.org

ব্যবস্থার প্রবক্তা, যে ব্যবস্থাটি অতি সাবধানতার সাথে প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে সে ব্যবস্থাটি পরলোকের দিশারী হতে পারে। যদি Kingdom of God in Heaven অর্জন করতে হয় তবে তা অর্জন করতে হবে যাকে বলা যায় Kingdom of God on Earth-এর মাধ্যমে তথা ব্যক্তির পুণ্যময় জীবন এবং সমষ্টির একটি সুষ্ঠু সামাজিক এবং রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে।

মক্কায় মুহাম্মদ (স)-এর প্রচার তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য ছিল ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলো তথা আল্লাহ্‌র একত্ব, পুনরুত্থান, বিচারের দিন, ইবাদত পদ্ধতি এবং আত্মার শুচিতা সাধন। য়াছরিবেও এই তৎপরতা চলতে থাকে, তবে এখানে তিনি 'উম্মা' তথা নতুন জাতিকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে সংগঠিত করার সুযোগ লাভ করেন। তাই একটি সংবিধান এবং একটি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দিল। এই নতুন জাতিকে একটি নিজস্ব সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রের জনক হতে হবে। শত্রুদের পরিচালিত ইসলাম-ধ্বংসী ভয়াবহ যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র বাণী দ্বারা চালিত রসূলুল্লাহ্ (স) একটা নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে সক্ষম হলেন।

এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলা করতে গিয়ে নবী করীম (স) আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে চলে এবং নিজ স্বভাবগত প্রবণতার সাহায্যে বিভিন্ন গোত্র থেকে আগত মুসলিম সমষ্টিকে এমন এক বলিষ্ঠ মুসলিম জাতিতে পরিণত করলেন, যে জাতির একক আনুগত্য ছিল ইসলামের প্রতি এবং যার ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সমস্ত গোত্রীয় আনুগত্যের ঊর্ধে স্থাপিত হল। তাঁর দ্বিতীয় কাজ ছিল, প্রতিবেশী য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের সাথে মিত্রতার মাধ্যমে য়াছরিবের শান্তি ও নিরাপত্তার তাকীদে একটা অভিন্ন দেশরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এর জন্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এটাই ছিল বিখ্যাত য়াছরিব চুক্তি। কিছুটা লীগ অব নেশন্স বা ইউনাইটেড নেশন্স-এর চুক্তিসদৃশ। উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যৌথ নিরাপত্তা ও শান্তি রক্ষার দায়িত্ব সচেতনতার ভিত্তিতে একটি অভিন্ন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

পরবর্তী সমস্যা ছিল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিরূপ হবে—গতিময় না স্থিতিশীল ? বেদুইন অধ্যুষিত আরবে স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা চরম প্রয়োজনে চূড়ান্ত ব্যবস্থা রূপেই কেবল চলতে পারে—গত্যন্তর না থাকলে শেষ অবলম্বন হিসেবেই এই ব্যবস্থা। কারণ এই ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা এবং কষ্টসাধ্যতার সংস্রব রয়েছে। এই ব্যবস্থার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, এতে ইসলাম প্রচার এবং নতুন উম্মার ক্রমবর্ধন থেমে যাবে। মুহাম্মদ (স) ছিলেন মূলত সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র নবী। শুধু মক্কা বা য়াছরিব বলে নয়, সমগ্র মানব জাতির মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য তিনি

www.nagorikpathagar.org

ছিলেন আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি। ইসলাম প্রচার করাই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। তাই তিনি স্থিতিশীল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিপক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় হিজরী সনে রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর গতিময় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তিপত্তন করলেন। তৃতীয় হিজরী সনে এই ব্যবস্থায় তিনি য়াছরিবের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত 'বদর' প্রান্তরে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁর দলে ছিল অনধিক তিন'শ পদাতিক ও তিনজন অশ্বারোহী সৈন্য। এদের বর্ম বলতে কিছু ছিল না, তলোয়ার ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না এবং সরবরাহ ছিল অত্যন্ত সীমিত। শত্রুপক্ষ কুরায়শদের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা ছিল তিনগুণ, একশ অশ্বারোহী সৈন্য এবং বিস্তর সামগ্রীবাহী কাফেলা। তবুও নবী করীম (স)-এর বাহিনী তাদেরকে পরাস্ত করে। এই জয়ের কারণ ছিল তাদের শৃঙ্খলা, উন্নতমানের নেতৃত্ব ও দৃঢ় মনোবল ; এর উৎস ছিল আল্লাহ্‌র প্রতি অটল বিশ্বাস ও পরকালে পুরস্কারের প্রতিজ্ঞা।

বদর যুদ্ধ ইসলামের এক বিরাট বিজয়ের সূচনা করে। এই যুদ্ধ মুসলিম দলকে একটি পৃথক সামাজিক ও রাজনৈতিক এবং সর্বোপরি ধর্মীয় সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান করে এবং রসূলুল্লাহ (স)-এর শক্তির প্রমাণ বহন করে কিন্তু এতে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না। কুরায়শ যুদ্ধবন্দীদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (স) বীরধর্মসম্মত মানবোচিত আচরণ করেন। য়াছরিবের চতুর্দিকস্থ এলাকার পৌত্তলিক বেদুইনদের[২৬] কাছে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে গেল। বদরের যুদ্ধের সময় এসব বেদুইন পরাজিত দলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের সবকিছু লুট করার জন্য অপেক্ষমাণ শকুনীর মত সুযোগের প্রতীক্ষা করছিল। কুরায়শরা আরবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল বলে তাদের বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে এই বেদুইনরা অবশ্যই ভয় পেয়েছিল। কিন্তু রসূলুল্লাহ্ (স)-এর দল পরাজয়ের সুযোগ কাটিয়ে ওঠার মত বা আরব বেদুইনদের লুটের লালসাকে রুখে দাঁড়াবার মত শক্তি তখনও অর্জন করতে পারেনি। অথচ আল্লাহ্ আপন অনুসারিগণকে রক্ষা করলেন যারা বিজয়ে কখনও গর্ব প্রকাশ করেন নি, বরং একবাক্যে স্বীকার করেছেন—এই বিজয় আল্লাহ্‌রই। এমনকি ফিরিশতারাও পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করেছিলেন।

মক্কাবাসী যুদ্ধবন্দীদেরকে নিয়ে প্রথম মুসলিম বাহিনী য়াছরিবে ফিরে এলো। বন্দীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল রসূলুল্লাহ (স)-এর গোত্রের লোক। তাদের প্রতি মুসলমানরা খুবই সদয় ব্যবহার করেন এবং তাদেরকে মক্কায় পাঠিয়ে দেন।

তৃতীয় হিজরী সনে মুহাম্মদ (স) তাঁর অব্যাহত প্রচার ও ইবাদতের সাথে সাথে তাঁর জাতিকে সুসংহত করেন ও য়াছরিবের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দিকে মনোনিবেশ করেন। তাঁর শত্রুরাও চুপ করে বসে ছিল না। এক বছর পর তারা প্রস্তুত

www.nagorikpathagar.org

হয়ে পুনরায় য়াছরিব অভিমুখে যাত্রা করে। এবার তাদের সৈন্যসংখ্যা ছিল বদর যুদ্ধে পরাজিত সৈন্য সংখ্যার প্রায় তিনগুণ। তাদেরকে বাধা দেয়ার জন্য নবী করীম (স) অগ্রসর হলেন এবং ওহোদ পাহাড়ের পাদদেশে তাদের মুখোমুখি হন। তুমুল যুদ্ধের পর মুসলিম বাহিনী পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয় এবং রসূলুল্লাহ্ (স) নিজেও আহত হন। কিন্তু তাঁর সহনক্ষমতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং অসাধারণ সাহসিকতাপূর্ণ নেতৃত্বের বলে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনীকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। মক্কী বাহিনীর অধিনায়ক আবূ সুফিয়ান পাহাড়ের চূড়া থেকে ঘোষণা করল, "বদরের বদলায় ওহোদ, আমরা বলি, হারজিত সমানে সমান ; পরের বছর আবার দেখা হবে।" উভয় দল নিজ নিজ ঘাঁটিতে ফিরে গেল। কিন্তু এটাই শেষ ছিল না। বদর যুদ্ধের মত ওহোদেও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হল না।

দু'বছর পর কুরায়শরা আরও বিরাট এক সৈনাদল গঠন করে। অন্যান্য উপজাতির সাথে আঁতাত করে তারা দশ হাজার সৈন্যের এক অভিযান প্রেরণ করতে সক্ষম হয়। এদের সমরাস্ত্র আর সামগ্রী ছিল প্রচুর। অন্যদিকে রসূলুল্লাহ (স)-এর সৈন্যদল ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আক্রমণকারীরা য়াছরিব শহর অবরোধ করে মুসলিম ব্যূহ ভেদ করবার জন্য দু' সপ্তাহ ধরে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। মুহাম্মদ (স) এবার এক নতুন রক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন অর্থাৎ পরিখা খনন করলেন, পথরোধক স্থাপন করলেন এবং একাজে তিনি নিজেও সবার সাথে দিন-রাত পরিশ্রম করলেন। আল্লাহ্র উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস এবং তাঁর অনুসারীদের, বিশেষ করে মুহাজির ও আনসারদের অসীম সাহস ও কর্তব্যনিষ্ঠা শত্রুপক্ষের সংখ্যা গরিষ্ঠতা এবং সমর-সজ্জাকে ব্যর্থ করে দিল। একদিন হঠাৎ করে প্রবল বায়ুতে ধূলিঝড় শুরু হয়। সন্ধ্যার আগমনে আহযাব[২৭] অর্থাৎ সম্মিলিত বাহিনীর মনোবল ভেঙে যায়। তাদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয় এবং শেষে তাঁবু গুটিয়ে তারা পশ্চাদপসরণ করে। মুসলমানরা কিছুদূর পর্যন্ত তাদের পিছু ধাওয়া করে। য়াছরিবের শত্রু ঘাঁটি ধ্বংস করার এটাই ছিল কুরায়শদের শেষ প্রচেষ্টা।

এই ঘটনার এক বছর পর তথা ষষ্ঠ হিজরীতে মুহাম্মদ (স) একদল অনুসারীসহ তাঁর জন্মস্থান মক্কা নগরী অভিমুখে অগ্রসর হন। কাবাগৃহে 'উমরা' সম্পন্ন করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল। কাবাগৃহে বহু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকা সত্ত্বেও মুসলমানরা এই ঘরকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করতেন ; কারণ হযরতের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র ইবাদতের জন্যই হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা ঘর তৈরী করেছিলেন। কাবার নিকটবর্তী স্থানে যমযম কূপের কাছে হযরত ইবরাহীম (আ) তাঁর মিসরীয় স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলের বসবাসের স্থান নির্দেশ করেন। কুরায়শগণ ও উত্তর আরবের অন্যান্য গোত্র হযরত ইসমাঈল (আ)-এর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বংশধর। তাই মুসলমানরা

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইবরাহীম (আ), যিনি ছিলেন একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদতকারী প্রথম আরববাসী, তিনি যে কাবাগৃহ নির্মাণ করেছিলেন সেখানে ইবাদত করার সম্পূর্ণ অধিকার তাঁদের আছে। কিন্তু মক্কাবাসীরা তাদের এ অধিকার স্বীকার করল না বরং তারা মুসলমানদের মক্কা প্রবেশে বাধা দিতে উদ্যত হল। অবশেষে উভয় পক্ষের মধ্যে দশ বছর মেয়াদী এক সন্ধি[২৮] স্বাক্ষরিত হয়। সন্ধির শর্তানুসারে মুহাম্মদ (স) পরবর্তী মৌসুম পর্যন্ত হজ্জ পালন স্থগিত রাখতে সম্মত হন।

মুসলমানদের মক্কা যাত্রা এবং সে উপলক্ষে এই সন্ধি ইসলামের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ ধর্ম প্রচার ও পালন করার অধিকার এই প্রথমবারের মত চুক্তির মাধ্যমে স্বীকৃত হল। সন্ধি স্বাক্ষরিত হওয়ার একবছর পর মুহাম্মদ (স) দু'হাজার লোক নিয়ে মক্কায় প্রবেশ করেন। সন্ধির শর্তানুসারে মক্কাবাসীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সাময়িকভাবে মক্কা খালি করে দেয়। মুসলমানরা অত্যন্ত প্রশংসনীয়ভাবে হজ্জ পালন করে। এতে মক্কাবাসীরা এত বেশি মুগ্ধ হয়ে পড়ে যে, দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। চারদিক থেকে আরব উপজাতীয়রা য়াছরিবে প্রতিনিধি সংঘ প্রেরণ করে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করতে লাগল।

দু'বছর পর যখন সন্ধির শর্ত লংঘন করে কুরায়শরা মুসলমানদের মিত্র উপজাতি 'খুযা'আ গোষ্ঠীকে আক্রমণ করল, তখন মুহাম্মদ (স) দশ হাজার অনুসারী নিয়ে এক অভিযানে মক্কা দখল করেন ১০ই রমযান বুধবার (অষ্টম হিজরী ৬৩০ খৃষ্টাব্দ)। এই স্মরণীয় দিনে তিনি মক্কাবাসীকে জিজ্ঞেস করেন, "আমি কিরূপ ব্যবহার তোমাদের প্রতি করব, সে ব্যাপারে তোমরা কি ভাবছ ?" তারা উত্তরে বলল, "আপনি মহানুভব ভাই এবং মহানুভব ভাই-এর পুত্র।" রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, "যাও, তোমরা মুক্ত।"

ঐতিহাসিক লেন পুল (Lane Poole) লিখেছেন, "পরম শত্রুর উপর মুহাম্মদের সেই চূড়ান্ত বিজয়ের দিনটি ছিল আপন চিত্তের ওপরও একটি সুমহান বিজয়ের দিবস। যে কুরায়শরা বছরের পর বছর তাঁকে অমানুষিক অত্যাচার আর নির্দয় ভ্রূকুটিতে জর্জরিত করেছে, সেই কুরায়শদের তিনি অকাতরে ক্ষমা করেন এবং সমগ্র মক্কাবাসীর জন্য সাধারণ নিরাপত্তা ঘোষণা করেন। জঘন্যতম শত্রুর শহর মক্কায় বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করার দিন কেবল চারজন অপরাধী প্রাণদণ্ডাজ্ঞার তালিকায় স্থান পেয়েছিল, কারণ ন্যায়ের চোখে তারা ছিল দণ্ডনীয়। তাঁর সৈন্যরাও তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, শান্তিপূর্ণ এবং দর্পহীন গাম্ভীর্যের সাথে শহরে প্রবেশ করে, কোন ঘর-বাড়ি লুট হয়নি বা কোন মেয়েকেও অপমান করা হয়নি। কেবলমাত্র একটি জিনিসই ধ্বংস হয়ে গেল। কাবায় প্রবেশ করে মুহাম্মদ (স) একে একে তিনশ ষাটটি মূর্তির

www.nagorikpathagar.org

সামনে গিয়ে তাদের প্রতি তাঁর লাঠি উঁচিয়ে বললেন, "সত্য সমাগত এবং মিথ্যা তিরোহিত হয়েছে।" একথা বলার সাথে সাথে তাঁর সঙ্গীরা কুঠারাঘাতে মূর্তিগুলোকে ভেঙে ফেলেন। এভাবে সবগুলো বিগ্রহ এবং মক্কার সন্নিহিত এলাকার গৃহদেবতাদের মূর্তিগুলোকে ধ্বংস করা হয়।[২৯]

মক্কা বিজয়ের পর মুহাম্মদ (স) আর এক অদম্য শত্রুর নগরী অতি মহিমান্বিত 'হুবল' দেবের বাসভূমি তায়েফ-এর দিকে অভিযান করতে বাধ্য হন। তাঁর প্রতি মর্মন্তুদ নির্যাতনের দিনে আশ্রয় লাভের আশায় তিনি সফর করেছিলেন এই তায়েফ-এ, আশ্রয়ের পরিবর্তে পেয়েছিলেন অপমান আর অমানুষিক নির্যাতন। ইতিমধ্যে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মক্কার পতনের পর তায়েফবাসীরা শান্তির জন্য সন্ধির প্রস্তাব যৌক্তিক বিবেচনা করবে বলে তিনি ভেবেছিলেন। কিন্তু তা না করে তারা হাওয়াজিন নামে খ্যাত বিরাট সম্মিলিত উপজাতীয় শক্তিকে এবং তায়েফের নাগরিকগণকে যুদ্ধযাত্রায় উদ্বুদ্ধ করে তাদের দেবতা হুবলের শত্রুর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত মীমাংসা করার জন্য তৈরী হয়। পক্ষদ্বয় হুনায়ন নামক স্থানে মিলিত হয়। মুসলমান বাহিনী ছিল তাঁদের তখনকার পক্ষে সর্ববৃহৎ বাহিনী। তবুও তাঁরা শত্রুর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে পিছু হটতে থাকে। এই সময় রসূলুল্লাহ্ (স) সুদক্ষ আনসার ও মুহাজির বীরগণকে আহ্বান করেন এবং তাকে কেন্দ্র করে তাঁর ব্যূহ রচনা করতে সক্ষম হন। মুহাম্মদ (স) আহত হওয়া সত্ত্বেও বীরবিক্রমে যুদ্ধ করায় মুসলমানরা জয়ী হয়। যুদ্ধজয়ের পর মুহাম্মদ (স) তাঁর পুরান শত্রু ও নিগ্রহকারীদের প্রতি এত বেশি মহানুভবতা দেখালেন যে, তাঁর অনুসারী আনসারদের মধ্যে কেউ কেউ তাতে মৃদু আপত্তি তোলেন। কিন্তু নবী করীম (স) তাঁদেরকে এমন প্রজ্ঞাময় এবং সুবিবেচনাপূর্ণ কথায় নিরস্ত করেন এবং তাঁদের সহমর্মিতার উদ্রেক করেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরা কেঁদে ফেলেন।

য়াছরিবে ফিরে আসার পর তাঁর কাছে আরবের বিভিন্ন বেদুইন গোত্র ও স্থায়ী বাসিন্দাদের পক্ষ থেকে প্রেরিত বহু প্রতিনিধি সংঘ ক্রমাগত আসতে থাকে। তারা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করতে থাকে। এভাবেই আরব দেশ ইসলামের পতাকাতলে আসে।

কিন্তু বিশ্বের অন্যান্য অংশের ব্যাপারে কি করা যায় ? বরাবর থেকে তার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যই তাঁর এই মিশন। ইতিপূর্বেই তিনি আরবের প্রতিবেশী পারস্য ও রোম (বাইজেন্টাইন) সম্রাটদের কাছে দূত প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা মুহাম্মদ (স)-এর বাণীকে অবজ্ঞা করে বা দূতগণকে অপমান করে। সৌজন্যমূলক উত্তর পাওয়া গেল একমাত্র মিসরের খৃস্টান (Coptic) নেতার কাছ থেকে। সিরিয়ার দক্ষিণাংশে (বর্তমান জর্দান) তাঁর কতিপয় দূতকে নির্দয়ভাবে

www.nagorikpathagar.org

হত্যা করা হয়। এ কারণেই পরবর্তীকালে মূতার (Mutah) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মূতা যুদ্ধে শত্রুর পরাজয়ের পর কয়েক বছর যাবত মুসলমানদের এবং বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা চলতে থাকে। নতুন এই আরব উপদ্রবটির সাথে বোঝাপড়া করার জন্য হিরাক্লিয়াস সিরিয়ায় প্রচুর সৈন্য সমাবেশ করতে থাকে। উদ্দেশ্য—সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তের এই দাম্ভিক আরব শাসকটির বুজরুকী স্তব্ধ করে দেয়া।

এজন্য এবং অন্যান্য কারণে মুহাম্মদ (স) একটি বড় রকমের বাহিনী গড়ে উত্তরাভিমুখে অভিযানের সংকল্প করলেন। এটাই তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ পরিকল্পনা। তিনি দিকনির্দেশ করে গেলেন। তাঁর মৃত্যুর অনতিকাল পরেই তাঁর অনুসারীরা উত্তরাভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখেন এবং চার বছর পর পরাক্রান্ত পূর্ব রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য জয় করেন।

দশম হিজরীতে রসূলুল্লাহ্ (স) মক্কায় তাঁর জীবনের সর্বশেষ হজ্জ সমাপন করেন এবং 'মিনা' নামক স্থানে চল্লিশ হাজার মুসলমানের সমাবেশে তিনি তাঁর জীবনের সর্বশেষ বিদায় ভাষণ দেন। তিনি বলেন, "সমবেত জনমণ্ডলী, আপনারা আমার কথা শুনুন। এ বছরের পর এ জীবনে আমি আর এখানে আপনাদের সাথে মিলিত নাও হতে পারি।" তারপর তিনি তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন যে, তাঁর ভয় হচ্ছে, মুসলমানরা আবার হয়ত আল্লাহ্র পথ পরিত্যাগ করে আগেকার সেই অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলাময় গোত্রীয় অন্তর্কলহে লিপ্ত হতে পারে। বহু বিধান ঘোষণা সম্বলিত স্মরণীয় বক্তব্যের শেষে তিনি তাঁর উম্মাকে জিজ্ঞেস করেন, তিনি কি তাঁর বাণী বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে প্রচার করেছেন ? সমস্বরে সকলে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, আপনি তা যথার্থভাবে করেছেন।" তখন তিনি বলেন, "আল্লাহ্ ! তুমিই আমার সাক্ষী" এবং এরপর তিনি উটের পিঠ থেকে অবতরণ করেন।

মুসলমানরা মুহাম্মদ (স)-এর এই ভাষণকে 'বিদায় ভাষণ' এবং এই হজ্জকে 'বিদায় হজ্জ' বলে অভিহিত করেন। তেইশ বছর আগে জিব্রাঈলের মাধ্যমে প্রথম 'ওহী' আসার পর থেকে ক্রমান্বয়ে 'ওহী' আসা অব্যাহত থাকে। মুহাম্মদ (স) ও তাঁর অনুসারীরা এগুলো মুখস্থ করেন ও লিখে রাখেন। এ সব ওহীর সমষ্টি ইসলামের গৌরবময় গ্রন্থ কুরআনে রূপ লাভ করে। ভাষণ শেষে আল্লাহ্র নাম নিয়ে তিনি তাঁর সর্বশেষ ওহীর বাক্যগুলো উচ্চারণ করেন ঃ

"আজ আমি (আল্লাহ্) তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন ব্যবস্থাকে পূর্ণ রূপ দান করলাম, পূর্ণ করে দিলাম আমার নিয়ামতকে তোমাদের জন্য এবং তোমাদের ধর্মরূপে ইসলামকে মনোনীত করলাম।"[৩০] তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা কেঁদে ফেলেন। তাঁরা

www.nagorikpathagar.org

বুঝতে পারলেন যে, তাঁর অন্তিম সময় নিকটবর্তী, তিনি তাঁর 'মিশন' পূর্ণ করেছেন এবং সত্যই তিনি তা করেছিলেন।

জ্বরে আক্রান্ত হয়ে মুহাম্মদ (স) য়াছরিবে মারা যান। য়াছরিবকেই পরবর্তীকালে 'আল-মদীনা' নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁর জীবন, দুঃখভোগ এবং বিজয় মুসলিম-অমুসলিম সবার জন্য নম্রতা, নিষ্কলুষ একাগ্রতা, আল্লাহ্‌র দাসত্বে আত্মোৎসর্গের মূর্ত প্রতীকরূপে, সর্বোপরি মানবিকতার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণরূপে চিরকাল অম্লান হয়ে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহানবীর বাণীর মৌলিক নীতি

মৌলিক দুটি নীতি

মহানবীর শাশ্বত বাণী দুটি মৌলিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ঈমান (বিশ্বাস) ও সৎ কাজ (ইহ্সান)। এই দুয়ের উপর ভিত্তি করেই ইসলামের কাঠামো গড়ে ওঠে, এই দুয়ের থেকেই অনেক শাখা বের হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এ দুটি নীতির ওপরই নির্ভরশীল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

"(হে মুহাম্মদ) যারা (তোমার ওপর অবতীর্ণ ওহীতে) বিশ্বাস করে আর যারা হচ্ছে য়াহূদী, খৃস্টান এবং সাবেইন যারাই আল্লাহ্তে বিশ্বাস রাখে, শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"[১]

"যে কেউ সৎ কর্মপরায়ণ হয়ে তার সত্তাকে আল্লাহ্র নিকট সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে তার ফল তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিতও হবে না।"[২]

"ধর্মের ব্যাপারে সেই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কে, যে আল্লাহ্র কাছে নিজ সত্তাকে সমর্পণ করেছে আর (মানুষের জন্য) হিতকর কাজ করে ?"[৩]

এ আয়াতগুলো এবং এ ধরনের আরও অনেক আয়াতের মধ্যে ইসলামের মৌলিক অনুশাসনগুলো এবং মহানবীর বাণীর সার তথা বিশ্বাস, ইবাদত ও আইন বিধৃত রয়েছে। এর মধ্যেই নিহিত রয়েছে নবী করীম (স)-এর বাণীর সারল্য, প্রভাব ও সার্বজনীনতা এবং পণ্ডিত ও সাধারণ মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বাণীর দ্রুত পরিব্যাপ্তির গূঢ় রহস্য। এর মধ্যেই নিহিত আছে এই মহান বাণীর ইতিহাস—মানুষের ইতিহাসের শুরু থেকে যাঁরা এই বাণী প্রচার করেছেন তাঁদের মধ্যে মুহাম্মদ (স) হচ্ছেন তার শেষ প্রচারক। কুরআনের কথা ঃ

"বল (হে মুসলমান), আমরা আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছি, আমাদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার ওপরে আমরা আস্থাবান। ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানগণের কাছে যা নাযিল হয়েছে, মূসা ও ঈসা যা কিছু

www.nagorikpathagar.org

পেয়েছেন, আরও সব নবী তাঁদের পালনকর্তার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন, আমরা এ সব বাণীর ওপরেও ঈমান এনেছি।"[৪]

এ বাণী শাশ্বত, কারণ এর রচয়িতা আল্লাহ্ নিজেও শাশ্বত। মুহাম্মদ (স) এসেছিলেন এই বাণী প্রচারের জন্য, একে পুনরুজ্জীবিত এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং 'ঈমান ও ইহ্সান'—এ দুটি মৌলিক নীতির অর্থ সম্প্রসারণের দায়িত্ব নিয়ে।

এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস

একেশ্বরবাদী ধর্মসমূহের মূলনীতি হল ঃ সমগ্র সৃষ্টির একক, লা-শরীক রচয়িতা আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা। মুহাম্মদ (স)-এর বাণীরও এটাই ছিল উৎসমূল। সেই নির্ঝর থেকে উৎসারিত স্রোত যে পথের দিশা, সৎ জীবন ও শান্তির যে গূঢ় তত্ত্ব বয়ে এনেছিল, তাই দিয়ে সর্বশক্তির আধার আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স)-এর অন্তঃকরণে এক দুর্বার প্লাবনের সৃষ্টি করেছিলেন। বিশ্বাসই ছিল সেই বার্তাবাহী প্রত্যাদেশের গুরুগম্ভীর অনুরণন ধ্বনি, যা নভোমণ্ডল এবং ভূমণ্ডলের সর্বত্র থেকে মুহাম্মদ (স)-কে সম্বোধন করে বলেছিল ঃ

"পাঠ কর, তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে। পাঠ কর ঃ তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত যিনি কলমের সাহায্যে (লিখতে) শিক্ষা দিয়েছেন, শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।"[৫]

"হে বস্ত্রাচ্ছাদিত ব্যক্তি, ওঠ এবং (মানবকে) সতর্ক করে দাও। তোমার প্রভুর মহিমা ঘোষণা কর, তোমার ভূষণ পবিত্র কর, অপবিত্রতা ত্যাগ কর, পার্থিব প্রতিদানের প্রত্যাশায় অনুগ্রহ প্রদর্শন (দান) করো না এবং তোমার প্রতিপালকের (সন্তুষ্টির) খাতিরে ধৈর্যশীল হও।"[৬]

"এভাবে আমি তোমার [মুহাম্মদ (স)] প্রতি নাযিল করেছি কিতাব তথা আমার নির্দেশ। তুমি ত জানতে না, কিতাব কি এবং বিশ্বাস কি ? পক্ষান্তরে আমিই ত একে একটা উজ্জ্বল আলোকে পরিণত করেছি—যার দ্বারা আমি আমার দাসদিগের মধ্যে যাকে ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি ; তুমি ত কেবল সরল পথই প্রদর্শন কর—আল্লাহ্র পথ। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা তাঁরই। সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ্র কাছে।"[৭]

অতপর মুহাম্মদ (স) এক আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে তাঁর আত্মীয়-স্বজন ও গোত্রের লোকদের প্রতি আহ্বান জানান। এই আহ্বানে তাদের কেউ সাড়া দিল না বরং এ ধরনের প্রচার থেকে তাঁকে বিরত রাখার চেষ্টা করল। তাঁর বিরুদ্ধে সর্বত্র সন্দেহ ছড়াতে শুরু করল। সেই সাথে তাঁকে যাদুকর, গণক ও পাগল বলে তারা প্রচারও শুরু করে দিল। শুধু তাই নয়, প্রচার পরিত্যাগ করার জন্য তারা তাঁকে ধন-

www.nagorikpathagar.org

সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রলোভন দেখাল যথেষ্ট। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না— মুহাম্মদ (স) এ সবের দিকে ভ্রূক্ষেপও করলেন না। অতপর তারা তাঁকে বাধা দিতে শুরু করল। নানাভাবে অত্যাচার ও ক্ষতিগ্রস্ত করতে লাগল। কিন্তু তিনি অটল রইলেন। আবূ তালিবকে যা তিনি বলেছিলেন, তা-ই তিনি তাদেরকে বলতেন, "আল্লাহ্ সাক্ষী, তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবু আমি আমার বাণী প্রচার বন্ধ করব না। প্রচার বন্ধ করার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় মনে করব।" বস্তুত আল্লাহ্ যা নির্দেশ করেছেন এবং যে বিশ্বাস তাঁর হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করেছে পূর্ণরূপে, তার প্রচার তিনি বন্ধ করেননি বা সেই বিশ্বাস থেকে তিনি কখনো বিচ্যুতও হননি। লা-শরীক আল্লাহ্‌র ইবাদত সকল মানুষকে একত্রিত করাই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।[৮]

সৃষ্টির আদি থেকেই বিমূঢ় মানুষ নিজস্ব স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির দ্বারা নিরাপত্তার জন্য এক অদৃশ্য শক্তির আশ্রয় খুঁজে আসছে। এ ধরনের অদৃশ্য শক্তির কাছ থেকেই মানুষ অনুপ্রেরণা ও সাহায্য পেতে চায়। কখনো ভয় আর কখনো লোভের বশবর্তী হয়েই মানুষ এসব শক্তিকে উপাসনা করে আসছে এবং মাথা পেতে গ্রহণ করেছে এই শক্তির কল্যাণ ও অভিশাপ। এ শক্তির উদ্দেশ্যে সে বহু কিছু নিবেদনও করে আসছে। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগে সে এই শক্তির নিকট সান্ত্বনা ও আশ্রয় খুঁজে পায় এবং একইভাবে এই অদৃশ্য শক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করেই সে তার প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখ-দুর্দশায় সান্ত্বনা লাভ করে।

মনের স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতিই মানুষকে শক্তির উপাসনা করতে বাধ্য করে। এ ব্যাপারটা পবিত্র কুরআনের সূরা 'আনআম'-এ পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আ) কিভাবে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তার বর্ণনা রয়েছে এখানে ঃ

"এমনি করেই আমি ইব্‌রাহীমকে আসমান ও যমীনের রাজত্ব দেখিয়েছি, যেন তিনি দৃঢ় বিশ্বাসীদের শামিল হতে পারেন। রাত যখন তার উপরে ঘন আঁধারের আবরণ ছড়িয়ে দিল, তখন একটা তারকা দেখতে পেয়ে তিনি বললেন ঃ এই বুঝি আমার পালনকর্তা। কিন্তু সেটি যখন ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ না, যে জিনিস ডুবে যায় তা আমি ভালবাসি না। তিনি যখন দেখলেন চাঁদ ঝলমল করছে, তিনি বললেন ঃ এই ত আমার পালনকর্তা। যখন চাঁদ ডুবে গেল, তখন তিনি বললেন ঃ আমার পালনকর্তাই যদি আমাকে হিদায়ত না করেন তাহলে আমি গোমরাহ্ কওমের শামিল হয়ে পড়ব। অতপর তিনি যখন দেখলেন সূর্য উঠছে, তখন বললেন ঃ এই বুঝি আমার পালনকর্তা! এটাই ত সবচাইতে বড়। কিন্তু তাও যখন ডুবে গেল, তখন

www.nagorikpathagar.org

তিনি বললেন ঃ হে কওম ! তোমরা যা কিছু শরীক করছ, তা থেকে আমি মুখ ফিরালাম। আমি একাগ্র মনে সরলভাবে সেই মহান সত্তার দিকে নিবিষ্ট হলাম যিনি গগনমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং আমি আর মুশরিকদের শামিল নই।[৯]

এভাবে আস্তে আস্তে ইব্রাহীম (আ)-এর মন প্রকৃত স্রষ্টা তথা আল্লাহ্কে খুঁজে বের করার কাজে এগিয়ে চলেছিল। তারকারাজি, চন্দ্র ও সূর্যের মধ্যে তিনি শক্তি ও গৌররেব প্রকাশ অনুভব করেছিলেন। প্রকৃতির এই নিখুঁত বিন্যাস লক্ষ্য করে তিনি মানতে বাধ্য হন যে, মহাশূন্যের উদয়-অস্ত-রত এই গ্রহ-উপগ্রহগুলো এক মহাশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এগুলো সেই মহাশক্তির চালক নয় বরং সেই মহাশক্তিরই অধীন। তাই তিনি এ সব কিছুর উপাসনা ত্যাগ করে সেই মহাপ্রভুর দিকে মনোনিবেশ করেন যিনি স্বর্গ-মর্ত্য, আকাশ-পাতাল সবকিছুরই স্রষ্টা। তাঁর এই বুদ্ধি প্রয়োগের জন্যই ঐশী অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। হয় নিছক সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে, না হয় নিজস্ব বুদ্ধি প্রয়োগে সেই মহা ও সর্বজয়ী শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস হিসেবে মানুষ বহু শক্তির উপাসনা করেছে। এভাবেই সে প্রেতাত্মা, জীবজন্তু, গ্রহ-উপগ্রহ, আগুন, পানি, বজ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপাসনা করেছে। নিঃসন্দেহে সে বিশ্বাস করেছে যে, এগুলো শক্তির আধার বা উৎস। অলৌকিক কোন শক্তির অধিকারীকেও মানুষ উপাসনা করেছে। আবার অনুরূপ ক্ষমতার বিলুপ্তিতে তাকে সে হত্যা করতেও দ্বিধা করেনি।

মানুষ কর্তৃক মানুষ উপাসনার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার আছে। প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি একবার সুদানের 'কর্দফান' নামক স্থানে গিয়েছিলাম। এরই দক্ষিণ সীমান্তে 'নুবা' পর্বতের অধিবাসীরা ছিল নিগ্রো। 'আল-কুজুর' ছিল তাদের দেবতা। একদা স্থানীয় একটা বড় গাছের তলায় বসে আমি উক্ত 'দেবতা' আল-কুজুরের সাথে আলাপ করছিলাম। এমন সময় একদল উলঙ্গ মেয়ে ও পুরুষ নাচতে নাচতে ও গাইতে গাইতে আল-কুজুরের সামনে উপস্থিত হল। দেবতা হিসাবে বা দেবতার প্রতিনিধি হিসেবে তারা আল-কুজুরকে পূজা করত এবং তার উদ্দেশে নানা রকম জিনিস ও জীবজন্তু উৎসর্গ করত। তিনিই ছিলেন নিগ্রোদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এবং পবিত্রতম ব্যক্তি। তাঁর প্রজারা তাঁকে খাওয়াত, উপঢৌকন দিত এবং পরিবর্তে তারা তাঁর কাছ থেকে গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রাচুর্য ও ফসলের জন্য বৃষ্টি কামনা করত। কখন শিকারে যেতে হবে এবং কখন যুদ্ধযাত্রা করতে হবে তা তিনি তাদের বলে দিতেন। তারা বিশ্বাস করত যে, তিনিই তাদের রোগ-ব্যাধি ও বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেন।

www.nagorikpathagar.org

আমি অবশ্য নির্ধারণ করতে পারিনি যে, তারা কি তাঁকে আসল দেবতাজ্ঞানে মানত না আরবের জাহেলিয়া[১০] তথা ইসলাম-পূর্ব যুগের মত দেবতাদের প্রতীক হিসেবে পূজা করত।

আল-কুজুরের স্ত্রী আমার কাছে এসে একজন দোভাষীর সাহায্যে আমার সাথে আলাপ করেন। দোভাষীর কথায় জানতে পারলাম যে, একজন সাধারণ নিগ্রো আল-কুজুরের স্ত্রীর পায়ে আঘাত করেছে এবং তিনি আমাকে যথাযথ কর্তৃপক্ষ মনে করে আমার কাছে এর প্রতিকার চাচ্ছেন। বিস্ময় প্রকাশ করে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, যাঁর স্বামী নিগ্রোদের দেবতা এবং হর্তাকর্তা, তাঁকে এরা কিভাবে যখম করতে পারে। দোভাষীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, একমাত্র দেবতা ছাড়া পরিবারের অন্য কোন সদস্যই তাদের কাছে পবিত্র নয়। দেবতার পরিবারের সদস্যরা অন্যান্য সাধারণ লোকের মত। আমি তখন আমার সঙ্গীকে বলি যে, নিতান্ত সরল ও বিতর্কিত ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও এরা গণতন্ত্রের একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আল-কুজুরের যেমন অধিকার আছে, তেমনি তাঁর দায়িত্বও আছে। তিনি তাদের ইচ্ছাপূরণে ব্যর্থ হলে তারা তাঁকে শেষ করে দেবে। একটা উদাহরণ দেয়া যেতে পারেঃ অনাবৃষ্টির জন্য যদি ফসল না হয় তবে তারা তাঁকে বৃষ্টি দান করার কথা বলবে। তিনি যদি তা অগ্রাহ্য করেন বা দিতে দেরি করেন, তাহলে তারা তাঁকে খুশী করার জন্য অনুনয় বিনয় করবে। যদি মৌসুম চলে যায় এবং আল-কুজুরকে বৃষ্টিদানে তারা রাযী না করাতে পারে তবে হয়ত বা তারা আরও দু'-একটা মৌসুম অপেক্ষা করবে এবং তারপর তারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করবে বা তৎক্ষণাৎই তাঁর উপর পাথর নিক্ষেপ করবে ; তৎপর তারা এমন এক ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করবে যাঁর পূর্ব-পুরুষের ঐতিহ্য গৌরবময় এবং যিনি অজ্ঞাত রহস্য উন্মোচনে সক্ষম।

এই লোকদের সম্পর্কে আমি আর একটা অদ্ভুত গল্প শুনেছিলাম। একবার তারা তাদের সরকারের কাছে তাদের দেবতার বিরুদ্ধে বৃষ্টি না দেয়ার অভিযোগ উত্থাপন করে। সেই দেবতাকে বন্দী না করা পর্যন্ত তারা আপস করতে রাযী হয়নি। তৎপর তারা কিছু দিন অপেক্ষা করে। হঠাৎ একদিন আল-কুজুর গভর্নরের কাছে মুক্তির আবেদন করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে, অতি সত্বরই তিনি বৃষ্টি ঘটাবেন। মুক্তি পেয়ে তিনি যখন তাঁর লোকদের নিয়ে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হন তখনই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়। বোঝা যায় যে, তারা দেবতার ক্ষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করেনি, তাঁকে বিপদে ফেলার কোন ইচ্ছাও তাদের ছিল না। তারা শুধু অভিপ্রায়কেই সন্দেহ করেছিল।

এতে মানব মনের সরলতার একটা দৃষ্টান্ত আমরা পাই। অতি সংস্কৃতবান মানুষের মনও এত সরল বা এত কুসংস্কারমুক্ত নয়। তাই মানুষ শক্তি, বস্তু, জীব-

www.nagorikpathagar.org

জন্তু, পানি, আগুন এমনকি কতিপয় মানুষ ও অন্যান্য বস্তুকে পূজা করেছে। তৌহিদ বা আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারে মুহাম্মদ (স)-এর আহ্বান ছিল আরববাসীদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন। আজকের যুগে অবশ্য তা অতি পরিচিত এবং সহজ মনে হতে পারে। সুতরাং আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসের মতবাদ প্রচার করার জন্য তদানীন্তন সমাজে একজন আহ্বায়কের প্রয়োজন ছিল, যেন মানুষ এই বিশ্ব ও তার সৃষ্টিরহস্য অনুধাবনে সচেষ্ট হয়, সেই মহামহিম আল্লাহ্‌র দিকে এগিয়ে যেতে পারে এবং জ্ঞানের সাহায্যে অতিরিক্ত শক্তি ও প্রেরণা লাভ করতে পারে।

আমরা যদি মুহাম্মদ (স)-এর মক্কার জীবন বিশ্লেষণ করি এবং তাঁর বাণীর নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস চালাই, দেখতে পাব যে, তাঁর বাণীর প্রথম মূলনীতির অর্থাৎ আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে তিনি এবং তাঁর অনুচরেরা মন ও প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, তাদের সাথে সন্ধি করেছেন; কখনো তিনি তাদের বর্জন করেছেন আবার ক্ষমাও করেছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদেরও (খৃস্টান ও য়াহূদী) তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে যাঁর কোন শরীক নেই।

"বল, হে কিতাবিগণ![১১] আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একটি সহজ বিষয়ে আমরা একমত হই যে, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া কারও ইবাদত করব না এবং কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত কাউকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করব না।" যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে বল, "আমরা মুসলমান (আত্মসমর্পণকারী)[১২] তোমরা সাক্ষী থেকো।"[১৩]

এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনের প্রশ্নে মুহাম্মদ (স) মূর্তিপূজকদের সাথে কোন আপস করেননি। কিন্তু কিতাবীদের প্রতি তিনি ছিলেন সহনশীল। পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "তোমরা কিতাবীদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করবে, কিন্তু সৌজন্যের সাথে, তবে তাদের সাথে নয় যারা ওদের মধ্যে সীমালংঘনকারী ...।"[১৪] খৃস্টানদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "যারা বলে 'আমরা খৃস্টান' মানুষের মধ্যে তাদেরকেই তুমি বিশ্বাসীদের নিকটতর বন্ধুরূপে দেখবে"[১৫] এবং সাধারণভাবে বলা হয়েছে ঃ "তুমি মানুষকে তোমার প্রতিপালকের পথে আহ্বান কর হিকমত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং ওদের সাথে আলোচনা কর সদ্ভাবে।"[১৬]

মুহাম্মদ (স) তাঁর বাণী প্রচার করার সময় খৃস্টান ও য়াহূদীদের প্রতি যে সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা আজকের ধর্মনিরপেক্ষ জগতে বিরল। যারা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী এবং ধার্মিক বলে দাবি করে, তারাও মুহাম্মদ (স)-এর মত

www.nagorikpathagar.org

সহনশীল হতে পারেনি। কারণ তারা সহনশীল হওয়ার জন্য তাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করেনি বা অন্যের প্রতি আল্লাহ্‌র যে দয়া তা প্রকাশ করেনি।

"যারা বিশ্বাস করে যারা য়াহূদী, খৃস্টান ও সাবেইন—যারাই আল্লাহ্ ও শেষ দিবসে বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রতিপালকের নিকট আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।"[১৭]

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর মহৎ দিক হল—এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, যাঁর কোন শরীক নেই। বিশ্বাসের এই ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টায় সব বাধা-বিপত্তি জয় করতে হবে। তখন বিশ্বের সব লোক সব জাতি এমনকি সব ধর্মও এক হয়ে যাবে। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্‌তে এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইবরাহীম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে ঈসা, মূসা ও অন্যান্য নবীকে দেয়া হয়েছে তাতে বিশ্বাস করি। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনে এবং আমরা তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী।"[১৮]

আল্লাহ্‌র নবীর জীবনের প্রধান ব্রতই ছিল হযরত ইব্‌রাহীম, নূহ ও আদমের অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করা—কোন নতুন ধর্মীয় আইন বা বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা নয়। আল্লাহ্‌র একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ধর্মের কোন বিকল্প নেই এবং এর উপরই সৃষ্টির ঐক্য ও সংহতি নির্ভরশীল।

"আমি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করেছি সেই দীন, যার নির্দেশ দিয়েছিলাম নূহকে—যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি তোমাকে—যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে, তা এই যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠা কর এবং তাতে মতভেদ করো না। তুমি অংশীবাদীদের যাঁর প্রতি আহ্বান করছ, তা তাদের নিকট দুর্বহ মনে হয় ...।"[১৯]

"হে রসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু আহার কর ও সৎ কর্ম কর, তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত এবং তোমাদের এই যে জাতি, তা ত একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব আমাকে ভয় কর।"[২০]

"যখন ঈসা তাদের অবাধ্যতা সম্পর্কে বুঝতে পারলেন, তখন তিনি বললেন ঃ 'আল্লাহ্‌র পথে কারা আমার সাহায্যকারী ?' সঙ্গীরা বলল ঃ আমরাই আল্লাহ্‌র পথে সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছি। আমরা আত্মসমর্পণকারী, আপনি সাক্ষ্য দিন।"[২১]

www.nagorikpathagar.org

মুহাম্মদ (স)-এর সাথে অন্য কিতাবীদের মতবিরোধ ঘটে শুধু স্রষ্টার পূর্ণত্বের প্রশ্নে। আল্লাহ্‌র একত্ব পূর্ণত্বের ব্যাপার নিয়েই তিনি অন্যের সাথে তর্কবিতর্ক ও তাদের বিরোধিতা করেন। তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করাই ছিল তাঁর বাণীর মূল উদ্দেশ্য। তাই তিনি এ ব্যাপারে কারও সাথে আপস করেননি।

"আমার ইবাদতের জন্যই আমি সৃষ্টি করেছি মানুষ ও জিনকে ; আমি ওদের কাছ হতে জীবিকা চাইনে এবং এ–ও চাইনে যে, ওরা আমার আহার্য যোগাবে।"২২

"আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ্‌র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই ; তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। তিনিই আদি, তিনিই অন্ত ; তিনি যুগপৎ ব্যক্ত ও অব্যক্ত এবং তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবহিত।"২৩

মানুষের জ্ঞানের পরিধি প্রশস্ত করা ছাড়াও মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত তৌহিদবাদ হল সকল বদান্যতার উৎস, সকল সুখ-শান্তির ভিত্তি এবং লালন-পালন ও শিক্ষাদানের যথার্থ উপায়। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

তৌহিদে বিশ্বাসের ফল

ইসলামের মর্মবাণী যে এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপন তা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। আল্লাহ্—যিনি গৌরবান্বিত ও মহান—মনে করেন যে, তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারাই মানুষ মুসলমান হয়।

পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো আমরা যদি একের পর এক পাঠ করি তাহলে দেখতে পাব যে, প্রত্যেকটি অধ্যায়েই আল্লাহ্‌র একত্ব ও পূর্ণত্বে আস্থা স্থাপন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। পবিত্র কুরআনের খুব কম পৃষ্ঠাই আছে, যেখানে আল্লাহ্‌র একত্বের উল্লেখ করা হয়নি।

এর কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার। সকল ন্যায় কাজের উৎসই হল এক আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস এবং একই বাণীর মর্মার্থই হল ন্যায়পরতা। এটা সেই বন্ধনসূত্র, যা এই বাণীর বিভিন্ন দিকগুলো সংগ্রথিত রেখেছে এবং মজবুত করেছে, দেহ ও আত্মার মধ্যে যে সম্পর্ক, ন্যায়পরতা ও ইসলামের এই বাণীর মধ্যে ঠিক সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। আত্মা চলে গেলে যেমন দেহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, তেমনি ঈমান তথা বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় আইনগুলোও সাধারণ আইনে পরিণত হয়ে যায় এবং যে বিশ্বাস ধর্মের জন্ম দেয়—সেই বিশ্বাস অন্তর্ধানের সাথে সাথে সেই ধর্মও অন্তর্হিত হয়ে যায়।

www.nagorikpathagar.org

এ জন্যই এক জাতিকে আর এক জাতি থেকে পৃথকীকরণের মানদণ্ড হচ্ছে তৌহিদবাদ—গোত্র ধর্মমত বা ধর্মে মুসলমান কিনা—তাও বিচার্য নয়। ইসলামধর্ম খৃস্ট ধর্মকে রক্ষা করেছে এবং য়াহূদীদের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির মর্যাদা রেখেছে এবং এই ধর্মাবলম্বী যখনই আশ্রয় প্রার্থনা করেছে. মুসলমানরা তাদের আশ্রয় দিয়েছে। মুসলমানদের উপর এ-ও নির্দেশ আছে যে, আশ্রিত লোকদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিপন্ন হলে প্রয়োজনবোধে যুদ্ধ করে হলেও তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। "তাদের ঘরবাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কৃত করা হয়েছে শুধু এই কারণে যে, তারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্ ; আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অন্য দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে বিধ্বস্ত হয়ে যেত খৃস্টান সংসার-বিরাগীদের উপাসনাস্থান, গীর্জা, য়াহূদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ—যেখানে অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ্র নাম।"[২৪]

মূর্তিপূজক, মুশরিক ও এক আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারীর মধ্যে ইসলাম পার্থক্য করে। মূর্তি উপাসকরা আলাদা ব্যবহার পেয়ে থাকে এবং তাদের প্রতি কোন সম্মান দেখান হয় না। অবশ্য মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের সাথে সম্পাদিত কোন চুক্তিকে সম্মান করে, যদি না তারা ইসলাম প্রচারে বাধা দেয় বা কোন স্বৈরাচারী ব্যবস্থা গ্রহণ করে। খুজা'আদের[২৫] সাথে মহানবী (স)-এর ঐতিহাসিক প্রতিশ্রুতি ও হুদায়বিয়ার সন্ধির[২৬] কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তি উপাসকদের বিরুদ্ধে ইসলামের সংগ্রাম চিরস্থায়ী।

অপরপক্ষে, কিতাবী খৃস্টান ও য়াহূদীদের সাথে মুসলমানদের বিয়ে সমর্থন করে ইসলাম তাদের মুসলিম পরিবারে গ্রহণ করার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু পৌত্তলিকদের সাথে এ ধরনের আত্মীয়তার অনুমতি ইসলাম দেয়নি। "অংশীবাদী নারীকে ধর্মে (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদিগকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার অপেক্ষা উত্তম। ধর্মে বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে তোমরা বিয়ে দিও না (তোমাদের কন্যাকে), অংশীবাদী পুরুষ তোমাদের চমৎকৃত করলেও ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার অপেক্ষা উত্তম।"[২৭] ইসলাম পৌত্তলিক মেয়েকে বিয়ে করা ভ্রষ্টতার শামিল বলে মনে করে। "হে বিশ্বাসিগণ! অংশীবাদীরা ত অপবিত্র ; সুতরাং এই বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে।"[২৮]

মূর্তি উপাসক ও তাদের দেবতাদের প্রতি ইসলামের এহেন অসহনশীলতার কারণ অন্ধ একগুঁয়েমি বা ধর্মীয় গোঁড়ামি নয়। যদি তাই হত, তাহলে ইসলাম অন্যান্য ধর্মের লোককেও সমান চোখে দেখতো। কিতাবী লোকদের কাছ থেকেও ইসলাম বহু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা সহ্য করেছে। তবু পৌত্তলিক ও কিতাবীদের মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

ইসলাম পার্থক্য নির্দেশ করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এর ব্যাখ্যা করা যায় যে, তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করা তথা সত্যের পূর্ণত্বের দিকে ধাবিত হওয়া মানব জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। যখন কোন বান্দা বুঝতে পারে যে, সে আল্লাহ্র সৃষ্টি, তাহলে সে স্বীকার করে যে, বিশ্ব স্রষ্টার সাথে তার সম্পর্ক পিতাপুত্রের ন্যায় ; একমাত্র স্রষ্টার অসংখ্য সৃষ্টির মত সেও একটা সৃষ্টি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র বন্ধন হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাসের এই বন্ধন অচ্ছেদ্য এবং তা উন্নতি, ধর্মপ্রাণতা ও বদান্যতার পথকে প্রশস্ত করে। এই বিশ্বাসের মূল উৎস হল এক 'ইচ্ছা'র কাছে আত্মসমর্পণ। এটা প্রতিষ্ঠিত হলে পৃথিবীতে আমাদের অস্তিত্বের বিষয়টি মৌল আদর্শের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্যেরও একটা সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়।

খোলা মনে এই বিশ্বাসকে গ্রহণ করলে মানব জীবনের যাবতীয় কর্তব্য ও দায়িত্ব অনেক সহজ হয়ে যেত। মানুষ যদি এক আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে সেই বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করত তাহলে সে পৃথিবীতে সুন্দরতম সৃষ্টি বলে পরিগণিত হত। কারণ এক্ষেত্রে একমাত্র বিশ্বাস ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পরিচালিত হওয়ার প্রয়োজন আর থাকত না। আমরা ভাবতে পারতাম যে, এ বিশ্ব বিবেকের শাসনাধীন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাই ছিল মুহাম্মদ (স)-এর সাধনার মূল উদ্দেশ্য এবং তাঁর সফলতার মূল কারণ ছিল তাঁর বাণীর স্পষ্টতা। বহুত্ববাদের ধারণা বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এর সাথে সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির অবসান ঘটে। ইসলাম দাবি করে যে, প্রত্যেকেই মুসলমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু পরে তারা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। ভ্রান্তি ত্যাগ করলেই তারা সুপথ পাবে।

ধর্মসমূহের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আল্লাহ্র সাথে শরীক করার ব্যাপারটা মানুষই প্রবর্তন করেছে এবং মানুষই দেবদেবীর সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি করে এই শিরককে করেছে বহু বিচিত্র। এই নতুন প্রথার প্রবর্তকেরা দুর্নীতিবাজ হিসেবে নিজেদের দেবতার প্রতিনিধি, সমর্থক, রক্ষক সেজেছে এবং ক্ষমতার অপব্যবহার করেছে। অসৎ উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই লোকগুলো ধর্মের মূলনীতির বিকৃতি ঘটিয়েছে এবং পরিশেষে তারা অর্থহীন ও তুচ্ছতার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ধর্মীয় রহস্যের অভিভাবক হিসেবে যাজক, পুরোহিত ও নেতারাই ছিল আসল দেবতা এবং তারাই ছিল মোহমুগ্ধ জনতার ভাগ্য নির্ধারক।

মূর্তিপূজার মাধ্যমে ব্যক্তির পূজা তথা মূর্তির উপাসককে উপাসনা করার মধ্য দিয়েই শিরক তথা অংশীবাদী আরাধনার সূচনা হয়। মিসর ও মেসোপটেমিয়ায় এ ধরনের স্বৈরাচার হাজার হাজার বছর ধরে চলে। ইতিহাসের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কোন দেশই এর হাত থেকে রেহাই পায়নি। উপাসনার ধরন পাল্টাবার যত চেষ্টাই হোক না কেন, পৌত্তলিকতা এবং পুরোহিতদের স্বৈরাচার পাশাপাশি চলে আসছে।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্বাসের একত্ব সম্পর্কে বলা চলে, ছায়া যেমন মানুষের অনুগামী তেমনি বিশ্বাসের সাথে ন্যায্য ব্যবহারও সম্পর্কযুক্ত। আল্লাহ্‌র ইবাদত করার জন্য মুহাম্মদ (স)-সহ অন্যান্য নবীর আহ্বান সম্পূর্ণ স্বার্থহীন ও ভাবাবেগমুক্ত। তিনি তাঁর স্রষ্টার কাছ থেকে কোন সম্পত্তি বা ভরণ-পোষণ দাবি করেননি। আল্লাহ্‌র বান্দার নিকট কোন যিম্মাদার প্রতিনিধি বা মধ্যস্থতাকারী চান না। তিনি বলেন, "তোমরা প্রার্থনা কর, আমি তোমাদের দেব।" তিনি তোমাদের ঘাড়ের রগের চেয়েও নিকটবর্তী। তিনি দয়াময় এবং তিনি সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান ; তিনি স্রষ্টা, উদার ও ক্ষমতাপরায়ণ। তিনি দাতা এবং দান ফেরতও তিনি নিতে পারেন। তিনি ন্যায়বান শাসক এবং মহাপ্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি সর্বজ্ঞ ও মানুষের ভাগ্যনিয়ন্তা। তিনিই পালনকর্তা এবং সবচেয়ে জ্ঞানী।

এ সব গুণের জন্যই আল্লাহ্‌র স্থান সর্বসীমার উর্ধে। তাঁর কাছে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মর্যাদা সমান। যারা অত্যন্ত ধার্মিক তাঁরা আল্লাহ্‌র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং যাঁরা আল্লাহ্‌র বান্দার প্রতি ন্যায়বান তাঁরা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী।

'শিরকের' সাথে যেমন স্বৈরাচার ও স্বার্থপরতা জড়িত, তেমনি তৌহিদবাদের সাথে জড়িত ন্যায়বিচার ও সমতা। সেইজন্য মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল একমাত্র আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করা। ইসলামের দৃষ্টিতে আল্লাহ্ সবকিছুরই উর্ধে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ তাঁর শরীক করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।"[২৯]

পবিত্র এবং হৃদয় থেকে উৎসারিত বিশ্বাস সব রকম বদান্যতার লালনক্ষেত্র। বিশ্বাসী মানুষ বুঝতে পারে যে, স্রষ্টার সাথে সরাসরি তার সমস্ত হিসাব-নিকাশের বোঝাপড়া করতে হবে। তাই সবকিছু সে আল্লাহ্‌র উপরই ছেড়ে দেয় তথা আত্মসমর্পণ করে এবং ছোট-বড় সব রকমের গুনাহ থেকেই বিরত থাকে। এভাবে বিশ্বাস মানুষকে সত্যিকার মানুষে রূপান্তরিত করে।

এ ধরনের লোক দ্বারা সমাজ গঠিত হলে সেই সমাজে ক্ষমা ও উদারতা লালিত হয়। কারণ ইসলামের চিরাচরিত নির্দেশগুলোর মধ্যে দেখা যায়, "কেউ সত্যিকারের বিশ্বাসী বলে পরিগণিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার নিজের জন্য যা চায় তার ভাইয়ের জন্যও তাই চায়।" দয়ালুদের প্রতি আল্লাহ্ দয়া করেন এবং পৃথিবীর লোকদের প্রতি তুমি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমার উপর সদয় হবেন। এসব হল সুখী ও সুন্দর সমাজ গঠনের শর্তাবলী।

আলী[৩০] ও মুয়াবিয়ার[৩১] মধ্যে গৃহযুদ্ধের সময় বেশ কিছু সংখ্যক খারেজী[৩২] মানবীয় সরকারের বিলোপ সাধনের পক্ষে প্রচার চালাতে থাকে। তাদের ধারণা

www.nagorikpathagar.org

ছিল—একমাত্র আল্লাহ্‌র শাসন ছাড়া আর কোন কিছুর শাসন থাকতে পারে না। আল্লাহ্‌র শাসন বাস্তবায়িত হলে বিবেক হবে তার রাজা, ন্যায়বিচার তাই আইন এবং সাধারণ প্রথা হবে তার সতর্ককারী।

সত্য ধারণা ও মানবীয় প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ মুহাম্মদ (স)-এর বাণী। বিশ্বাস ও আইনের মাধ্যমে সংস্কার সাধনে সমর্থ বিশ্বাসিগণ কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিকেই ইসলামের আইন কার্যকরী করার জন্য নেতৃত্ব দেয়া হয় এবং এভাবেই মানুষের প্রকৃত আচরণ পরিচালনা হয় নিশ্চিত।

তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করলে কিভাবে বিশ্বাসীর মনে সকল গুণের বিকাশ ঘটে তা আমরা লক্ষ্য করেছি। বিশ্বাসী তখন আর শুধু নিজের জন্যই বেঁচে থাকে না, তার সকল ভাইয়ের জন্যই সে বেঁচে থাকে। বিশ্বাসীদের অন্তর থেকে সকল অমঙ্গল হয় বিলুপ্ত। পবিত্র এই অন্তরে গুণাবলীর চরম উৎকর্ষ ঘটে এবং তখন সাধারণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার ইচ্ছা হয় স্বতঃস্ফূর্ত।

একজন বিশ্বাসী স্বৈরাচারী হতে পারে না। কারণ আল্লাহ্‌র একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল ন্যায়বিচার-এর বিরুদ্ধে তিনি কাজ করতে পারেন না। তিনি হৃদয়হীন হতে পারেন না, কারণ তাঁর প্রভু দয়ালু। তিনি মিথ্যুক, প্রবঞ্চক বা মুনাফিক হতে পারেন না। কারণ তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র কাছে, যিনি মানুষের অন্তরের খবর রাখেন। তিনি ভীরু বা দুর্বল হতে পারেন না। তিনি জানেন যে, এতে তাঁর কোন লাভ নাই। কারণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার আল্লাহ্‌র হাতে।

এভাবে আমরা যদি মানুষের ত্রুটিসমূহের হিসাব নিই, তাহলে দেখতে পাব কিভাবে বিশ্বাস বা ঈমান বিশ্বাসিগণকে যাবতীয় দোষ-ত্রুটির হাত থেকে রক্ষা করে। আমরা আরও দেখতে পাব যে, বিশ্বাসীর অন্তর সর্বদাই মহৎ জিনিসসমূহ গ্রহণ করে থাকে, যে আত্মা আল্লাহ্‌র দয়ার রাজত্বে প্রবেশ করেছে এবং তাঁর কাছ থেকে এই নিশ্চয়তা পেয়েছে ঃ

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"[৩৩]

বিশ্বাসের নির্মলতায় এই আত্মা এমন এক সুখের রাজ্যে বাস করে যেখানে কেবল বিশ্বাসীরাই বসবাস করতে পারে। আমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাসের শীর্ষ শিখায় অবস্থান করে পরম সত্যের নির্দেশ কামনা করে, তারা এই পৃথিবীতেই স্বর্গসুখ ভোগ করে। কারণ আধ্যাত্মিক আনন্দ স্বর্গীয় আনন্দের মতই মধুর।

www.nagorikpathagar.org

তৌহিদে বিশ্বাস এবং এর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য গুণ মানব আত্মাকে পবিত্র করে এবং খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে। এই বিশ্বাস মানবাত্মাকে গরীয়ান করে তোলে। নাস্তিকতা, অংশীদারী উপাসনা বা পৌত্তলিকতা মানুষের মনকে বস্তুজগতের দিকে মোহাবিষ্ট করে এবং আত্মাকে মিথ্যার আবরণে ঢেকে রাখে। এই মিথ্যার উৎস হল যাদুকর বা গণৎকারদের প্রচার এবং মূর্তিপূজকদের অপকর্ম। দেবতাদের ক্ষমতাও আবার দ্বিধাবিভক্ত এবং বিতর্কিত ধরনের উপাসনা কেবল মানব অবনতির দিকটাই প্রকটভাবে তুলে ধরে। আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাসী এবং পূর্ণতাপ্রাপ্তরা ঠিক এর বিপরীত। তারা চিন্তা করে, অনুশীলন করে এবং বিজ্ঞতার সাথে কাজ করে। কারণ সে ইসলামের প্রচারক এবং ইসলামের শিক্ষা মানেই তাঁর মধ্যে কর্তৃত্ব ও সদগুণ সমভাবে বর্তমান। মানুষ যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ্ তার সাথেই থাকেন। তাঁকে পাওয়ার জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন নেই। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে তাঁকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের মাধ্যমেই তাঁকে পাওয়া যায়। তাঁর নির্দেশিত পথেই তাঁকে পাওয়ার পথ খুঁজে বের করতে হয়। সুতরাং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে মানুষের অবশ্যই গভীরভাবে ধ্যান করা প্রয়োজন।

ইসলাম যে বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে, তার প্রতিফলন বাস্তবায়ন আমরা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথা ও কাজের মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। পবিত্র কুরআনেও বারবার গভীরভাবে চিন্তা করার ও বুদ্ধি খাটানোর আহ্বান জানানো হয়েছে। অনুকরণকারী, আত্মপ্রশংসাকারী, মত পরিবর্তনকারী এবং উদাসীনদের প্রতি পবিত্র কুরআনে কঠোর ভাষায় ধিক্কার দেওয়া হয়েছে। একই সাথে আবার আল্লাহ্‌র নির্দেশিত পথে এই বিশ্বের চিরন্তন রহস্য উদ্ঘাটনে যারা তাদের প্রতিভা কাজে লাগায়, তাদের প্রশংসা করা হয়েছে।

ইসলাম ধর্ম প্রচার করার সময় এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর পরবর্তী যুগে আরব উপদ্বীপ থেকে 'শিরক'–এর উৎখাত এবং তৌহিদের বিজয় প্রতিষ্ঠা করা যত সহজ বলে ধারণা করা হয়, আসলে ততটা সহজ ছিল না। তীব্র আক্রমণ ও বিরোধিতার মুখেই এ কাজ সম্পাদিত হয়েছিল।

আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। এতে তারা বিস্ময় বোধ করেছে এবং সত্য প্রত্যাখ্যানকারীরা বলছে, এ ত এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। সে কি এত অসংখ্য উপাস্যের বদলে মাত্র একজন মাবুদকেই টিকে থাকতে দিল ? এ ত এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই বলে, 'তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় তোমরা অবিচলিত থাক। তাঁর (মুহাম্মদের) কথায় নিশ্চয়ই কোন অভিসন্ধি আছে। আমরা ত আগের ধর্মে এইরূপ কথা শুনিনি। এ এক মনগড়া উক্তি মাত্র।"[৩৪]

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু রসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী অবিশ্বাসের উপর জয়ী হয় এবং মানবাত্মাকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার পথে সকল বাধাকে অপসারিত করে। তাঁর বাণী মানুষকে পাষাণে পরিণত হওয়ার হাত থেকে উদ্ধার করেছে। এর ফলে মানবমন স্বাধীনভাবে, গভীরভাবে চিন্তা করার অবকাশ পায় এবং এর ফল এতই চমকপ্রদ হয় যে, এই বাণীও যেন এখন অনেকটা সেকেলে হয়ে পড়েছে। পণ্ডিত ও জ্ঞানীরা স্বীকার করেন যে, এই বাণী প্রচারে মুহাম্মদ (স) অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছেন এবং এ বিষয়ে তাঁর মত আর কেউ সফল হতে পারেন নি বলেও মানব জাতির ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়।

সবাই স্বীকার করেন, প্রথম দিকে তাঁর বাণী মানুষের কাছে অদ্ভুত ও অগ্রহণীয় ছিল ; তাদের মতে এটা ছিল অভূতপূর্ব এবং প্রচলিত ধর্মমতের বিরোধী। তাই তাঁকে বিদ্রূপ, প্রত্যাখ্যান ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। এজন্যই রসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁর কুড়ি বছরের ধর্মপ্রচারের প্রথম দিকে সংগোপনে প্রচার কার্য চালাতে হয়েছিল। তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান অনন্য হলে মানুষের জীবন তথা সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর উপর এই বাণীর প্রভাবও অনন্য হবে। তাই, যে আরববাসী একদা তাদের শিশু কন্যাদের জীবন্ত কবর দিত এবং রক্তপাত ও লুটতরাজে মহা আনন্দ লাভ করত, তারাই অতি বিনম্রভাবে নতজানু হয়ে আল্লাহ্র রহমত কামনা করেছে। যে পরিবারে পুত্র তার পিতার স্ত্রীদেরকে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করত, সেই পরিবার সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে গেছে। যে গোত্র রক্তের সম্পর্কহীন কোন ব্যক্তির অধিকার স্বীকার করত না, সেই গোত্রই জন্ম দিয়েছে খালিদ-বিন-ওয়ালিদকে,[৩৫] যিনি হেমসের খৃস্টানদেরকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়ে তাদের কাছ থেকে আদায়কৃত কর ফেরত দিয়েছিলেন।

যারা একদা মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করত, পরবর্তীতে তারাই আল্লাহকে শ্রদ্ধা করতে শুরু করে। সত্যের প্রচার করতে তারা আর পরনিন্দার ভয় করল না। এসব হৃদয়হীন মানুষের মধ্য থেকেই এমন একজন খলীফা জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি বিশ্বাসীদের এক সমাবেশে জনৈক মহিলার প্রশ্নের জবাবে বলেন, "মহিলার কথাই ঠিক, আমি উমর, ভুল করেছি।" এই উমরই একবার এক পত্রে তাঁর জনৈক দিগ্বিজয়ী সেনাপতিকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করেন। কারণ তাঁর (সেনাপতি) পুত্র মিসরে বিজিত খৃস্টান সম্প্রদায়ের জনৈক লোকের ক্ষতি সাধন করেছিল। উমর লেখেন, "হে আমর[৩৬] যে মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁকে কি আপনি দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবেন ?"

আজকের পৃথিবী বিশ্বাসীদের দ্বারা পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার সম্পর্কে কেউ প্রশ্ন উত্থাপন করলে আল্লাহ্র বাণী দিয়ে আমরা তার জবাব দিতে পারি। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আর তাদের বেশির ভাগ লোকই শরীক না করে আল্লাহ্র

www.nagorikpathagar.org

উপর বিশ্বাস করে না।"[৩৭] এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অবিচার থেকে মুক্ত নয়, নিশ্চয়ই সে বিশ্বাসী নয়, না, সে বিশ্বাসী নয়।"

প্রাচ্যের হোক বা পাশ্চাত্যের হোক, এমন কোন 'কিতাবধারী' আছে কি যে প্রতিবেশীকে অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করেছে বলে গর্বভরে বলতে পারে ? একইভাবে বর্তমানে এমন কোন মুসলমান আছে কি, যে তার নিজের জন্য যা চায়, তা তার ভাইয়ের জন্যও কামনা করে ?

আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার মূলনীতিগুলো মানুষের অন্তরে বদ্ধমূল না হলে বিভিন্ন জাতি ও শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ, যুদ্ধ-বিবাদ মানবজাতি প্রত্যক্ষ করেই চলবে।

•

সৎকর্ম ঃ অনুকম্পার অভ্যাস

আমার মতে, মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর দ্বিতীয় মৌলিক নীতি ইহ্সান তথা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত সৎ কাজ। পবিত্র কুরআনের প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, সৎ কাজ ঈমানের অঙ্গ।

কোন্ কাজটা করণীয় বা নিষিদ্ধ এবং কোন্টা ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত তা ইসলামের সামগ্রিক আইন তথা শরীয়তে[৩৮] বিধৃত হয়েছে। সব ধর্মের মধ্যে ইসলাম অনন্য। এটা হচ্ছে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ন্যায়ের উৎস ও ব্যুৎপত্তি এতে বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমানরা কি ধরনের জীবন পদ্ধতি অনুসরণ করবে বিশেষ করে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে এমনকি চাকরের সাথে মনিবের সম্পর্কের ব্যাপারেও তারা কি সব বিধান মেনে চলবে, তা এতে পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। এসব কাজের মাধ্যম হচ্ছে নামায, রোযা এবং হজ্জ।

ইবাদত মানুষের দেহ ও মনকে পবিত্র করে এবং মুসলমানদের ব্যক্তিত্বকে করে প্রভাবিত। এ ধরনের কতিপয় নীতি-সমন্বয় ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক। শৃংখলা ও সঠিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এই নীতিগুলি সামাজিক সংহতির পথ প্রশস্ত করে। সুন্দর একটা সমাজের জন্য সংহতি অপরিহার্য। কারণ সংহতিই পরস্পরের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করে উন্নতির পথ সুগম করে।

আরব ও অন্যান্য বেদুইন জাতির লোকদের মধ্যে শুধু অহমিকার জন্যই পূর্বে যে অসহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তা পরিবর্তন করতে ইবাদতের চেয়ে শক্তিশালী আর কোন কার্যকরী উপায় ছিল না। ইবাদত পরিত্যাগকারী বর্বর এই জাতি মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশিত পথে এক আল্লাহ্র ইবাদত করতে শুরু করে এবং তাদের কাজকর্মে শৃংখলা ফিরে আসে। তারা নতজানু হয়ে বিনম্রভাবে পরম স্রষ্টার

www.nagorikpathagar.org

প্রশংসা উচ্চারণ করতে থাকে। তাদের মধ্য থেকে একজনের নেতৃত্বে তারা রীতিমত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে শুরু করে, তাদের কর্তব্যসমূহও অত্যন্ত দ্রুত ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে পালন করতে থাকে। এভাবেই তারা শৃংখলা, আনুগত্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে হয়ে ওঠে সচেতন। তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি অযোগ্যের প্রতিও তাদের কোন বিদ্বেষিত মনোভাব হয় বিদূরিত।

যে সব আরববাসী তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করা থেকে বিরত ছিল তারা বদরের যুদ্ধে তাদেরই ভাইদের শৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে অবাক হয়ে যায়। মুসলমান সৈন্যরা এমনভাবে সুশৃংখল হয়ে দাঁড়ায় যে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে আরবদের কাছে পূর্বে তা ছিল সম্পূর্ণ অজানা। আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাসী ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ প্রভু-ভৃত্য, সাদা-কালো নির্বিশেষে সব মুসলমানকেই পাশাপাশি দেখা যায়।

সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার যোগসূত্র স্থাপন ছাড়া ইসলাম নির্দেশিত ইবাদতে মানুষের আত্মা, জীবন এবং সমগোত্রীয়দের সাথে সম্পর্কোন্নয়নের ক্ষেত্রেও দেখা দেয় বহু সুফল। এসব ইবাদত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এসব ইবাদত স্বয়ং মুহাম্মদ (স)-ও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পালন করতেন।

ইসলামের পাঁচটি প্রধান স্তম্ভের তিনটি—নামায, রোযা ও হজ্জ– ইবাদত সম্পর্কীয় বিধায় ইসলামের আইনবিদগণ ইবাদতের প্রত্যেকটা ধাপের গুরুত্ব নিরূপণ ও বিশদভাবে বিশ্লেষণ করতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। অতীব দুঃখের বিষয় যে, বেশির ভাগ মুসলমানই তাদের ধর্মের বাহ্যিক দিকটা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জানে না। তাই সৎ কাজ তথা ন্যায়পরতার অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিশদ আলোচনার প্রয়োজন। বেদুইনরা আরব মরুভূমির প্রত্যন্ত এলাকা থেকে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে এসে তাঁর সামনে বসত ; তাঁর কাছ থেকে তারা তাঁর বাণীর সারমর্ম গ্রহণ করত এবং চলে যেত। এসব বেদুইন ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জানত আজকের যুগের মুসলমানরা ইসলামের বুকে প্রতিপালিত হয়ে এবং মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ততটুকু জানে না। এর কারণ রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ব্যক্তিগত আকর্ষণের অভাব কিংবা পুরাকালের আরববাসী আজকের মানুষের চেয়ে অধিক গুণসম্পন্ন ছিল, তা নয়। এর কারণ ছিল, তৎকালে এই বাণীর সরলতা। এর নিয়ম-কানুন সহজ ও সরল ছিল বিধায় তা সাধারণ লোকের কাছে অত্যন্ত সহজবোধ্য ছিল। তাই মানুষ এই বাণীর তাৎপর্য সহজেই অনুধাবন করে নির্দেশ মুতাবিক কাজ করত। তারা শুধু মুখেই ইসলামের কথা বলত না কিংবা এর সারবস্তুকে বাদ দিয়ে বাইরের খোলসটা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকত না।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর সরলতা ও স্পষ্টতা এবং তা প্রচারের ধারা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহ্ বলেন, "আর এটা উচিত নয় যে

www.nagorikpathagar.org

মুমিনদের সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে। তাদের কিছু লোক কেন থেকে যায় না, যারা দীন ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে এবং পরে যখন বেরিয়ে পড়া লোকেরা ফিরে আসবে, তখন তারা উত্তম জ্ঞান শিক্ষা দেবে, যাতে তারা অন্যায় থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।"[৩৯]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী সহজ, সরল কেননা বিশ্বাস ও সৎকর্মই হল এর বুনিয়াদ। আমরা দেখেছি—ন্যায় কাজই সৎকর্ম এবং সৎকর্মই জন্ম দিয়েছে সহজবোধ্য নীতিমালা ও ইবাদতের। দয়া ও ভ্রাতৃত্বই এই নীতিমালার মূল ভিত্তি। দয়া আল্লাহ্‌র একটা বৈশিষ্ট্য। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী প্রচারের প্রথম দিকে মুসলমানরা আল্লাহ্‌কে 'আর-রহমান' বা 'দয়াময়' বলে এমনভাবে সম্বোধন করত যে, সাধারণ লোক মনে করত, মুহাম্মদ (স) 'আর-রহমান' নামক আল্লাহ্‌রই ইবাদত করে। মুসলমানরা ছোট বড় সব কাজই পরম দয়াময়ের নামে শুরু করে এবং একে অন্যকে 'তোমার উপর আল্লাহ্‌র দয়া ও শান্তি বর্ষিত হোক' বলে সম্বোধন করে।

মুহাম্মদ (স)-এর জীবনেও দয়া যে প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, পবিত্র কুরআনে তার সাক্ষ্য দেয়া হয়েছে।

"মুহাম্মদ (স) আল্লাহ্‌র রসূল। আর যাঁরা তাঁর সাথে রয়েছেন তাঁরা অবিশ্বাসীদের মুকাবিলায় খুবই তৎপর এবং নিজের মধ্যে খুবই দয়ার্দ্রচিত্ত।"[৪০]

"... আর বিশ্বাসীদের জন্য আপনার বাহু এগিয়ে দিন। আর আপনি ঘোষণা করুন ঃ আমি ত সুস্পষ্ট ঘোষণাকারী।"[৪১]

"আমি কুরআনের মারফত সেই জিনিস নাযিল করে থাকি যাতে বিশ্বাসীদের জন্য আরোগ্য ও রহমত মওজুদ রয়েছে।"[৪২]

"আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতেই তারা আপনার মত কোমল হৃদয়ের অধিকারী লোক পেয়েছে।"[৪৩] "তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য হতে একজন রসূল এসেছেন। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট দেখে তিনি বিচলিত হন। তোমাদের কল্যাণ বিধানে তিনি বড়ই তৎপর, আগ্রহশীল। বিশ্ব-বাসীদের জন্য তিনি যে বড়ই স্নেহবৎসল ও বড়ই দয়াময়।"[৪৪]

নবীর কার্যাবলী ছিল দয়ায় ভরপুর। "দয়ার্দ্র লোকের প্রতি দয়াময় দয়া করে থাকেন।" "পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শন কর, তাহলে আল্লাহ্ তোমার প্রতি সদয় হবেন।"

"তোমাকে (হে মুহাম্মদ) সমস্ত সৃষ্টির জন্য দয়াস্বরূপ পাঠিয়েছি।" মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর এই মৌলিক নির্দেশই প্রগতির ভিত্তিস্বরূপ। মানুষের মন থেকে দয়া সরিয়ে নেয়া হলে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। তেমনি কোন জাতির মধ্য থেকে দয়া সরিয়ে নেয়া হলে সেই জাতি পৃথিবীতে প্লেগ তথা মহামারী হিসেবেই টিকে থাকে। যারা

www.nagorikpathagar.org

পৃথিবীতে ধ্বংসের স্মৃতিসৌধ রেখে গেছে, ইতিহাসে সেই সব দয়াহীন বর্বর জাতির কথা উল্লেখ আছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তাদের ধ্বংসের স্মৃতিসৌধ সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। উদাহরণ হিসেবে চেঙ্গিস খাঁ ও তার উত্তরাধিকারদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দীর্ঘ সাতশ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়ায় তাদের ধ্বংসলীলার নমুনা দেখতে পাওয়া যায়। আফগানিস্তান, ইরান ও ইরাকে এর কিছুটা আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি। এই ধ্বংসলীলার স্বাক্ষর আরও বহু শতাব্দী ধরে টিকে থাকতে পারে। মোগলদের পর মুসলমানসহ এমনকি আরবের মুসলমানসহ অন্যান্য কতিপয় নির্দয় জাতি পৃথিবীতে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছে। উত্তর আফ্রিকায় আরবরা যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছিল শত শত বছর পরেও তার নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়।[৪৫]

মূসা (আ), ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (স) প্রচার করেন যে, সমস্ত প্রগতির উৎস হচ্ছে দয়া। সকল নবী ও পুণ্যবান ব্যক্তিও দয়ার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে গেছেন। দয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে কোন জাতিই পৃথিবীতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না।

গল্প ও কিংবদন্তী শুনে অনেকে বিশ্বাস করে যে, দয়া ছাড়াই তুর্কী জাতি তুরস্ক সাম্রাজ্যকে গৌরবের শীর্ষস্থানে উন্নীত করেছিল। এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা। সমালোচনার কষ্টিপাথরে যাচাই করলে দেখা যায়, তুরস্ক সাম্রাজ্য যখন গৌরবের শীর্ষ শিখরে অবস্থান করছিল, তখন তুর্কী জাতি আরব জাতির প্রতি প্রদত্ত আল্লাহ্‌র দয়া উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। আরবদের তখন পতনের যুগ এবং তুর্কীরা তাদের দেশ দখল করে তাদের উপর তেমনভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল, যেমনভাবে তারা বিস্তার করেছিল মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের উপর আধিপত্য।

দানিস্তার নদীর তীরবর্তী বেসারাবিয়ায় এখনও তুর্কীদের দয়ার কাহিনী শুনতে পাওয়া যায়।[৪৬] সে সব স্থানে কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদে তুর্কীদের দয়া ও ন্যায়বিচারের কথার উল্লেখ আছে। এমন প্রবাদও আছে যে, তুর্কীদের সাথে সাথে ন্যায়বিচারও অন্তর্হিত হয়েছে। পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং বলকান রাষ্ট্রসমূহে সফর করার সময় সেখানকার অসংখ্য উপকথা ও দৃষ্টান্ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এসব উপকথা দয়ালু এবং ন্যায়পরায়ণ জাতি হিসেবে তুর্কী মুসলমানদের প্রতি সব দেশের খৃস্টান জনগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধারই পরিচায়ক।

১৯১৭ সালে আমি যখন ভিয়েনা ছিলাম তখন আমাকে বলা হয় যে, অস্ট্রীয় বাহিনীকে শক্তিশালী করার জন্য তুর্কী সৈন্যরা শীঘ্রই তাদের সাথে গ্যালিসিয়ায় মিলিত হবে বলে তারা বিশ্বাস করে। জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, পোলিশদের জনৈক বিখ্যাত পূর্বপুরুষ ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন যে, তাদের রাজ্যের পুনরুত্থান

www.nagorikpathagar.org

নির্ভর করবে দানিয়ুব নদীর উত্তর তীরে মুসলিম বাহিনীর পুনরাবির্ভাবের ওপর। আশ্চর্যের ব্যাপার, আক্রমণকারী ও পোল্যাণ্ডকে বিভক্তকারীর[৪৭] মিত্র হিসেবে তুর্কী বাহিনী যুদ্ধে যোগদান করলেও তাদের দানিয়ুব নদী পার হওয়ার পর এক বছর যেতে না যেতেই পোল্যাণ্ড একটা স্বাধীন ও ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

বলকানে শ্রুত এই সব উপকথা, গল্প ও প্রবাদ সেখানকার মুসলিম ইতিহাস সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার জন্য আমাকে প্রেরণা যোগায়। পড়াশোনা ও পর্যবেক্ষণ করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, মুসলমানদের ন্যায়বিচার ও দয়া প্রদর্শনের ফলেই ইউরোপে উসমানীয়দের আধিপত্য বিস্তার ও বজায় রাখা সম্ভব হয়েছিল। সত্য, ন্যায় ও দয়ার পতাকাতলে বলকানবাসীদের দীর্ঘকালের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে এবং তারা সাম্য ও ন্যায়ের অর্থ আবিষ্কারে সমর্থ হয়। একথা মনে রাখাই যথেষ্ট হবে যে, উসমানীয়দের দ্বারা উচ্ছেদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপে স্বৈরাচার এবং দাসত্বকে অদৃষ্টের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে গ্রহণ করা হত। মল্‌ডাভিয়ান, পোল ও ম্যাগাইয়ার্সরা তাদের মধ্যে এক আন্তঃরাষ্ট্রীয় বন্দী বিনিময় চুক্তি সম্পাদন করেছিল। চুক্তির শর্তানুসারে এক সামন্ত রাষ্ট্র থেকে অন্য সামন্ত রাষ্ট্রে পলাতক কৃষকদের ফিরিয়ে দেয়া হত এবং কোন জমি বিক্রয় করা হলে জমির সাথে জমির চাষীও বিক্রি হয়ে যেত।

পবিত্র কুরআনে নির্দেশিত দয়ার বাণী বুকে নিয়ে তুর্কীরা ইউরোপে গমন করে। যেসব জাতি বা দেশকে তুর্কীরা পদানত করে, তাদের চেয়ে তারা অস্ত্রবলে বা জনবলে শ্রেষ্ঠ ছিল না। কিন্তু শুধু দয়া ও ন্যায়বিচারের ফলেই তারা দুর্গম গিরি-মরু-কান্তার ও দুস্তর পারাবার অতিক্রম করে একের পর এক দেশ জয় করে এবং পরিশেষে ভিয়েনার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়। এসব গুণের জন্যই একদা তাদের পূর্বপুরুষ আরবরা এশিয়া ও আফ্রিকা জয় করতে পেরেছিল।

তুর্কীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন সুলতান সেলিম (প্রথম) (১৫১২-১৫২১)। নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি সুবিদিত ছিলেন। নিজ পরিবারের সকল সদস্যকেও তিনি হত্যা করেন। তুর্কীরাও তাকে 'নিষ্ঠুর সেলিম' বলে উল্লেখ করে। তিনি তাঁর রাজ্যে এক ধর্ম ও এক ভাষা প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু নেতৃস্থানীয় আইনবিদগণ এবং ধর্মীয় প্রধান শায়েখ-উল-ইসলাম তাঁর প্রবল বিরোধিতা করেন। তাই সুলতান ইসলামের অনুশাসনের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনপূর্বক তাঁর ইচ্ছা ত্যাগ করেন। খৃস্টানদের অধিকার রক্ষা ও তাদের প্রতি দয়া প্রদর্শনের সুষ্ঠু বিধান ইসলামে আছে। আল্লাহ্ তাঁর রসূল ও তাঁর অনুসারীদের অন্তরে যে দয়া প্রবিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এই দয়া ছিল সেই দয়ারই ফল। দয়া ইসলামের একটি প্রধান স্তম্ভ এবং আল্লাহ্‌র একটা অন্যতম গুণ। এই দয়া তুলে নেয়া হলে রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়

www.nagorikpathagar.org

এবং আল্লাহ্ কর্তৃক দয়ার্দ্র লোক প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত তথায় বিশৃংখলা ও অরাজকতা বিরাজ করে।

আজকের পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মানুষের অন্তর থেকে দয়া নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষ কি হিংস্র পশু থেকেও হিংস্র হয়ে যায়নি ? যারা সভ্যতার দাবিদার তারা কি নিষ্ঠুরতার দিক থেকে চেঙ্গিস খানকেও ছাড়িয়ে যায়নি ? শহরবাসীর ওপর বিমান হামলা কি চরম বর্বরতা নয় ? এগুলো কি বিশ্বের ধ্বংসের অত্যাসন্ন নিদর্শন নয় ?

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রাণকেন্দ্র 'দয়া'র ওপরে শুধু মানুষের একচেটিয়া অধিকার নেই, ইতর প্রাণীর প্রতিও মানবোচিত ব্যবহার করার জন্য ধর্মীয় বিধান রয়েছে। দয়া প্রদর্শনের ক্ষেত্রকে রসূলুল্লাহ্ (স) কতটুকু প্রসারিত করতে চেয়েছিলেন, এতেই তা প্রমাণ হয়ে যায়। ইসলাম আরবদের অনেক পুরাতন প্রথা বাতিল বলে ঘোষণা করেছে। পশুর ওপর অত্যাচার করা ছিল আরবদের একটা সাধারণ রীতি। যেমন, ভারবাহী পশুর কান ছিঁড়ে দুভাগ করে দেয়া এবং উটকে তার মৃত মালিকের কবরের গুম্বজের সাথে বেঁধে রাখা, যেন সেও তার মালিকের মত মারা যায়। ধর্মীয় আইন পশুর শাস্তি দেয়া, নিছক আনন্দের জন্য পাখি শিকার করা এবং এক পশুকে অন্য পশুর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া, যেমন ষাঁড় ও মোরগের লড়াই নিষিদ্ধ করেছে। তদুপরি, পশুর পিঠে অতিরিক্ত বোঝা চাপানো নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং যত্নের সাথে পশু পালন করার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এ আইন কেউ অমান্য করলে তাদের পশুর মালিকত্ব নাকচ করে দেয়ার ক্ষমতাও বিচারকগণকে দেয়া হয়েছে।

বেদুইন ও বর্বর লোকদের ওপর এই বিধান অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে কার্যকর হয়েছিল। কথিত আছে যে, আদিয়া-ইবনে-হাতিম নামে জনৈক একনিষ্ঠ মুসলমান রুটি ছিঁড়ে টুকরো করে পিপীলিকাদের খেতে দিতেন। তিনি স্বীকার করতেন যে, তারাও তাদের প্রতিবেশী। সুতরাং তাদেরও হক আছে। আরো কথিত আছে যে, শেখ আবূ ইসহাক আল-সিরাজী একদা বন্ধু-বান্ধবসহ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলেন, এমন সময় তাদের সাথে একটা কুকুর এসে যোগ দিলে তাদের মধ্যকার একজন তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়। আল-সিরাজী তখন তাকে ধমক দিয়ে বলেন, "তুমি কি জান না যে, এই রাস্তা দিয়ে হাঁটার সম-অধিকার এই কুকুরটারও আছে ?"

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর এক হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ "কোন পশুর ওপর তিন জনকে আরোহণ করতে দেখলে একজন না নামা পর্যন্ত তাদের প্রতি পাথর ছুঁড়তে থাক।" পশুদের প্রতি এমন অমানবিক ব্যবহার না করার অসংখ্য নির্দেশ ধর্মীয় বিধানে আছে। এতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র সৃষ্টি জীবের প্রতি দয়া দেখানোর ব্যাপারে মুসলিম আইন কত উদার।

www.nagorikpathagar.org

সেজন্য মুহাম্মদ(স)-এর বাণীর একটা মৌলিক নীতি হচ্ছে দয়া। এই দয়া সুপরিকল্পিত রাষ্ট্রেরও ভিত্তিপ্রস্তর বিশেষ। দয়া ছাড়া মানুষের উপাসনা নিরর্থক। দয়াহীন রাষ্ট্র বা ধর্ম প্রতারণা ও অত্যাচারে রূপান্তরিত হতে বাধ্য।

সৎকাজ ঃ ভ্রাতৃত্ব

সৎ কাজের দ্বিতীয় নৈতিক নির্দেশ হচ্ছে ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্ব বর্তমান বিশ্বের একটা সোচ্চার দাবি এবং আজকের দুনিয়ার প্রত্যেকেরই কাম্য এই ভ্রাতৃত্ব।

মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের সময় আরব সমাজ ছিল গোত্রীয় বিদ্বেষ ও সীমাহীন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বেড়াজালে আবদ্ধ। আভিজাত্যের বড়াই ও গোঁড়ামি ছিল অত্যন্ত প্রবল। আরব সমাজের এই সামাজিক প্রেক্ষাপটেই মুহাম্মদ (স) তাঁর ভ্রাতৃত্বের আহ্বান নিয়ে আবির্ভূত হন। বস্তুত তাঁর এই আহ্বান ছিল আল্লাহ্র বাণীরই প্রতিধ্বনি ঃ "শোন, হে মানব জাতি! আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি। আর আমিই তোমাদেরকে বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী-গোত্র ও পরিবার হিসেবে বানিয়েছি—যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার, জানতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত—মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহিযগার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবই জানেন, সব বিষয়ে তিনি পুরো ওয়াকিফহাল।"[৪৮] রসূলুল্লাহ্ (স) ভ্রাতৃত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন দয়ার অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে। কারণ এ দুটো জিনিস একই সাথে পালন করলে বাধাসমূহ দূর করা যায় এবং মানুষ শান্তি লাভ করে বেহেশত্ আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়।

"কিন্তু সে ত কঠিন উচ্চ স্থানে আরোহণ করতে চায় না। আপনি কি জানেন সেই উচ্চে আরোহণ কেমন বস্তু ? কোনও গোলামকে দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। দুর্ভিক্ষের দিনে খাবার দেয়া, য়াতীম আত্মীয়দের কিংবা মাটিতে লুণ্ঠিত কাঙ্গালকে। তারপরে সে তাদের সেই দলে শামিল হল যারা ঈমান আনল, ধৈর্য ধারণ করল ও সদয় ব্যবহারের জন্য উৎসাহ দিতে থাকে।"[৪৯]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কতিপয় হাদীসে দেখা যায়, আল্লাহ্ ইবাদতকারীর সাথেই থাকেন এবং মানুষের উপকার করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র উপকার করা। মানুষের কাছ থেকে উপকার পাওয়ার আল্লাহ্র কোন প্রয়োজন নেই। তবু মানুষ একে অপরকে উপকার করলে তিনি খুশী হন এই ভেবে যে, এই উপকার যেন তাঁর প্রতিই করা হল। সুতরাং মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৎকাজ করার মধ্যেই যে দয়া

www.nagorikpathagar.org

ও ভ্রাতৃত্বের গোড়া নিহিত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মুহাম্মদ (স) যখন মানুষকে সর্বপ্রকারের স্বার্থপরতা ও অহমিকা পরিহার করে দয়া ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তিনি সব খুঁটিনাটি বিবেচনা করেই তা করেছিলেন।

"না, তা ঠিক নয়। বরং তোমরাই ত য়াতীম অনাথদেরকে সম্মান সমাদর কর না। আর গরীব দুস্থদের খাবার দিতেও উৎসাহ দাও না। আর তোমরা যে মিরাসের ধন-সম্পদ গুটিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেল। আর তোমরা ধন-সম্পদকে খুব বেশি প্রিয় বলে মনে কর। তাহলে যখন পৃথিবীর উচ্চতা ঠুকে ঠুকে নিচু করে দেয়া হবে। আর আপনার পালনকর্তা যখন তশরীফ আনবেন। আর ফিরিশতাগণ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে যাবে। আর সেদিন জাহান্নাম এনে হাযির করা হবে। মানুষ ত সেদিনই সতর্ক হবে। কিন্তু তাদের এই সতর্কতা কি কাজ দেবে ? তখন বলবে ঃ হায় আফসোস ! আমি যদি আমার এই চিরস্থায়ী জীবনের জন্য কিছু আগাম পাঠাতে পারতাম। আর সেদিন আল্লাহ্‌র আযাবের তুলনায় আর কারও আযাব মোটেই তেমন হবে না। তেমন শক্তি বাঁধন আর ত কারও নয়।"[৫০]

আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান এবং তা প্রচার করার নির্দেশ আরবদের কাছে যেমন নতুন ছিল, তেমনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার আহ্বানও ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। আভিজাত্য ও বংশ গৌরবে গর্বিত আরবরা প্রথম দিকে এই আহ্বান সরাসরিভাবে প্রত্যাখ্যান করে এবং নীচু জাতীয় ক্রীতদাস ও দুর্বলদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হতে অস্বীকার করে। তাই বলপ্রয়োগ অনিবার্য হয়ে ওঠে। কারণ রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণীর সাফল্যের জন্য ভ্রাতৃত্ব ছিল অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুসারীর অধিকাংশই ছিল ক্রীতদাস এবং গরীব। প্রথম দিককার এই সব মুসলমান আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করে এমনই এক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে যে, উচ্চ বংশীয় ও গর্বিত আরবদের বলতে শোনা যেত, যেমনভাবে হযরত নূহ (আ)-কে বলা হয়েছিল ঃ "আমাদের মধ্যে যারা নগণ্য। তারা ত তোমাকে মেনে চলেছে, তাও আবার এমনি মামুলীভাবেই।"[৫১]

পবিত্র কুরআনে ভ্রাতৃত্বের এই মহৎ আদর্শের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এর পরিধির প্রসার ঘটিয়ে সমগ্র মানব জাতির ভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার জন্য ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "শোন হে রসূলগণ! তোমরা সবাই পাক-সাফ উত্তম জিনিস খাবে আর নেক কাজ করবে। আমি বেশ জানি তোমরা যা কিছু করছ। আর তারাই ত হচ্ছে তোমাদের ধর্মের অনুসরণকারী—সবাই একই ধর্মের উপর কায়েম রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

আর আমিই তোমাদের পালনকর্তা। সুতরাং তোমরা সবাই আমাকে ভয় করে চল।"[৫২]

বিশ্বাসীদের অন্তরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তাঁর শ্রেষ্ঠ নিয়ামত তাদের ওপর অকৃপণ হস্তে অর্পণ করে ঘোষণা করেন ঃ "তোমরা স্মরণ কর—আল্লাহ্ যে নিয়ামত তোমাদের দান করেছেন—যখন তোমরা একে অন্যের শত্রু ছিলে, কিন্তু আল্লাহ্ তোমাদের মনে আকর্ষণ পয়দা করলেন। তাঁরই নিয়ামতের ফলে—একে অন্যের ভাইরূপে গণ্য হলে ...।"[৫৩] ভ্রাতৃত্বের এই আহ্বান শুধু মুহাজির ও আনসারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এই আহ্বান ছিল সার্বজনীন।

"আপনি বলুন ঃ হে কিতাবধারিগণ ! এসো, এক বিষয়ে আমরা ঐকমত্যে পৌছি—তা হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না, কাউকে তাঁর শরীক করব না। আল্লাহ্ ছাড়া আমরা নিজেদের মধ্যে কাউকে পালনকর্তারূপে মানব না।"[৫৪]

"তিনি তোমাদের জন্য ত সেই জীবন ব্যবস্থাই নির্ধারিত করেছেন, যে জন্য নূহকে আদেশ দান করা হয়েছিল। আর যা কিছু আপনার কাছে ওহীযোগে পাঠিয়েছি, আর যা কিছু আমি ইব্‌রাহীম, মূসা ও ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই দীনকে কায়েম রাখবে। আর তাতে তোমরা কিছুমাত্র মতভেদ সৃষ্টি করো না।"[৫৫]

"তোমরা ঘোষণা করে দাও ঃ আমরা আল্লাহ্ পাকের উপর ঈমান এনেছি, আমাদের কাছে যা নাযিল হয়েছে তার ওপর আমরা আস্থাবান। ইব্‌রাহীম, ইসমাইল, ইসহাক ও ইয়াকুব এবং তাঁর সন্তানদের কাছে যা নাযিল হয়েছে, মূসা ও ঈসা যা কিছু পেয়েছেন আর নবিগণ তাঁদের পালনকর্তার কাছ থেকে যা কিছু পেয়েছেন, তার ওপরও ঈমান এনেছি। তাঁদের মধ্যে কারও ব্যাপারেই আমরা কোন রকম পার্থক্য করিনে। আমরা ত একমাত্র তাঁরই অনুগত মুসলমান।"[৫৬]

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী ছিল আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য সমগ্র মানব জাতির প্রতি আহ্বান এবং আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে একটা জাতি সৃষ্টির। এই ভ্রাতৃত্ব হল বিশ্বাসের—এই বিশ্বাস জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে বা বিজিত ও বিজেতার মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করে না। সমগ্র মানব জাতিই এই ভ্রাতৃত্বের আওতাভুক্ত। এ ভ্রাতৃত্ব আক্রমণ পছন্দ করে না। কিন্তু জ্ঞান ও সৎ উপদেশের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার করার নীতি সমর্থন করে। আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে এবং বিশেষ করে পরাজিতের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নির্দেশিত নীতি অনুসরণ করার জন্য এই বাণীতে আহ্বান জানানো হয়েছে। মানব জাতির ভ্রাতৃত্বের এই ধারণাটা একটা আলোকবর্তিকার মত, যে আলোকবর্তিকা যুদ্ধক্ষেত্রের অন্ধকারে বিশ্বাসীদের দিক নির্দেশ করে। দেশ জয় করতে, লুণ্ঠন করতে বা মানুষের ওপর

www.nagorikpathagar.org

অত্যাচার করার জন্য বিশ্বাসীরা যুদ্ধ করে না। বিশ্বাস বা ঈমানের স্বাধীনতার জন্যই তারা যুদ্ধ করে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই। সুষ্ঠু সঠিক পথ—গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে দেয়া হল।"[৫৭] "তারা যদি আপস-রফার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে আপনিও সেজন্য এগিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ্র ওপরেই ভরসা রাখুন।"[৫৮]

এমনকি পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সময়ও মুসলমানরা ইসলামের মানব ভ্রাতৃত্বকে সবার ঊর্ধে স্থান দেয়। বিশ্বাসীদের চোখে পৌত্তলিকতাবাদ হচ্ছে নিকৃষ্টতম অবিশ্বাস। আল্লাহ্র রোষ থেকে পৌত্তলিকদের উদ্ধার করাই বিশ্বাসীদের প্রধান কর্তব্য। পৌত্তলিকদের সাথেও তারা সাধারণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। পৌত্তলিক যতক্ষণ পর্যন্ত তার অবিশ্বাসকে ত্যাগ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীরা তার ওপর চাপ সৃষ্টি করে না। এটাও তার একটা দয়ার কাজ।

কোন পৌত্তলিক আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই বিশ্বাসীদের সমপর্যায়ে এসে যায় এবং তাদের মত সমান সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয়। তাই অবিশ্বাসীদের সতর্কীকরণও সত্যিকারের ভ্রাতৃত্বের পরিচয়। কোন অবস্থাতেই কোন বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর দয়া ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অধিকারের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে পারে না।

তাই একথা জোর দিয়ে বলা যায়, দয়া ও ভ্রাতৃত্ব মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর দুটো মূলনীতি। তীব্র মতভেদ ও যুদ্ধের সময়ও ইসলাম ভ্রাতৃত্বের নীতি বিসর্জন দেয় না। সমগ্র বিশ্বের ভ্রাতৃত্বই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। ইসলাম তলোয়ারের ধর্ম বলে অমুসলিম ও শত্রুদের অভিযোগ তাই সর্বৈব মিথ্যা।

দয়ার পতাকাতলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের প্রচার সৎকাজের মধ্যে গণ্য। এ কাজে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী সবচেয়ে বেশি সফলতা অর্জন করে। এটাই সবচেয়ে অলৌকিক ব্যাপার, যে সব গোত্র ও উপজাতির মধ্যে কোনদিন সহযোগিতা আশা করা যায়নি, তাদের তিনি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেন। ইসলামপূর্ব মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এবং তার পরবর্তী ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পূর্বে হিমালয় থেকে শুরু করে পশ্চিমে পিরেনিজ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগের সমস্ত জাতি সম্পূর্ণভাবে এই ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করে। কোটি কোটি মানুষের মনে মুহাম্মদ (স)-এর আহ্বান যে কত বড় পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিল, তা এই ঘটনা থেকেই সহজে অনুমান করা যায়।

মুহাম্মদ (স) যে ভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করেছিলেন, তা এখনও উত্তম বলে বিবেচিত। ইসলাম থেকে মুসলমানরা কিছুটা দূরে সরে গেলেও এই গুণ তাদের অন্তরে এখনও বর্তমান। সাতশ বছর আগে ইবনে বতুতার[৫৯] ভ্রমণকাহিনীতে

www.nagorikpathagar.org

মুসলমানদের এই গুণের যে প্রশংসা করা হয়েছে, আজকের যুগের পর্যটকগণও মুসলমানদের মধ্যে সেই গুণ দেখতে পান।

১৯১৩ খৃস্টাব্দে আলবেনিয়া সফর করার সময় এই ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়ে। তখন বলকান যুদ্ধ চলছিল এবং আমি বয়সেও যুবক ছিলাম। সে দেশে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। 'এড্রিয়াটিক' দিয়ে 'কটর' পৌঁছে আমি মন্টিনিগ্রোর পুরাতন রাজধানী সেটিনজের দিকে অগ্রসর হই। এই সময় পর্বতবাসী তুর্কীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। একজন বৃটিশ সাংবাদিক হিসেবে আমি আমার পরিচয় দিই। কিন্তু আসলে স্কোডার নগরী রক্ষক তুর্কী বা আলবেনিয়াদের তালিকাভুক্ত হতে আমি সচেষ্ট হই। একটা দোকানের ইসলামী নামের একটা সাইন বোর্ড দেখতে পেয়ে দোকানির কাছে আমি আমার পরিচয় দিই। তৎক্ষণাৎ তিনি আমাকে এমনভাবে অভ্যর্থনা জানান যে, মনে হল, ব্যাপারটা যেন সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। আমাদের কথাবার্তা ইশারার মাধ্যমেই চলে। কিছুক্ষণ পর দোকানি আমার সাথে একজন অর্থাৎ কুরআন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল জনৈক তুর্কী পণ্ডিতের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি আরবী ভাষা জানতেন। আমরা তখন পরস্পরের কথা বুঝতে সমর্থ হই। 'স্কোডারে' আসার পূর্ব পর্যন্ত দোকানি আমার সব কিছু দেখাশোনা করেন। উত্তর থেকে দক্ষিণে যাওয়ার সময় সমস্ত পথটাই আমি একের পর একজন লোকের তত্ত্বাবধানে থাকি। তাঁরা সবাই আমাকে অত্যন্ত যত্ন করেন। আমার নিজের আত্মীয়-স্বজনরাও এতটুকু যত্ন নিত কিনা সন্দেহ। বলকান যুদ্ধের এই কঠিন দিনগুলোতেও এই ঘটনা ইসলামের ভ্রাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় উত্তর আফ্রিকার মিসর থেকে আলজিয়ার্স পর্যন্তও আমি একই ব্যবহার পাই। মিসরের স্বাধীনতা লাভের সংবাদে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং আফগানিস্তানে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার নিযুক্তি উপলক্ষে তারা আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানায়।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর এই প্রেরণা আমি ইরান, আফগানিস্তান, তুরস্ক, ইরাক ও সিরিয়ায় দেখতে পাই। এই প্রেরণায় প্রাচ্যের আফগানদের মত পশ্চিম আফ্রিকার একজন নিগ্রোও গর্বিত। এই প্রেরণার ওপর আস্থাবান হয়েই তারা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে মক্কায় হজ্জ করতে যায়। এখান থেকেই মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে নজ্‌দ-এর রাজধানী রিয়াদ থেকে মক্কা যাওয়ার দ্বিতীয় দিনে আমি দু'জন পায়েহাঁটা লোককে দেখতে পাই। তারা কোথা থেকে আসছে এবং কোথায় যাবে জিজ্ঞেস করে বুঝতে পারলাম, তারা আরবী জানে না। তারা এসেছিল আফগানিস্তানের কান্দাহার থেকে। হজ্জের মৌসুমের আর দেরি ছিল না। আমি

www.nagorikpathagar.org

বুঝতে পারলাম যে, তারা পায়ে হেঁটে হজ্জ করতে যাচ্ছে। আমি তাদেরকে আমার গাড়িতে উঠিয়ে নিই। কয়েকটা রাত আমরা একসাথে কাটাই। আমরা কেউ কারো কথা বুঝিনি। তবু ভ্রাতৃত্বের প্রেরণা আমাদের প্রত্যেকটা অভিব্যক্তির মধ্যেই প্রকাশ পায়। দূর থেকে আগত এই লোকগুলোর এক ভ্রাতৃত্ব ছাড়া আর কোন জাগতিক পুঁজি ছিল না। মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত সেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধই আজ বেলুচ, পারস্যবাসী ও আরববাসীকে একসূত্রে গ্রথিত করেছে।

যেসব দেশে ইসলামের অনুশাসন যথাযথভাবে পালিত হয় না, সে সব দেশে ভ্রাতৃত্বের এই বন্ধন অনেকটা শিথিল হয়ে পড়েছে। ইসলামী অনুশাসন না মানার কারণ হচ্ছে জাতিগত বাধা এবং অধ্যাত্মবাদের ওপর বস্তুবাদের বিজয়। এর ফলে নিজের পরিবারের মধ্যেও ভ্রাতৃত্ববোধ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মুহাম্মদ (স)-এর ভ্রাতৃত্বের ও দয়ার আহ্বানের প্রভাব মুসলমানদের ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ঘটনা। মানুষের ইতিহাসে অন্যান্য আহ্বানের সাফল্য এর তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। অনেকে হয়ত আমার সাথে একমত নাও হতে পারেন এবং দৃষ্টান্ত হিসেবে য়াহূদীদের সংহতির কথা বলতে পারেন। য়াহূদীদের এই সংহতি কতগুলো বিশেষ ঘটনার উপজাত ফল হিসেবে সৃষ্ট এবং তা হচ্ছে তাদের ওপর একটানা অত্যাচার এবং বিভিন্ন দেশ থেকে ক্রমাগতভাবে বিতাড়ন। এসব দেশে তাঁরা সংখ্যালঘিষ্ঠ বলেই গণ্য হতো। রক্তের সাথে সম্পর্কীয় জাতিগত ও ধর্মগত বিশ্বাসই তাদের ঐক্যের সূত্রে গ্রথিত করেছে—মানব ভ্রাতৃত্বের আহ্বানে নয়। মুহাম্মদ (স) যে ভ্রাতৃত্বের আহ্বান জানান এবং ইসলামের যে বিষয়টি মানুষের মনে রেখাপাত করেছে, তার একটা গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য আছে। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের এই ধারণা তুর্কীরা পূর্ব ইউরোপে নিয়ে যায় ; এর আগে এই ধারণা আরবরা পশ্চিম ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ায় ছড়িয়ে দেয়। চিরুনীর দাঁত যেমন সমান তেমনি ইসলামের পতাকাতলে তারা ছিল সবাই সমান। একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি ও শান্তির প্রতি ভালবাসা ছাড়া একজন আরব ও অনারবের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে মুসলমানরা অমুসলিমদের উপর কর্তৃত্ব করত না।

ইসলামী রাষ্ট্রে যেসব অমুসলিম বাস করত, তাদেরকে 'জিম্মি' হিসেবে গণ্য করা হত। মুসলমানদের ন্যায় তাদের অধিকার ও কর্তব্য ছিল না। তারা ন্যায়বিচার ও দয়া লাভের অধিকারী ছিল। ভ্রাতৃত্বের অনুশাসন মেনে চলা তাদের জন্য ছিল বাধ্যতামূলক।

www.nagorikpathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়

সমাজ সংস্কার

নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন

অতীত ও বর্তমানে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে ইসলামের বাণী এক অভূতপূর্ব সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেছে। এই বিপ্লবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন। এই বাণীর মূল প্রেরণা মুহাম্মদ (স)-এর স্বীয় কাজ ও কথায় প্রতিফলিত হয়েছে। সামাজিক উন্নতির মূল উৎস হচ্ছে এই পরিবর্তন। কারণ সমাজ সংস্কারের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির সংস্কার।

মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "নিশ্চয়ই আপনি মহান চারিত্রিক আদর্শের ওপর কায়েম রয়েছেন।"[১] মুহাম্মদ (স) বলেন, "চরিত্রের সৎ গুণাবলীকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্যই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আমার পালনকর্তা নিশ্চয়ই আমাকে ন্যায়বান করে সৃষ্টি করেছেন।"

মুহাম্মদ (স)-এর মহান চরিত্রে সব মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। সত্যবাদিতা, বদান্যতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সহনশীলতা, বিনম্রতা, দৃঢ়তা, সাহসিকতা, গভীরতা, নমনীয়তা, ক্ষমাশীলতা, আনুগত্য ইত্যাদি মহৎ গুণের জন্যই তিনি সকলের কাছে সমানভাবে আদৃত হন। তাঁর অনুচরগণ তাঁর প্রতি এত বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে, তাঁরা তাদের ধর্ম এমনকি পিতাপুত্রকেও ত্যাগ করতে ইতস্তত করেন নি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হওয়ার পরও মুহাম্মদ (স)-এর চরিত্র এত স্পষ্ট ও স্বাভাবিক আছে যে, তাঁর বাণী সম্পর্কে সন্দিহান ব্যক্তিরাও তা অস্বীকার করতে পারেনি। আল্লাহ্‌র ঘোষণাই এর যথার্থ সাক্ষ্য। "আসলে ওরা ত আর আপনাকে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারবে না। বরং জালিমরাই যে আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে থাকে।"[২]

মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায় ও পরে সমাজে যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল, তা তাঁর মহৎ চারিত্রিক দৃষ্টান্তের প্রভাবের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তাঁর প্রচারিত বিশ্বাস ও ধর্মীয় অনুশাসনগুলোর ফলশ্রুতিও ছিল ঠিক একই রকম। সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়পরতা ও স্বাধীনতাকে তিনি বিশ্বাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে মনে করতেন এবং এগুলো প্রয়োগের ফলেই একটা উদার ও ন্যায়পরায়ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত

www.nagorikpathagar.org

হতে পেরেছিল। এর সবচেয়ে বড় সুফল দেখা যায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একত্বে বিশ্বাস স্থাপনে। তিনিই সকল ক্ষমতার অধিকারী। তাঁর হাতে পুরস্কৃত করার ও শাস্তি দানের ক্ষমতা রয়েছে। ইচ্ছা করলে তিনি দান করতে পারেন, আবার তা কেড়েও নিতে পারেন। তাঁর রাজত্বে সবাই সমান। এই বিশ্বাস মানুষকে পূর্ণত্ব এনে দেয়, মানবাত্মাকে স্বাধীন করে এবং তাকে জনকল্যাণের দিকে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র পথে এগিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ্ই সকল বস্তুর মূল উদ্দেশ্য নিয়ন্ত্রণ করেন এবং মানুষের কোন কাজের ইচ্ছা সম্পর্কে বিবেচনা করেন। কারণ এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ জ্ঞাত। এই বিশ্বাস নিয়েই মুহাম্মদ (স) সত্যের পথ দেখিয়েছেন।

সচ্চরিত্র লোক কখনও প্রতারণা করতে পারে না। কারণ সে জানে যে, আল্লাহ্র কাছ থেকে সে কোন কিছুই গোপন রাখতে পারবে না এবং এতে তার কোন লাভ হবে না। মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অনুসারে সত্যবাদিতা নৈতিক চরিত্রের প্রধান অবলম্বন। মিথ্যা ও প্রতারণা মানুষকে আল্লাহ্র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এবং তার আরব্ধ কার্য নষ্ট হয়ে যায়। তাই সত্যিকারের মুসলমানের পক্ষে মিথ্যুক ও প্রতারক হওয়া অসম্ভব।

বিশ্বাসীর অন্তর সাহসী হয় এবং নির্ভয়ে তিনি তাঁর মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তিনি মৃত্যুকে ভয় করেন না, কারণ তিনি আল্লাহ্কে বিশ্বাস করেন। তাঁর আত্মা নিষ্পাপ। অত্যাচার ও অবজ্ঞা থেকে নিজেকে এবং তাঁর ভাইকে রক্ষার জন্য এবং সর্বোপরি সত্যকে সমুন্নত রাখার জন্য তিনি প্রয়োজনবোধে মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। এই বিশ্বাসে যিনি বিশ্বাসী, তিনি কখনই ভীরু হতে পারেন না। নিজেকে ও তাঁর অনুচরদের রক্ষা করার জন্যই তিনি বেঁচে থাকেন এবং নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি বিপদ-আপদ প্রতিহত করেন।

বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, আল্লাহ্ এক এবং তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন এবং তা কেড়েও নেন। যে ব্যক্তি তাঁকে খুশী করতে পারে তাকে তিনি বিপুলভাবে দান করেন। সুতরাং তিনি কৃপণ নন—দানশীল। এভাবে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সন্তুষ্টি বিধান করে তার ধর্মভাইদের জন্যও তিনি আল্লাহ্র কল্যাণ কামনা করেন। বিশ্বাসী কখনও স্বার্থপর হতে পারেন না। তাঁর বিশ্বাস তাঁকে সম্পত্তির বাসনা থেকে বিরত রাখে। কারণ তিনি জানেন যে, এতে তিনি আল্লাহ্র দান থেকে তাঁর বান্দাদের বঞ্চিত করবেন। আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, গোত্র এমনকি সকল লোকের সাথে নিজেও শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করার জন্য তিনি দানশীলতার মধ্য দিয়ে তাঁর মানবিক ইচ্ছা প্রকাশ করার প্রয়াস পান।

বিশ্বাসী বা মুমিন ব্যক্তি অমায়িক, সামাজিক, বিশ্বাসী ও সরল। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বিশ্বাসের পূর্ণতার জন্যই এসব গুণ

www.nagorikpathagar.org

একান্তভাবে প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আল্লাহ্ই তাঁকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেছেন।

মুহাম্মদ (স) যে ইসলামী মতবাদ প্রচার করেছিলেন এবং যে মতবাদ দৃঢ়ভাবে তাঁর অনুচরদের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে তার একটা বড় স্তম্ভ। এ মতবাদই মুসলমানদের জন্য আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও উদার জীবন যাপনের ব্যবস্থা করেছে এবং তা তাদের মনে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। কোন কিছুর মূল্য ও গুরুত্ব তখনই নির্ধারিত হয়, যখন তা সত্যের সন্ধান দেয় এবং আত্মাকে মহান ও উদার করে।

আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ এলাকার মত সত্যিকারভাবে বিশ্বাসী কোন ইসলামী সমাজে জড়বাদ মানুষের চরিত্র ও আচরণের উপর প্রভুত্ব করতে পারে না।

কথিত আছে, আবুল মালিকের পুত্র উমাইয়া খলীফা সুলায়মান (৭১৫–৭১৭) একবার মদীনা সফরে গিয়ে বক্তৃতা করার জন্য আবূ হাজমকে ডেকে পাঠান। আবূ হাজম তাঁর কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করেন। আমীরুল মুমিনীনকে (বিশ্বাসীদের নেতা) সম্বোধন করে তিনি বলেন ঃ "নির্দিষ্ট স্থান ছাড়া অন্য কোন স্থান থেকে কোন জিনিসপত্র গ্রহণ করবেন না এবং যাদের জিনিস তাদের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে গচ্ছিত রাখবেন না।" খলীফা জিজ্ঞেস করেন ঃ "কার পক্ষে এই হুকুমের খেলাফ করা সম্ভব ?" উত্তরে আবূ হাজম বলেন ঃ "আল্লাহ্ যাঁকে প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা দিয়েছেন, যেমন আপনি।" খলীফা বলেন, "হে হাজম, আরো কিছু বলুন।"

আবূ হাজম বলতে শুরু করেন ঃ "জেনে রাখুন, পূর্ববর্তী খলীফার মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব আপনার ওপর অর্পিত হয়েছে এবং আপনার কাছে এই দায়িত্ব যেভাবে এসেছে, ঠিক সেভাবেই আপনার কাছ থেকে চলে যাবে।" খলীফা জিজ্ঞেস করেন ঃ "আপনি আমাদের মাঝে চলে আসেন না কেন ?" উত্তরে আবূ হাজম বলেন ঃ "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি আপনার কাছে গিয়ে কি করব ? আপনি যদি আমাকে কাছে টেনে নেন, তাহলে আমি আমার পথ থেকে বিপথগামী হব। আর আপনি যদি আমাকে দূরে ঠেলে দেন তবে আমাকে অপমান করা হবে। আমি যা চাই তা আপনার নেই বা আবার এমন কিছু নেই, যার জন্য আমি আপনাকে ভয় করব।" খলীফা বলেন ঃ "আপনি কি চান বলুন।" আবূ হাজম বলেন, "আপনার চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালীর কাছেই আমি চেয়েছি। তিনি যা দেন তা আমি গ্রহণ করি, না দিলেও আমি সন্তুষ্ট।"

মানুষের চরিত্রকে দৃঢ়, মহৎ ও পবিত্র করতে মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রভাব যে কেমন হতে পারে তার একটা কাহিনী এখানে তুলে ধরছি। তাঁর অনুচর ও

www.nagorikpathagar.org

অনুসারীদের তথা সর্বত্রই মুসলমানদের এ ধরনের আল্লাহ্-প্রীতি, সদয় ব্যবহার, সদুপদেশ দান এবং লাম্পট্য ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রচুর দেখা যায়।

কথিত আছে, ইউনুস ইবনে ওবায়েদ নামে জনৈক ব্যক্তি বিভিন্ন মূল্যের পোশাক বিক্রি করত। এগুলোর মধ্যে অনেক পোশাকের দাম ছিল চারশ দিরহাম আবার কিছু কিছু পোশাকের দাম ছিল দু'শ দিরহাম। একদিন ইউনুস তার ভ্রাতুষ্পুত্রের কাছে দোকানের ভার ন্যস্ত করে নামায পড়তে যায়। এমন সময় জনৈক বেদুইন দোকানে এসে চারশ দিরহামের একটা জামা চায়। কিন্তু পরিবর্তে দু'শ দিরহামের একটা জামা নিয়ে চলে যায়। জামাটা বেদুইনের খুব পছন্দ হয়েছিল। তাই সে চারশ দিরহাম দিয়েই জামা কিনে নিয়ে যায়।

পথিমধ্যে ইউনুসের সাথে তার দেখা হয়। ইউনুস জামাটা চিনে ফেলে। বেদুইন কত দিয়ে জামাটা কিনেছে তা সে জানতে চায়। বেদুইন জানায় যে, সে চারশ দিরহাম দিয়ে জামাটা কিনেছে। "কিন্তু এর দাম ত দু'শ দিরহামের বেশি নয়।"— ইউনুস বলল, "তুমি আমার সাথে এস, আমি এটা বদলিয়ে দিচ্ছি।" বেদুইন উত্তরে জানাল, "আমার দেশে পাঁচশ দিনারের বেশি দামে এটা বিক্রি হয়। আমি এতেই সন্তুষ্ট।" ইউনুস বলে, "ও কথা বলো না। ধর্মের উপদেশ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী লাভের চেয়ে অনেক মূল্যবান।" দোকানে ফিরে গিয়ে ইউনুস বেদুইনকে দু'শ দিরহাম ফিরিয়ে দেয় এবং তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে এই বলে বকাবকি করে ঃ "তোমার কি লজ্জা নেই ? তুমি কি আল্লাহ্কে ভয় কর না ? তুমি সোনা গ্রহণ করে মুসলমানদের সদুপদেশ ত্যাগ করেছ।" ভ্রাতুষ্পুত্র উত্তরে বলে ঃ "আল্লাহ্ সাক্ষী। খুশী হয়েই বেদুইন ঐ জামাটা নিয়েছিল।" ইউনুস তখন বলে, "কিন্তু তুমি যেভাবে খুশী হয়েছ, সেভাবে কি তুমি তাকে খুশী করেছ ?"

মুহাম্মদ ইবনুল মুনকাদির সম্পর্কে বলা হয়েছে, তার অনুপস্থিতিতে তার ভৃত্য জনৈক বেদুইনের কাছে পাঁচ দিরহাম মূল্যের একটা জিনিস দশ দিরহামে বিক্রি করে। মুনকাদির সারাদিন বেদুইনের খোঁজে ঘোরাঘুরি করে এবং শেষে তাকে পেয়ে বলে, "ছেলেটা ভুল করে পাঁচ দিরহাম মূল্যের জিনিসটা তোমার কাছে দশ দিরহামে বিক্রি করেছে।" আশ্চর্য হয়ে বেদুইন বলল, "কিন্তু এতেই আমি সন্তুষ্ট।" মুনকাদির উত্তরে বলে, "তুমি খুশী হলেও আমাদের খুশীর মাধ্যমেই তোমাকে খুশী করব।" তৎপর সে তাকে পাঁচ দিরহাম ফিরিয়ে দেয়।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী দ্বারা যারা প্রভাবিত হয়েছে এবং যারা তাঁর নির্দেশ মেনে চলে, তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই এই রকম। "নিশ্চয়ই সে বিশ্বাসী নয়, যতক্ষণ

www.nagorikpathagar.org

পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা চায় অপরের জন্যও তা সে কামনা করে।" খাঁটি মুসলমান কখনই প্রতারণা বা জুয়াচুরি করতে পারে না।

মুহাম্মদ (স)-এর নির্দেশ যারা অনুসরণ করে তাদের ওপর তাঁর বাণীর প্রভাব গভীরভাবে রেখাপাত করে থাকে। অমিতব্যয়ী, ধৃষ্টতা বা গর্ব প্রকাশ করার জন্য এই বাণী আহ্বান জানায়নি। গোপনে বা প্রকাশ্যে বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সাথে সৎ কাজ করে যাওয়ারই আহ্বান এতে জানানো হয়েছে। মানুষকে ভয় না করে আল্লাহ্‌কেই ভয় করা ইসলামের নীতি।

খলীফা উমরের সামনে একবার জনৈক ব্যক্তির পরিচিতির প্রয়োজন হয়। খলীফা এমন একজন লোককে আনার কথা বলেন, যে তাকে জানে। অতপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হয়, যে তার ভূয়সী প্রশংসা করে। হযরত ওমর তাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কি তার নিকট-প্রতিবেশী যে তুমি তার সব কিছু জান ?" 'না'— লোকটা উত্তর দেয়। "তুমি কি লোকটার ভ্রমণপথের সঙ্গী ছিলে, যখন একজন অপরজনকে জানার সুযোগ পায় ?" 'না'—পুনরায় সে উত্তর দেয়। "তুমি সম্ভবত তার সাথে দিনার ও দিরহামের কারবার কর ? এতে তুমি লোকটার সততা সম্পর্কে জানতে পেরেছ।" 'না'—আবার সে জবাব দিল। "তাহলে, আমার মনে হয়, তুমি লোকটাকে মসজিদে কুরআন পড়তে এবং নামাযের সময় মাথা উঠাতে ও নামাতে দেখেছ।" 'হ্যাঁ'—লোকটা জবাব দেয়। হযরত ওমর তখন রুক্ষস্বরে বলেন, "যাও, তুমি লোকটা সম্পর্কে কিছুই জান না।" তৎপর হবু সাক্ষীর দিকে লক্ষ্য করে বলেন, "যাও, এমন একজন লোককে নিয়ে এসো, যে তোমাকে জানে।"

সংহতি

"এই যে তোমাদের জাতি এ তো একই জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক, অতএব আমার ইবাদত কর।"৩

নবী করীম (স) বলেন, "আপনারা দেখবেন যে বিশ্বাসীরা দয়ায়, ভালবাসায় এবং সহৃদয়তায় একে অপরের অঙ্গস্বরূপ। শরীরের কোন একটা অংশ অসুস্থ হয়ে পড়লে সমস্ত শরীরই অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারণ এক অংশের সাথে অপর অংশের নিদ্রাহীনতা ও অসুস্থতা জড়িত।'

ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের মধ্যে পার্থক্য এই যে, সামাজিক কাজকর্মের ভার 'সিজারে'র হাতে তথা জাগতিক কর্তৃপক্ষের হাতে ছেড়ে দিয়ে ইসলাম শুধু ইবাদত করার কথাই বলে না। বরং ইসলাম ব্যক্তির সাথে পরিবারের, ব্যক্তির সাথে জাতির এবং এক জাতির সাথে অপর জাতির সম্পর্ক, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। সমাজ-সংস্কারই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ইবাদতও

www.nagorikpathagar.org

বিশেষ সহায়ক। বৃহত্তম মানব সমাজের কাঠামোর মধ্যে মুসলমানরা একটা সুসংহত জাতি। এর সদস্যদের মধ্যে একের প্রতি অপরের একটা অন্তর্নিহিত দায়িত্ব রয়েছে। এর মধ্যে ভাঙন রোধ করতে প্রত্যেকেই ব্যক্তিগত ও যৌথভাবে সচেষ্ট থাকে।

সামাজিক এই সংহতির কথা মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রায় সর্বত্রই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। মানবেতিহাসে এমন কম সমাজই দেখা যায়, যেখানে ইসলামী সমাজের মত এক সুদৃঢ় ঐক্য, সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গড়ে উঠেছে।

ইসলামী সমাজে ব্যক্তির প্রতি সমাজের এবং সমাজের প্রতি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য প্রয়োজন একটা দায়িত্বশীল সমাজ গঠনের। এজন্যই ইসলাম জামা'আতে নামায পড়ার পদ্ধতি চালু করে। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "এটাই নিশ্চিত ধর্ম। ধৈর্য ও সংযম সহকারে এর গভীরে প্রবেশ করতে হবে। কারণ অধৈর্য অশ্বারোহী কোন দূরত্বই অতিক্রম করতে পারে না।"[৪] ব্যক্তির প্রতি অবহেলা না করার জন্য, তার স্বার্থ রক্ষার জন্য, তার অধিকার ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য এবং তার বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধন করার জন্য ইসলামী সমাজে বিশেষ কতকগুলি উপায় অবলম্বিত হয়ে থাকে। এজন্য ইসলামে একা একা নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায পড়ার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

এভাবেই ইসলামী সমাজে ব্যক্তি সমাজের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সে যেমন সমাজকে ত্রুটিমুক্ত করে তেমনি সমাজও তাকে ত্রুটিমুক্ত করে দেয়। সে যেমন সমাজকে কিছু দেয়, তেমনি সে সমাজ থেকেও কিছু পায়। সে যেমন সমাজকে রক্ষা করে, সেও তেমনি সমাজ কর্তৃক রক্ষিত হয়। এ দ্বিমুখী দায়িত্ববোধ গড়ে তুলে সংস্কার ও সামাজিক সংহতি অর্জনই ইসলামের মুখ্য উদ্দেশ্য। ব্যক্তি ও সমাজের এই দু'ধরনের দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেই ইসলাম মুসলমানদের জন্য একটা সুসংহত, সুদৃঢ়, সুখী ও শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলতে চায়। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মতেঃ "তোমাদের প্রত্যেককেই এক একজন মেষপালক এবং প্রত্যেককেই স্ব স্ব কর্তৃত্বাধীন মেষের হিসেব দিতে হবে। আমীরও (শাসনকর্তা) একজন মেষপালক বিশেষ। তাঁর প্রজা সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে। পরিবারের প্রধান ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারের সদস্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। স্ত্রীলোক তার স্বামীর গৃহের কর্ত্রী। তাঁর কর্তৃত্বাধীন সবকিছু সম্পর্কে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে। এভাবে তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন শাসক এবং তোমাদের অধীনস্থ লোক সম্পর্কে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে।"

"আমার ওপর ওহী নাযিল হয়েছে, তোমরা নম্র থাকবে যেমন অন্যের ওপর তোমাদের গর্ব প্রকাশ না পায়।"

www.nagorikpathagar.org

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ "তুমি কি তাকে দেখেছো যে দীনকে প্রত্যাখ্যান করে? সে তো সে-ই যে পিতৃহীনকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয় এবং সে অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না।"[৫] "মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এই নগরীর যে সকল অধিবাসী বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদেরকে নিজেদের ওপর স্থান দেয় নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও।"[৬] বিশ্বাসীরা প্রার্থনার সময় বলে, "বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না।"[৭] এ নীতি যখন সার্বিকভাবে প্রতিপালিত হয় তখন ব্যক্তির মন সমাজ সেবার প্রতি সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গীকৃত হয় এবং নিজেকে সে সমাজের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়ে ফেলতে পারে।

সমাজের প্রতি ইসলামের নির্দেশ হল ঃ "বিশ্বাসিগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা ভ্রাতৃগণের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর।"[৮]

রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "মুসলমানদের রক্তের জন্য জবাবদিহি করতে হবে। যাঁরা দুর্বল তারা সবলের আশ্রয় পাওয়ার অধিকারী এবং তাদের বিরুদ্ধে যারা, তাদের হাত সম্বরণ কর। তোমার ভাইকে তুমি সাহায্য কর, তা সে দোষীই হোক বা যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে সে-ই হোক।" সাহাবীরা বলেন, "হে আল্লাহ্র নবী, যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে আমরা তাকে সাহায্য করতে পারি। কিন্তু দোষী ব্যক্তিকে আমরা কিভাবে সাহায্য করতে পারি ?" উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তাকে খারাপ কাজ করা থেকে বিরত রাখাটা তাকে সাহায্য করা।"

ব্যক্তির আচরণের জন্য সমাজ যে দায়ী, তার যথার্থতার পরিচয় পাওয়া যায় রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিজের মুখে বর্ণিত উপদেশপূর্ণ এ গল্প থেকে ঃ একবার একদল লোক একটা নৌকায় করে যাচ্ছিল। তারা সবাই নিজ নিজ জায়গা দখল করে বসেছিল। হঠাৎ একজন লোক নিজের জায়গা কুঠার দিয়ে ছিদ্র করতে শুরু করে দেয়। অন্যান্য যাত্রী তাকে বলল, "তুমি কি করছ ?" উত্তরে সে বলল, "এটা আমার জায়গা, আমি যা ইচ্ছা তাই করব।" এখন তার সাথীরা যদি তাকে একাজে বাধা দেয় তবে সে ও তার সাথীরা পানিতে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু তারা যদি তাকে একাজে বাধা না দেয় তবে তারা সকলেই ধ্বংস হয়ে যাবে।

যৌথ কল্যাণের জন্য সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতাই হল সামাজিক দুর্নীতি রোধ করার মূল ভিত্তি। এ ধরনের সমঝোতা না থাকলে সংস্কারের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতিনিধি ও সম্পদের জিম্মাদার হিসেবে কখনই মানুষ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এ সামাজিক দায়িত্বকে স্বীকার করে নেয়। যারা সামাজিক দুর্নীতি দমন করতে চায়, তাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে সমাজের প্রতি ব্যক্তির এবং ব্যক্তির প্রতি সমাজের কর্তব্যবোধকে জাগ্রত করা। এ দ্বিবিধ দায়িত্বকে তাদের অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। পিতামাতার প্রতি

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধাভাবের মত সমাজের প্রতি ব্যক্তির শ্রদ্ধাভাব এবং ব্যক্তির প্রতি সমাজের মাতৃসুলভ ও আশ্রিতের মনোভাব যতদিন গড়ে না উঠবে, ততদিন এ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এ দুটো দায়িত্ব স্বীকার করে এবং এর উপজাত ফল হিসেবে আমরা যা পাই, তা আধুনিক কালে 'সাধারণ ইচ্ছা' বা 'জনমত' নামে খ্যাত। এ জনমতই হচ্ছে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও উদ্দেশ্যের ঐক্য বিধায়ক কোন প্রগতিশীল জাতির সদাজাগ্রত প্রহরী। জনমত এমনই একটা কার্যকর ক্ষমতা যা শাসক ও ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করে, জাতিকে ন্যায় কাজ করতে বাধ্য করে এবং দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে। ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণে আইন যেখানে ব্যর্থ, সেখানে এ জনমতই ধারাল অস্ত্রের ন্যায় কাজ করে। এটা হল সেই জাগ্রত প্রহরী যা আইনের কার্যকারিতার নিশ্চয়তা বিধান করে এবং সরকারকে নৈতিক নীতি এবং ন্যায়নীতিসমূহ মানতে বাধ্য করে।

এভাবে ইসলাম ব্যক্তির পদস্খলন এবং সমাজের বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে তথা অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমতকে অভিভাবক হিসেবে দাঁড় করাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে একটা পারস্পরিক দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং এটাই হল ন্যায়ভিত্তিক সমাজের দৃঢ় ভিত্তি।

পবিত্র কুরআনের ভাষায় ঃ "বিশ্বাসী নর-নারী একে অপরের বন্ধু, এরা সৎ কার্যের নির্দেশ দেয় এবং অসৎ কার্যে নিষেধ করে।"[৯] "তোমাদের মধ্যে একদল তৈরী হোক যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দিবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে ; এরাই হবে সফলকাম।"[১০]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর এক হাদীসে আছে ঃ "ইসরাইলের বংশধরেরা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়লে তাদের মধ্যকার জ্ঞানী ব্যক্তিরা সংযমের উপদেশ দিতে থাকেন। কিন্তু তারা পাপ কাজ থেকে বিরত হল না। তারা তাদের সাথে বসে আহার করল ও পান করল। তাই আল্লাহ্ তাদের একজনের অন্তরকে অন্য একজনকে দিয়ে আঘাত করালেন এবং তাদের অবাধ্যতার জন্য অভিশাপ দিলেন।"

আল্লাহ্ ও সমাজ কর্তৃক প্রদর্শিত ন্যায় পথ কেউ অনুসরণ করলে, অন্যের ভয়ে—তা সে যেই হোক না কেন—সে পথ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমাদের সর্বপ্রধান সামাজিক ব্যাধি হল আমাদের মধ্যে এখনও একটা ন্যায়ভিত্তিক জনমত গড়ে ওঠেনি। প্রায়ই দেখা যায়, কোন ব্যক্তি বা সংস্থা সর্বজনস্বীকৃত কোন ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে, কখনও বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আবার কখনও বা সাধারণ অধিকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে চলেছে। কিন্তু অন্যেরা এর বিরুদ্ধে কিছু বলছে না। কারণ তারা তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মানুষের মধ্যে এই অনৈক্য ও

৬—

www.nagorikpathagar.org

স্বার্থপরতার একমাত্র কারণ হল একক নৈতিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষার অভাব। তাদের মধ্যে বিভিন্ন মতবাদ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে জাতীয় চরিত্র, চিন্তা-ভাবনা ও বিশ্বাস দুর্বল হয়ে গেছে এবং একই জিনিস ভাল ও মন্দে রূপ নিয়েছে—এক দলের কাছে যা খারাপ আর এক দলের কাছে তা ভাল বলে বিবেচিত হচ্ছে।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্বের মূল্যায়ন করতে হলে এবং একটা সম ও ন্যায়ভিত্তিক জনমত গঠন করতে হলে প্রচার ও প্রচারণার প্রয়োজন। প্রত্যেকেই সঠিকভাবে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হলে বিকৃত ও বিভ্রান্ত জনমতের পরিবর্তে একটা সুষ্ঠু ও শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠবে।

মানুষের মনে সততা, ভালবাসা ও মহানুভবতার বীজ বপন করতে হলে, তার মন থেকে অনিষ্টকর চিন্তার মূলোৎপাটন করতে হলে, তাকে বিজ্ঞজনোচিত প্রচারের মাধ্যমে এমনভাবে বোঝাতে হবে যেন তা মনের গভীরে পৌঁছে যায়। ন্যায়ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার ব্যাপারে প্রধান উপায় হচ্ছে জনমতের গভীরে প্রবেশ করা। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্ কোনও কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়।"[১১]

সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম যে শক্তিশালী অস্ত্র প্রয়োগ করেছিল, তা হল, সবাইকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে সামাজিক শিক্ষা প্রদান করা। মানুষের অন্তরের গভীরে প্রবেশ করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স) সব সময় কুরআন এবং তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ও বক্তব্যকে কাজে লাগিয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল, তারা যেন সত্যকে উপলব্ধি করে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং যুক্তির মাধ্যমে তাদের সব কাজ সমাধা করতে পারে।

এ কারণেই রসূলুল্লাহ্ (স) সর্বপ্রথম আল্লাহ্র ইবাদতের জন্য মানব জাতির প্রতি আহ্বান জানান এবং তারপর আইন প্রণয়নের কাজে হাত দেন। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী যতদিন পর্যন্ত না মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল বা তারা একত্রিত হয়ে বাণীর সত্যতা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা না করেছিল, ততদিন পর্যন্ত অর্থাৎ দীর্ঘ তের বছর ধরে তিনি কেবল মানুষের কাছে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপন করার আহ্বান জানিয়ে গেছেন। তাঁর এই বাণী প্রচারিত হওয়ার পর এবং এর স্বপক্ষে য়াছরিবে (মদীনায়) জনমত গঠন হওয়ার পরই মুহাম্মদ (স) একটা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানান। কারণ রাষ্ট্রই আইনের অভিভাবক ও আইনকে কার্যকরী করার হাতিয়ার।

এভাবেই ইসলাম প্রথমে আহ্বান জানিয়ে এবং পরে আইন প্রণয়ন করে আরব সমাজকে দুর্নীতি ও কুপ্রথার কবল থেকে মুক্ত করে। বর্তমান যুগে যারা সমাজের প্রয়োজন মেটাতে চায়, তাদেরকে এ পথই অবলম্বন করা উচিত। আইন প্রণয়নের

www.nagorikpathagar.org

আগে তাদের মুহাম্মদ (স)-এর বাণীকে ন্যায়ের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। আইন প্রণয়নের ধীর প্রক্রিয়ার স্বার্থে তাদেরকে দ্রুত কার্য সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এভাবেই উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে সমাজকে আদেশ গ্রহণের উপযোগী করে তুলতে হবে।"[১২]

সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলাম প্রথমে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণীকে সমাজ সংস্কারের কাজে লাগায় এবং বাণীর উদ্দেশ্যসমূহ স্থায়ী বা রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন করে। মানুষের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বিশ্বাস ও সৎ কাজকে প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কেবল সৎ কাজ করার মধ্যেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অধিকার ও কর্তব্য অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। ইসলামী সমাজের প্রত্যেকটি অধিকার ও কর্তব্য সৎকাজকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত—সে অধিকার বা কর্তব্য সমাজের প্রতি ব্যক্তির যেমন হতে পারে, তেমনি ব্যক্তির প্রতি সমাজেরও হতে বাধা নেই। যে কাজ ন্যায়কে বাদ দিয়ে অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়, যতই লাভজনক হোক না কেন, সে কাজ করতে ইসলাম নিষেধ করে।

কাজেই আমরা দেখতে পাই, মানুষের জীবনের প্রত্যেকটা স্তর বা ধাপ নিয়ে ইসলাম গভীরভাবে চিন্তা করেছে, সামগ্রিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য জীবনের প্রত্যেকটি স্তরের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, বিশ্বের সকল মানুষের জন্য এমন একটা তৃপ্তিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা কায়েম করা যা পরকালের অনন্ত সুখের পূর্বাভাসস্বরূপ।

ইসলামের নবী কাউকে অপরের প্রতি তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন নি। বিশ্বাসীদের নেতা বিশ্বাসী, তাদের প্রতিনিধি এবং তাদের অধীনস্থদের জন্য যেমন দায়ী তেমনি পরিবারের প্রধান পরিবারের সদস্যদের জন্য দায়ী, স্ত্রী তার স্বামীর গৃহের জন্য এবং ব্যক্তি দায়ী তার প্রতিবেশী ও নিজের জন্য। সর্বশেষ বিশ্লেষণে দেখা যায়, ইসলামী সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার সমাজকে সংশোধনের জন্য দায়ী। কারণ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অন্যকে সৎ পথে চলার আহ্বান জানানোর ব্যাপারে তারও কর্তব্য রয়েছে। বদান্যতা ও ধর্মভীরুতা অর্জনের জন্য সত্য ও সহযোগিতার বাণী প্রচারও তার সে দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহ্‌র একত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার পর ইসলামের দ্বিতীয় মূলনীতি হল সৎ কাজ। সৎ কাজের প্রধান শিক্ষা হল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত দায়িত্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা। অন্যায় এবং সামাজিক ব্যাধি দূর করার জন্য ইসলামের নৈতিক শিক্ষার চেয়ে আর কোন উপযুক্ত অস্ত্র নেই। এর ওপরই ইসলামী সমাজে মানুষের ভাগ্য ও মর্যাদা নির্ভর করে। এ উপাদানই জাতিকে সুসংহত করে এবং ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে রক্ষা করে। য়াছরিবের আনসার ও মক্কার মুহাজিরদের মধ্যে গোত্রীয় ও

www.nagorikpathagar.org

বংশগত আনুগত্য অতিক্রম করে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সংহতির ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এ বাণীই একটা সুসংবদ্ধ ও সুসংহত জাতির সৃষ্টি করেছিল যা পরিশেষে সমস্ত কর্তৃত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ জাতির ঐকমত্যই আইন এবং এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। এ জাতিই তার সদস্যদের জন্য জামিনস্বরূপ এবং তা একটা জীবন্ত শক্তি হিসেবে বিরাজিত। জাতিও ভোগ করবে এমন এক আনুগত্য যা বিশ্বাস ও ধর্মের অনুশাসনে পূর্ণ। জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে সদস্যরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "যারা আল্লাহ্‌র পথে নিহত হয়েছে, তাদের মৃত মনে করো না। তারা নিজেদের পালনকর্তার কাছে জীবিত—সেখানে তারা পানাহার করছে।"[১৩]

যে সব ইসলামী সমাজে মুসলিম ঐতিহ্য রক্ষা করা হয়েছে, সে সব স্থানে আমি এমন অতুলনীয় পরস্পর নির্ভরশীলতা ও ঐক্য লক্ষ্য করেছি যে, বিশ্ব সমাজের বুনিয়াদ হিসেবে তার ওপর কোন অগ্রগতি সাধন করার জন্য আর কোন সমাজসংস্কারক আজ পর্যন্ত কোন নতুন উন্নততর পন্থা উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন নি।

উত্তর আফ্রিকার 'তুয়ারেগ' (Tuareg) উপজাতির মধ্যে আমি এ ধরনের মধুর ঐক্য লক্ষ্য করেছি। তাদের মধ্যে কেউ শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকে না, জাতির জন্যও সে বেঁচে থাকে। তাদের প্রতি প্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করান একজন মুসলমান। তিনি স্বদেশ ছেড়ে 'ফেজানে'[১৪] (Fezzen) 'তুয়ারেগ'দের সাথে ছিলেন। তিনি সেখানে কিছুদিন 'তুয়ারেগ'দের আশ্রয় ও বদান্যতা ভোগ করার পর তাদেরই আশ্রয়ে স্বীয় পরিবারকে রেখে জীবিকা অন্বেষণে বের হন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশি কিছু রোজগার করতে পারেননি। ত্রিপলিতানিয়ার মিসুরাতা নামক স্থানে তিনি আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর পরিবারের কাছে ফেরত যাওয়ার ব্যাপারে আমরা তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।

প্রায় এক বছর পর তিনি পুনরায় মিসুরাতায় ফিরে আসেন। আমরা ধারণা করেছিলাম যে, তিনি তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করে আবার ফিরে এসেছেন। কিন্তু আসলে তা নয়। আমাদের সাথে প্রথম দেখা হওয়ার পর কেন তিনি তাঁর পরিবারের সাথে দেখা করে আসেন নি জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আপনাদের সাথে প্রথমবার দেখা হওয়ার পর আমি আমার সামান্য পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করি। এখন আমার কাছে যে অর্থ আছে তা দিয়ে 'তুয়ারেগ'দের ঋণ পরিশোধ করা যাবে।" 'তুয়ারেগ'দের না আপনার ছেলেমেয়েদের ?—আমি জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি বললেন, "প্রথম তুয়ারেগদের। কারণ আমার অনুপস্থিতিতে তারা আমার

www.nagorikpathagar.org

ছেলেমেয়েদের ভরণ-পোষণ করেছে। এখন আমি ঐ সব ছেলেমেয়ের ভার নেব, যাদের পিতামাতা অনুপস্থিত আছে। আল্লাহ্ আমাকে যা দিয়েছেন, তা আমার ছেলেমেয়ে ও প্রতিবেশীদের মধ্যে বণ্টন করে দেব।"

প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর যে মনোভাব তা সকল 'তুয়ারেগ'-এর মধ্যে বিদ্যমান কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, "আমরা সকলেই সকলের সুখ-দুঃখের সমান অংশীদার। অনুগ্রহ তার সাথেই বিরাজিত যে তা প্রকাশ করে। আমাদের মধ্যে সবাই খালি হাতে তাঁবুতে ফিরতে লজ্জাবোধ করে—লজ্জাবোধ করে তার নিজের পরিবারের সদস্যদের কাছে নয়, প্রতিবেশীদের কাছে। কারণ তার পরিবারের সদস্যদের মত প্রতিবেশীরা আকুল আগ্রহে তার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করে।"

মুসলিম পরিবার সম্পর্কে জনৈক আধুনিক অমুসলিম লেখকের উক্তি হল ঃ "মুসলিম পরিবার বুড়ো, অনাথ, নির্বোধ, অলস এমনকি ভবঘুরেদেরও ভার সম্পূর্ণরূপে বহন করে। এ ব্যাপারে পাশ্চাত্য জগতের সাথে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। পাশ্চাত্য সমাজে আত্মীয়তার বন্ধন দৃঢ় নয় এবং অকেজোদের সরকারী হেফাজতে রেখে দেয়া হয়। ইসলামী রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র না হলেও মুসলমান পরিবারগুলো কল্যাণমূলক পরিবার। কারণ মুসলিম পরিবারে যোগ্য বা অযোগ্য সবাইকেই ভরণ-পোষণ করা হয়।"১৫

এ ধরনের সামাজিক প্রকৃতি শুধু 'তুয়ারেগ' বা অনুরূপ মরুবাসীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় কিংবা গোত্রীয় সংহতির জন্য এটা কোন পূর্বশর্তও নয়। বরং এটা একটা সার্বজনীন ইসলামী নীতি, যা তাদের মধ্যেই বেশি করে লক্ষ্য করা যায়, যারা এখনও আধুনিক বস্তুবাদী জগৎ থেকে দূরে রয়েছে। শহর হোক বা গ্রাম হোক, প্রাচ্য হোক বা প্রতীচ্য হোক, আরব হোক বা অনারব হোক এবং সাদা হোক বা কালো হোক, যে সব মুসলমান সমাজে ইসলামী আদর্শ পুরোপুরি পালন করা হচ্ছে, সে সব সমাজে এ সহযোগিতার মনোভাব এখনও বিদ্যমান।

অনেক স্থানেই মুসলমানরা আজও সুখী-সমৃদ্ধিশালী, পরস্পর নির্ভরশীল ও সংহতিপূর্ণ জীবন যাপন করছে। এদের প্রধান গুণ ও উদ্দেশ্য হল পরোপকার। তারা এখনও মুহাম্মদ (স)-এর প্রদর্শিত ন্যায়ভিত্তিক সমাজে বাস করছে। আধুনিক বস্তুবাদ সংস্কৃতিতে পথভ্রষ্ট কোটি কোটি মুসলমান ও এদের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। প্রতিবেশী তো দূরের কথা, অতি নিকট-আত্মীয়দের বাদ দিয়ে এই পথভ্রষ্টরা শুধু নিজেদের লোভ-লালসা চরিতার্থ করতেই ব্যস্ত।

www.nagorikpathagar.org

পরোপকার

পরোপকার মহানবী (স)-এর বাণীর একটি প্রধান স্তম্ভ এবং সামাজিক পবিত্রতা প্রতিষ্ঠার অকৃত্রিম পন্থা।

'পরোপকার' শব্দটি পবিত্র কুরআনের অনেক জায়গায় বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির মাধ্যমে সত্যবাদিতা, মহত্ত্ব, সৎকাজ এবং ব্যাপকার্থে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য বোঝানো হয়েছে।

পরোপকার অর্থে এখানে আরো বোঝানো হয়েছে গরীব-দুঃখীর দুঃখ মোচন করা এবং সমাজের ঐ সমস্ত ভাইয়ের দুঃখ মোচন করা, যারা স্বাধীন ও সুখী জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে বের হয়ে দুর্দিনের কোন না কোন সঙ্কট—যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সহায়হীনতা, রোগ, দুর্ভাগ্য, অজ্ঞতা ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে।

পরোপকারের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে এবং এর সাথে মিল রেখে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের কর্তব্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অন্য সকল পুণ্য বাণীকে ছাড়িয়ে গেছে। তাঁর বাণীর গভীরতার সঠিক মূল্যায়ন করতে হলে স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধি ও গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা যখন ফ্যাসিস্ট, কমিউনিস্ট এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিসমূহকে নির্বিচারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে, তখন ইসলামের আইন-কানুন ও রসূলুল্লাহ্ (স)-এর আদেশ উপদেশের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কারণ এর মধ্যেই রয়েছে বিশ্ব সমস্যার সঠিক সমাধান। বিশেষ করে আজ যখন সমস্যা সমাধানের সঠিক পন্থা কি, তা নিয়ে মানুষের মধ্যে বিরাট মতভেদ দেখা দিয়েছে, তখন ইসলামের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে আরো বড় হয়ে।

প্রচার এবং জনমত সংগঠনের মাধ্যমে ইসলাম কিভাবে সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিল তা আমরা দেখেছি এবং একক ও সমষ্টিগত প্রচেষ্টাকে ধর্মের অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসেবে কিভাবে সত্য পথের যথার্থ পাথেয় অর্জনে কাজে লাগিয়েছিল, তা-ও আমরা জানি। বিশ্বাসীরা যদি ক্রমাগত চেষ্টার মাধ্যমে ঐক্য ও সমষ্টিগত মনোভাব গড়ে তুলে তা জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় নিয়ম হিসেবে গ্রহণ না করে, তাহলে ব্যক্তির 'বিশ্বাস' পূর্ণ হতে পারে না এবং তখন কোন জাতি তার কর্তব্য পালনে বা রাষ্ট্র তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে বিস্ময়ের কিছু থাকে না।

মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ সমস্যা 'দারিদ্র্যের' সমাধান ইসলাম কিভাবে করেছে তা পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

দারিদ্র্য যে মানুষকে অবজ্ঞা করার কারণ হতে পারে, ইসলাম তা মনে করে না। কারণ ইসলামের চোখে দরিদ্রতম ব্যক্তিও অর্থ ও ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতম হতে পারে। এই বিবেচনা গরীবদের প্রথমেই একটা বিরাট সান্ত্বনা দান

www.nagorikpathagar.org

করে। ইসলাম যখন দারিদ্র্যের কারণ অনুসন্ধানে লিপ্ত হয় তখন দেখতে পায় যে, আয় করার অক্ষমতা বা কাজ করার সুযোগের অভাবই এর প্রধান কারণ।

কোন লোক দুরারোগ্য ব্যাধিতে পঙ্গু হয়ে পড়লে তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব গোটা সমাজের বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। সমাজের পক্ষে এ কাজ স্বেচ্ছামূলক বা ইচ্ছাধীন নয়। তাদের মর্যাদা রক্ষা করে পরম করুণাময় আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "আর তাদের ধন-সম্পদে সাহায্যপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে।"[১৬]

যে ব্যক্তি উপযুক্ত সুযোগের অভাবে উপার্জন করতে পারে না, তার কাজের সুযোগ করে দেয়ার জন্য ইসলাম রাষ্ট্রকে বাধ্য করে। ইসলাম ভিক্ষাবৃত্তিকে নিরুৎসাহিত করে এবং মুসলমানদের এর ঊর্ধ্বে থাকার আহ্বান জানায়। কারণ গ্রহীতার চেয়ে আল্লাহ্ দাতাকে বেশি পছন্দ করেন। একবার রসূলুল্লাহ্ (স) এক ভিক্ষুককে জিজ্ঞেস করেন যে, তার কাছে এক দিরহাম মূল্যের কোন জিনিস আছে কি না। ভিক্ষুক হ্যাঁ-বোধক উত্তর দিলে তিনি উক্ত জিনিসটা বিক্রি করে তাকে একটা দড়ি ও একটা কুঠার কিনে দেন এবং নিজেই কুঠারের হাতলটা লাগিয়ে দেন। তিনি তখন ভিক্ষুককে আর কোনদিন ভিক্ষা করার মত অপমানের কাজ করতে নিষেধ করেন এবং কাঠ কেটে তা বিক্রি করে জীবিকা অর্জনের উপদেশ দেন।

ইসলামের নীতি হল কাজ করে জীবিকা অর্জন করা। ইসলাম কাজ করাকে আল্লাহ্র ইবাদতের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। যারা উপায়হীন তাদের কাজের সংস্থান করা এবং যারা অপারক তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত করে ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচার কায়েম করেছে।

সমাজের উঁচু স্তরের লোকদের বিলাসিতা কমিয়ে এবং নিম্নস্তরের লোকদের দুর্দশা লাঘব করে ইসলাম তার অনুসারীদের জীবনযাত্রার মানের বৈষম্য দূরীভূত করার চেষ্টা করে। এ কাজ করতে গিয়ে ইসলাম দুটো উপায় অবলম্বন করে ঃ বিবেক ও আইন। এর মধ্যে বিবেকই বেশি শক্তিশালী। সাহায্য পাওয়ার উপযুক্ত আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব ও গরীবকে যারা সাহায্য করে তারা অমরত্বের সুখে সুখী হয়।

বিবেকের কাছে ইসলামের আবেদন এত বেশি কার্যকর যে, কোন বিবেকসম্পন্ন মুসলমানই তার আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীকে অভুক্ত এবং বে-আবরু রেখে নিজে ভোগ-বিলাস বা আমোদ-আহ্লাদে কাটাতে পারে না। গরীব-দুঃখীকে সাহায্য করার জন্য ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে অল্পে তুষ্ট থাকতে এবং রসনাকে সংযত রাখতে বারবার নির্দেশ দিয়েছে। ইসলাম এমনও আদেশ জারি করেছে যে, মনিব ও চাকর একই পোশাক পরিধান করবে এবং একই খাবার খাবে।

www.nagorikpathagar.org

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিশ্বস্ত ও ধর্মপ্রাণ সাহাবী আবূ যর সম্পর্কে আল-মারুর-ইবনে সোয়াইদ একদা বলেন ঃ "আবূ যর এবং তাঁর ভৃত্যকে একই রকম পোশাক পরিহিত অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমি তাঁর কাছে এর কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-কে ঘোষণা করতে শুনেছেন, "তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ্ তোমাদের হেফাজতে তাদের রেখেছেন। যে ব্যক্তি তার ভাইকে হেফাজতে রেখেছে সে তাকে সেই জিনিসই খাওয়াবে যে জিনিস সে নিজে খায়, তাকে সেই পোশাকই পরিধান করাবে, যে পোশাক সে নিজে পরিধান করে। তাদের ওপর অত্যধিক কাজের বোঝা চাপিও না। যদি তা কর তবে তাকে সাহায্য কর।"

ইসলাম কেবল মানুষের বিবেককে জাগ্রত করেই ক্ষান্ত হয়নি। বরং মানুষের উদ্বৃত্ত সম্পদ কেড়ে নিয়ে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে তাদের প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করার জন্যও রাষ্ট্রের ওপর ক্ষমতা অর্পণ করেছে।

বস্তুতপক্ষে বিলাসিতা, সম্পদ[১৭] মওজুদ ও সুদ প্রথার বিরুদ্ধে ইসলাম প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "যারা সোনা-রূপা জমা করে কিন্তু আল্লাহ্র রাহে তা মোটেই খরচ করে না, তাদেরকে আপনি (হে মুহাম্মদ) যন্ত্রণাদায়ক আজাবের সংবাদ দিন। সেদিন দোযখের আগুনে সে সব গরম করে তাই দিয়ে তাদের কপাল, পাঁজর আর পিঠে দাগ দেয়া হবে। তোমরা যা কিছু নিজেদের জন্যই জমা করেছিলে—এ সব ত সেই জিনিস। অতএব তোমরা যা কিছু জমা করেছ, এক্ষণে তার স্বাদ চেখে নাও।"[১৮]

"যারা সুদ খায় তারা কিয়ামতের দিন ওঠবে—শয়তান কাউকে জাপটে ধরলে যেমন দিশাহারা হয়—ঠিক তেমন অবস্থায়।"[১৯]

"আল্লাহ্ সুদ বাতিল করেছেন আর সদকা বাড়িয়ে দিয়েছেন।"[২০]

দরিদ্রের জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন এবং ধনীর উদ্বৃত্ত আয় কমিয়ে সকলের জন্য সুখী ও সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করার উদ্দেশ্যে ইসলাম আয়ের উপর যাকাত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং সুদ হারাম করেছে। অত্যধিক ভোগ-বিলাস নিষিদ্ধ করে ইসলাম সকলের জন্য সমান সুখ-শান্তি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে সম্পদের সুষম বণ্টনের ব্যবস্থা করেছে। মজুদদারী নিষিদ্ধ করে সম্পদের বণ্টন এবং সুদ নিষিদ্ধ করে সম্পদের ওপর প্রত্যেকের অংশ নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ধন-সম্পদের অধিকারী হয়ে আনন্দ ও মর্যাদা লাভ না করে পরোপকার ও সৎ কাজ দ্বারা আনন্দ ও মর্যাদা লাভ করা উচিত। ধন-রত্নের ওপর নিরাপত্তার আস্থা না রেখে ইসলামী সমাজের সংহতির ওপর নিরাপত্তা খোঁজা উচিত। কারণ কাউকে অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান না করে এ কাজ তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে। সুদের ওপর স্বীয় নিরাপত্তার আশ্রয় না খুঁজে অন্যকে নিজের আয়ের অংশীদার করে আনন্দ লাভ করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

জাগ্রত বিবেক ও আইনের মাধ্যমে দারিদ্র্যরূপ ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে ইসলাম কাজকে তার বুনিয়াদ বা ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে। কাজের পুরস্কার ইসলাম শুধু মানুষের ইহলোকেই সীমাবদ্ধ রাখেনি বরং পরলোকেও তাকে পুরস্কৃত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। ইসলাম আরও ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বাসীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করা উচিত এবং প্রত্যেককেই ইবাদতের জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত।

সদাচারের মাধ্যমে ইসলাম দারিদ্র্য দূর করতে চায়। পাপ ও অন্যায়ের অশুভ শক্তিকে ইসলাম আইন ও যুক্তির মাধ্যমে দমন করতে চায়। অন্যায় ও পাপকে ধ্বংস করার জন্য পুণ্য ও মহানুভবতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যদি ইসলামী বিধানসমূহ আরও ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো যেত, তাহলে ইসলামী পরিবারের প্রত্যেকটি সদস্যই তার কর্তব্য অনুধাবন করতে পারত এবং তার আকাঙ্ক্ষাও সীমাহীন হত না। দারিদ্র্য প্রতিরোধের জন্য তা একটা মস্তবড় অস্ত্র হয়ে দাঁড়াত। কারণ দারিদ্র্যের সবচেয়ে বড় কারণ হল ধনলিপ্সা, পাপাচার (যেমন– অধিক পরিমাণ মদ ও মাদক জাতীয় দ্রব্য ব্যবহার), স্বাস্থ্যের প্রতি উদাসীন ও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন। ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার অর্থ হচ্ছে শরীর ও মনকে সঠিক পথে চালনা করা। আমরা যদি ইসলামী রীতি অনুযায়ী দয়া ও দানশীলতার অনুশীলন করতাম এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে কাজ করে জাতির মধ্যে ধর্মীয় বিবেককে জাগ্রত করে তুলতে পারতাম, তাহলে দারিদ্র্যকে আমরা মারাত্মক আঘাত হানতে পারতাম। ফলে তা আর কোনদিন কোন গৃহেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারত না।

বেকার সমস্যা সমাধান করে রাষ্ট্র দারিদ্র্য দূর করতে পারে। এ কাজে ইসলামী সংহতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে রাষ্ট্রকে নীতি-নির্ধারণ করতে হবে। এ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ "বিশ্বাসিগণ একে অপরের জন্য একটা অবয়বের অংশস্বরূপ। এর একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্র অক্ষমদের মধ্যে ভিক্ষা বিতরণ করতে পারে, সক্ষমদের জন্য কাজের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে। এমনকি সক্ষম ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাজ সম্পন্ন করার জন্য বাধ্য করতে পারে।

ইসলাম রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা অর্পণ করেছে। জনকল্যাণ ও আইনের অভিভাবক হিসেবে তিনি ইসলামের মৌলিক নীতি ও শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

সামাজিক ব্যাধি, বিশেষ করে দারিদ্র্য প্রতিরোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর নীতি তথা সাম্যের নীতিকে ইসলাম সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলমানদের বিবেকের

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে ইসলাম এ নীতি এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে যেন তার প্রার্থনা এবং সামাজিক আচরণ এই নীতির দ্বারাই পরিচালিত হয়।

গর্ববোধ না করার জন্য এবং নিজেকে সঙ্গীদের চেয়ে বড় মনে না করার জন্য মুহাম্মদ (স) মানুষকে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তার জন্য সমগ্র বিশ্ব তাঁর কাছে ঋণী। ভৃত্যের মনিব হয়েও ধর্মপরায়ণ মুসলমান কখনও মনে করেন না যে, তিনি তাঁর ভৃত্যের চেয়ে বেশি উপযুক্ত। সত্য গ্রহণেচ্ছু একজন গরীব ও দুর্বল লোককে উপেক্ষা করে একদল আরব সর্দারকে ইসলামে দীক্ষিত করে তাদের অনুসারীদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করায় পবিত্র কুরআনে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে ভর্ৎসনা করা হয়েছে। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ "তিনি বিরক্ত হলেন, তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন! তাঁর কাছে একটি অন্ধ লোক এলো, তাতে ! আপনি কি জানেন ঃ সে হয়ত শুধরে নেবে, পবিত্র হবে। আপনি যদি ভাবতেন, তাহলে তাকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা পেলেই তার উপকার হত। কিন্তু যে লোক পরোয়া করে না, তার দিকে আপনি মনোযোগ দিচ্ছেন। অথচ সে যদি পবিত্র না হয়, তবে তাতে আপনার ওপর দোষারোপ হবে না। আর যে লোক আপনার কাছে দৌড়ে এলো, আর আল্লাহ্‌কে সে ভয় করে, তার সাথে অবহেলা করেছেন।"[২১]

বর্তমান প্রচলিত বিধানে দরিদ্রদের জন্য যে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়, মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে তাদের প্রতি দরদ এর চেয়ে অনেক বেশি। ইসলামী বিধান যাকাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত কি, কিভাবে দিতে হবে, কাকে দিতে হবে, তাদের কর্তব্য ও অধিকার কি তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছে। সাধারণভাবে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাণী মুসলমানদের সংযত হতে এবং অপরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে আহ্বান জানিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন। কোনও কওমের পুরুষদের উচিত নয় অন্য কোনও কওমের পুরুষদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা। হয়ত তারাই ওদের চাইতে উত্তম হবে—এ বিচিত্র নয়। আর মেয়েদেরও উচিত নয় অন্য মেয়েদের নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা। হয়ত তারাই ওদের চাইতে উত্তম হবে—এটাও মোটেই অসম্ভব নয়। আর তোমরা একে অন্যের ওপরে দোষারোপ করো না মোটেই, আর একে অন্যকে বিকৃত নামে ডেকো না। ঈমান আনার পর গোনাহের নাম-গন্ধ বড়ই জঘন্য ব্যাপার।"[২২]

এই মনোভাব যদি রাজা, যুবরাজ, শাসক, গরীব এবং ধনী, মালিক ও শ্রমিক এবং সাধারণ লোকের মনে ঠিকমত ঢোকানো যেত, তাহলে আর সামাজিক বৈষম্য থাকত না। হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি সামাজিক ব্যাধি দূর হত, যে ঘৃণা ও মন কষাকষির জন্য যুদ্ধ ও সংঘাত বাধে তাও থাকত না। সবল দুর্বলের ওপর অত্যাচার করত না, আর দুর্বলেরাও শক্তি সঞ্চয় করে সবলদের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের কথা ভাবত না।

www.nagorikpathagar.org

এ কথা সত্য যে, ইউরোপ ও আমেরিকার প্রচলিত আইনেও সাম্যের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তা দ্বন্দ্ব, যুদ্ধ ও দুর্নীতি দমন করতে ব্যর্থ হয়েছে। বর্তমান সাম্যের যুগে অহমিকা ও বস্তুবাদ যতটা আকাশচুম্বী হয়ে উঠেছে, পূর্বে তা কখনও হয়নি। আবার কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা আজকের দিনে যতটা নগ্নরূপ ধারণ করেছে সামন্ত যুগেও ততটা ছিল না। তথাকথিত সামাজিক অধিকারের বিকৃতি সত্ত্বেও গত এক শতাব্দীর মধ্যে ঘৃণা ও ঈর্ষার মনোভাব যতটুকু প্রসার লাভ করেছে, তার আগে এমনটা ছিল না। বর্তমান জগতে যত দল, উপদল, সংঘ ও পেশাদার সংস্থা গড়ে উঠেছে, আগে তা ছিল না। এরা শুধু অধিকারের দাবিতে সোচ্চার, কিন্তু কর্তব্যের কথা ঘুণাক্ষরেও স্মরণ করে না।

মুহাম্মদ (স) যখন সাম্যকে একটা অধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন অধিকারকে তিনি কর্তব্য ও বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বেঁধে দেন এবং এই তিনটা জিনিস তিনি বিশ্বাসীদের অন্তরে একই সাথে প্রতিষ্ঠা করেন। এগুলো বিবেককে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে বিশ্বাসীর পক্ষে মুনাফিকী করা সম্ভব হয় না। পবিত্র কুরআনে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, "নিশ্চয়ই মুনাফিকেরা দোযখের একেবারে নীচের ভাগেই থাকবে।"২৩

ইসলামের সামাজিক নীতি কোন তর্কসাপেক্ষ মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় বা এমন কোন শক্তির ভারসাম্যের ওপর নির্ভরশীল নয় যা বাতিল হলে সামাজিক নীতিও বদলে যাবে। এ সামাজিক নীতির ভিত্তি হচ্ছে মুসলমানদের মধ্যকার সংহতি ও যৌথভাবে টিকে থাকার ইচ্ছার ওপর এবং জাতি ও ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতার ওপর। ইসলামের মূল শিক্ষা হল আল্লাহ্‌কে খুশী করার জন্য সকলের প্রতি শুভেচ্ছার সম্প্রসারণ।

মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত সামাজিক নীতিতে ব্যক্তি ও সমষ্টির বিবেক রাষ্ট্রের কর্ণধারের বিবেকের সাথে এক সাথে সক্রিয় করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে এবং তা অধিকার রক্ষার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইসলাম জাতির বা কোন মুসলমানের স্বার্থ বিরোধী যে কোন কাজের তীব্র বিরোধিতা করে। যখন কোন কাজ সদিচ্ছার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়, কেবলমাত্র তখনই ইসলামী নীতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কতন্ত্র বা গণতন্ত্র ইত্যাদি সরকারের প্রকারভেদ নিয়ে মুসলমানরা বেশি মাথা ঘামায় না। মুসলমানরা যা নিয়ে মাথা ঘামায় তা হল— সরকারের উদ্দেশ্য সমাজকল্যাণমূলক হওয়া চাই, যেন সমাজের প্রত্যেক সদস্য সাম্যের ভিত্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যকার পার্থক্য

www.nagorikpathagar.org

নির্দেশিত হয় সদাচার ও শান্তিপ্রিয়তার ভিত্তিতে। জনকল্যাণ যদি উদ্দেশ্য না হয় তাহলে এসব ব্যাপারে ব্যক্তি বা জাতির কোনই উপযোগিতা থাকে না।

যে সাম্যবাদ হঠকারিতা ও বস্তুবাদ ঠেকাতে বা শ্রেণী-সংগ্রাম ও জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ থামাতে অপারক, সেই সাম্যবাদ সত্যহীন একটা মায়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? ইসলাম সত্যের সন্ধান করে—মায়ার নয়। "আল্লাহ্ তোমাদের অন্তর দেখেন, মুখ দেখেন না।"

সুতরাং এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, ইসলামী সংজ্ঞায় সাম্যের নীতিতে পরোপকার একটা প্রধান স্তম্ভ এবং দারিদ্র্য নিরসনের একটা প্রধান হাতিয়ার। মানুষকে পরার্থপরতায় ব্রতী হওয়ার জন্য ইসলাম প্রেরণা প্রদান থেকে শুরু করে আইন ও রাষ্ট্রক্ষমতাসহ সব রকমের পন্থাই অবলম্বন করে।

"আল্লাহ্ সুদ বাতিল করেছেন, আর সদকা বাড়িয়ে দিয়েছেন।"[২৪]

"পরম সাফল্যে তোমরা পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজেদের প্রিয়তম বস্তু খরচ করবে।"[২৫]

"আপনি তাকে দেখেছেন কি, যে দীনকে মিথ্যা জানে ? সে-ই ত য়াতীমদেরকে তাড়িয়ে দেয় আর অসহায় মিসকীনদেরকে অন্নদান করতেও উৎসাহ দেয় না।"[২৬]

"না, তা ঠিক নয়। বরং তোমরাই ত য়াতীম অনাথদেরকে সম্মান সমাদর কর না। আর গরীব দুস্থদেরকে খাবার দিতেও উৎসাহ দাও না।"[২৭]

ইহজগত যে পরজগতে প্রবেশ করার একটা সিঁড়ি মাত্র—এ সত্যটা এবং আল্লাহ্র পথে চলার বহু সৎ কাজের নমুনা পবিত্র কুরআন ও রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনে অতি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেয়েছে। গরীব, দুঃখী, অবহেলিত ও পদদলিত মানবতার সেবায় রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করেন। তাদের সাহায্য করা একটা অর্পিত দায়িত্ব যা এড়ানো যায় না। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মৃত্যুর পর আরবরা যাকাত দিতে অস্বীকার করে। ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা)-কে এ ব্যাপারে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ না করতে উপদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি ঘোষণা করেন ঃ "আল্লাহ্ আমার সাক্ষী। এমন কি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট তারা যে উট বাঁধার দড়ি অর্পণ করত, তা যদি আমার কাছে অর্পণ না করে, তবে আমি তাদের বিরুদ্ধে এর জন্য যুদ্ধ করব।" অন্য কথায়, কোন গরীবের অধিকার অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে তিনি তাঁর সমগ্র বাহিনীকে যুদ্ধ করার আদেশ প্রদান করবেন, যদিও তার মূল্য উট বাঁধার দড়ির মূল্যের চেয়ে কম হয়।

পরোপকার এবং সৎকাজ করার জন্য ইসলাম যে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল, তারই পরিণতি হিসেবে বদান্যতার প্রকাশস্বরূপ ওয়াক্ফ তথা ধর্মীয় দানের সৃষ্টি।

www.nagorikpathagar.org

পরোপকারে আত্মা নির্মল হয়। বিড়াল, কুকুর ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুসলমানরা তাদের সম্পত্তির একাংশ রেখে দেয়। নূরুদ্দীন মাহমুদ[২৮] দামেশকে তাঁর সম্পত্তির একাংশ বুড়ো প্রাণীগুলোকে তাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আশ্রয় দেওয়ার জন্য দান করে যান।

হতভাগ্য ও পথিকদের প্রতি দয়া-দাক্ষিণ্য প্রদর্শনের ঘটনায় মুসলিম ইতিহাস ভরপুর। এ ধরনের দয়া পরিবার, গোত্র ও জাতির গর্ব-স্বরূপ এবং এসব হল ইসলাম ধর্মের পরার্থপরতা ও সৎকাজজনিত মনোভাবেরই বহিঃপ্রকাশ।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অনুসারে পরোপকার এবং যাকাত কেবল মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় ; এটা সার্বজনীন—বিশ্বের সমস্ত নির্যাতিত মানুষেরই এটা প্রাপ্য।

"আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে তোমাদের সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে বারণ করেন নি, যারা তোমাদের সাথে দীন ইসলাম নিয়ে লড়াই ঝগড়া করেন নি, আর তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেন নি। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।"[২৯]

"সদকাসমূহ গরীব, মিসকীন ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী, আর যাদেরকে সন্তুষ্ট করা আবশ্যক, গোলাম ব্যক্তিকে মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের দায়মুক্ত করা, আল্লাহ্র রাহে জিহাদের কাজে আর বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্য—এ হচ্ছে আল্লাহ্র বিধান।"[৩০]

বর্তমান যুগে পরোপকার বা দানশীলতা কার্যকরী করতে হলে রসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। কারণ এ নীতি ও পদ্ধতি ফলপ্রসূ এবং দীর্ঘস্থায়ী। আমাদের যুগে আয়ের উৎস এবং জনগণের ভাগ্য পর্যালোচনা করে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যদি জনকল্যাণের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করি ও আল্লাহ্কে খুশী করতে সচেষ্ট হই, তাহলে আমাদের উদ্দেশ্যও সফল হবে। কোন মুসলমানের আয়ের একাংশ গরীবদের প্রাপ্য বলে ইসলামের ধর্মীয় আইনে বিধান থাকলেও মুসলমানরা প্রয়োজনবোধে তার বেশি দান করতে দ্বিধাবোধ করে না। এ মনোভাব নিয়েই খলীফা হযরত আবূ বকর ও হযরত ওমর তাঁদের সম্পত্তি বিলিয়ে দেন—একজন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি এবং অপরজন তাঁর সম্পত্তির অর্ধেক।

সুতরাং মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কেবল যাকাত নিয়েই মুসলমানরা তাদের সম্পত্তির ওপর দাবি প্রতিষ্ঠা করে রেহাই পেয়েছে বলে মনে করলে চলবে না। যতদিন পর্যন্ত পরোপকার ও বদান্যতার প্রয়োজন থাকবে, ততদিন তাদের তা মেটাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

সুতরাং সামাজিক নিরাপত্তা ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে এবং শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটাতে আমাদের ইসলামের ধর্মীয় আইন থেকে অনুপ্রেরণা ও পথনির্দেশ গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে দানশীলতা বা পরোপকার সুপ্রতিষ্ঠা করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "সুতরাং যার এক কণা পরিমাণ নেকী থাকবে, সে তা নিজেই দেখতে পাবে। আর যে কেউ তিল পরিমাণ অপকর্ম করেছে, সেও তা দেখে নেবে।"৩১

ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা

আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা এমন দুটো মৌলিক নীতি আলোচনা করব যা সমাজকে সুরক্ষিত করে ও মানুষের জীবনকে জনকল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এই নীতি দুটো হলো স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার।

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে মানুষ হয় গোত্রীয় আইন অনুসারে জীবন যাপন করত, যেমন আরব দেশে, আর না হয় রাজা বা রাষ্ট্রের প্রজা হিসেবে বসবাস করত, যেমন—রোম-পারস্য ও ইথিওপিয়ায়। অবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক দেশেই তার নিজস্ব আইন-কানুন ও বিধি-নিষেধ প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব দেশে প্রচলিত আইনসমূহ সার্বজনীন বা মানবিক নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না থাকায় তার কার্যকারিতা নিশ্চিত ছিল না।

আরব দেশে প্রচলিত ছিল বলপ্রয়োগের নীতি। স্বার্থপরতা ও অহমিকাকে প্রশংসা করা হত। খুন-জখম ও লুটতরাজ করতে তারা গৌরব বোধ করত এবং তাদের অনেকে অন্যের অধিকার পদদলিত করে তাদের ধন-সম্পত্তি ছিনিয়ে নিতে গর্ববোধ করত। সাম্যের নীতিতে তারা অন্য আরব গোত্রকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা থেকে শুধু বিরতই থাকত না ; মানবিক, জাতীয় ও গোত্রীয় ভ্রাতৃত্বকেও তারা প্রত্যাখ্যান করত। বলপ্রয়োগের ভিত্তিতে বিচার করা না হলে তারা সেই বিচারকে উপহাস করত। তারা সর্বাত্মক স্বাধীনতা কামনা করত এবং এ স্বাধীনতায় আর কারও অংশ ছিল না।

আরবদের প্রতিবেশী পারস্যবাসী, রোমান ও পরবর্তীকালে বাইজেন্টাইনরা আরবদের ঘৃণা করত। সাম্যের নীতিতে তাদের কোনো অধিকার আছে—এটা তারা স্বীকার করত না বা তাদের বিচার ব্যবস্থার ধারণাকেও সম্মান দেখাত না। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সময় পার্শীদের সকল ক্ষমতা তাদের রাজা দ্বিতীয় খসরুর (৫৯০-৬২৮ খৃস্টাব্দ) হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। রাজা তাঁর পরিষদের হাতে সামান্য ক্ষমতা দিতেন এবং ইচ্ছামত তা কেড়ে নিতেন। দেশের সম্পদের উন্নয়ন ছিল তাঁর ইচ্ছাধীন। তিনি সব সময়ই পার্শ্বচর, যুবরাজ ও সেনাপতিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতেন। রাজার

www.nagorikpathagar.org

সিংহাসনের নিরাপত্তা বিধান করে কিছু কিছু ক্ষমতা উপভোগ করলেও তারা নিরাপদে ছিল না। কারণ যে কোন মুহূর্তে খসরু তাদের পুত্র-কন্যা, ধন-সম্পত্তি কেড়ে নিতে পারতেন। এমন কি তাদের জীবন পর্যন্ত। আশ্চর্য যে, পারস্য সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্থায়ী হয়েছিল। কারণ সাসানীয়রা[৩২] চারশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিল। কিন্তু ন্যায়বিচার, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়ে এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল সামরিক শক্তি ও স্বেচ্ছাচারিতার ওপর।

বাইজেন্টাইনরাও একইভাবে এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজত্ব করেছে। এদের মানসিকতাও ছিল স্টিফেনবাসীদের[৩৩] ন্যায়। পাশ্চাত্যের সম্রাট ছিল সিজারেরা, অবশ্য তাদের কথা অনুযায়ী তারা ছিল সমগ্র বিশ্বের সম্রাট। প্রাচ্যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল খসরুরা। পারস্য সাম্রাজ্যে যেমন জরথুস্ত্রীয়বাদের প্রভাব দেখা দেয়, তেমনি বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যেও খৃষ্ট ধর্মের প্রভাব পড়েছিল। বাইজেন্টাইনের খৃস্টধর্ম তথাকার খৃস্টানদের প্রতিও কোন সম্মান দেখায়নি। যীশু কর্তৃক প্রচারিত ভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও দয়ার বাণী তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেনি। বাইজেন্টাইন শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি এতই সংকীর্ণ ছিল যে, তারা অন্য কোন রাষ্ট্রের স্বাধীন অস্তিত্বের অধিকার স্বীকার করত না। তাদের মতে, তাদের আদেশই ছিল সমগ্র বিশ্বের ওপর প্রযোজ্য। জনগণকে এ আদেশ স্বীকার করতে হত অথবা 'মূর্খরা জানে না যে তারা আকাশের অধীন'—এ অপবাদ মেনে নিতে হত।

নবম শতাব্দীতে শার্লিমেনের জনৈক দূত বাইজেন্টাইন সম্রাটকে অবগত করান যে, তার প্রভু চিরশত্রু বর্বর সেক্সনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। সম্রাট তখন দূতকে বাধা দিয়ে বলেন ঃ "এই বর্বরেরা কারা, যাদের সম্পর্কে আমি কখনো কিছু শুনিনি। এরা মোটেই তেমন শক্তিশালী নয়, যাতে তোমার সম্রাটের কোন ক্ষতি হতে পারে। আমি সেক্সনদের নির্মূল করার অধিকার তোমার হাতে সমর্পণ করলাম ; এবং ধরে নাও তোমার সম্রাট এদের হাত থেকে মুক্ত।" দূত ফিরে গিয়ে শার্লিমেনের নিকট সম্রাটের বক্তব্য পেশ করলে তিনি মন্তব্য করেন ঃ তিনি যদি সেক্সনদের নির্মূল করার অধিকার না দিয়ে তোমাকে একজোড়া জুতাও দান করতেন, তাহলে তোমার এই দীর্ঘ ও কষ্টপূর্ণ সফরে তা অনেকটা উপকারে আসত!

সিজার, খসরু ও আরব গোত্রের ধারণায় এ-ই ছিল তখনকার দুনিয়া। এখানে মুহাম্মদ (স) আরব ভূমিতে আবির্ভূত হয়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, তিনি একজন আদম সন্তান এবং আদম মাটির তৈরি। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ "শোন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন

www.nagorikpathagar.org

নারী থেকে পয়দা করেছি। আমি তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী-গোত্র ও পরিবার হিসেবে বানিয়েছি, যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহিযগার।"৩৪

বিশ্বের অবস্থা যখন এরকম ছিল তখন মুহাম্মদ (স)-এর শিষ্য হযরত ওমর (রা) সিজার ও খসরুদের রাজ্য দখল করেন। গভর্নর আমরের পুত্র জনৈক খৃস্টানের ওপর নিয়মবিরুদ্ধভাবে অত্যাচার করলে ওমর (রা) কঠোর ভাষায় গভর্নরকে ভর্ৎসনা করে বলেন ঃ 'হে আমর, যে মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে, তাকে কি তুমি দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতে চাও ?'

তৎকালীন বিশ্বে মুহাম্মদ (স)-এর ন্যায়বিচার, সাম্য ও স্বাধীনতার আবেদন ছিল নতুন। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর অধিকার ও কর্তব্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে ইসলামী বিধান সে যুগের স্বাধীনতা ও সত্যের পতাকা সমুন্নত করেছিল। এ শিক্ষার আলোকে দুর্বলেরা যখন মাথা উঁচু করে দাঁড়াল, তখন তাদের ওপর যারা অত্যাচার করত তারা উপহাস করা শুরু করল। তাদের পূর্বপুরুষরা একদা যে কথা বলত, সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে যে, "আমাদের মধ্যে যারা নগণ্য, তারাই ত তোমাকে মেনে চলছে, তাও আবার না বুঝেই।"৩৫ লোভ, অহমিকা, অত্যাচার ও অবিচারের বিশ্বকে ধ্বংস করে তথায় সত্য ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করাই যে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ছিল, তখন তারা বুঝতে পারেনি। ইসলামের ধর্মীয় আইন হলো এমন কিতপয় স্পষ্ট ও মহান নীতি যার দ্বারা মানুষের আচার-ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত হয়। এই নীতিগুলো আল্লাহ্ এমন একজন পবিত্র লোকের মারফত পৃথিবীতে পাঠান যার নাম মানুষের দীর্ঘ ইতিহাসে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি হলেন হযরত মুহাম্মদ (স)। এই নীতিগুলো দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে যে, ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা বিশ্বাসীদের ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ।

বিশ্বাসের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে এই নীতিগুলো ইসলাম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। ফলে এসব নীতি নিছক খামখেয়ালী, প্রতারণা, ভান, বিকৃত ও যাবতীয় ঘৃণ্য প্রচারণা থেকে মুক্ত।

কোন মুসলমান যদি সন্দেহ পোষণ করে যে, গরীব ও পঙ্গুদের তার মত সমান অধিকার নেই, তাহলে সে সত্যিকারের মুসলমান নয়। কারণ ইহকাল ও পরকালে তারা সবাই আল্লাহ্‌র ভৃত্য এবং তাদের মধ্যে তিনিই মহান যিনি বেশি পরহিযগার বা যাঁর স্বভাব ভাল। গরীবকে ভিক্ষা দেওয়া ইসলামের ন্যায়বিচার অনুযায়ী ধনীদের কর্তব্য—এটা নিছক কোন অনুকম্পা নয়।

মুসলিম শাসনের প্রথম যুগে যখন ঈমানদারী মানুষের মনকে পরিচালিত করত, তখন ন্যায়বিচার ও সাম্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠা পেত। এমন বিশ্বাস অন্তরে নিয়েই ইসলামের

www.nagorikpathagar.org

প্রথম খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) খলীফা পদে নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই একজন সাধারণ মানুষের মত নিজে বাজারে গিয়ে তাঁর নিজের ও পরিবারের জীবিকা অর্জনের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনাটা আলোচনার বিষয়ে পরিণত হলো এবং মুসলমানরা এ ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে খলীফাকে তাদের মাইনে করা কর্মচারী হিসেবে সাব্যস্ত করে নিল। তারা তাঁকে জীবিকা অর্জনের নিমিত্ত কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করে তাঁর নিজের ও পরিবারের প্রয়োজনীয় ভরণ-পোষণের জন্য কয়েক দিরহাম মাইনে দেয়ার ব্যবস্থা করল। এতে কিন্তু জনগণের সাথে খলীফার চালচলন ও জীবন যাত্রার মানের কোন পার্থক্য সূচিত হয়নি।

ইসলামের গৌরবময় দিনে হযরত ওমর (রা) হযরত আবূ বকর (রা)-এর স্থলাভিষিক্ত হন। জনগণের নির্বাচিত খলীফা হিসেবে তিনি ইসলামের কর্তৃত্ব আরও সুদৃঢ় করেন। তিনি পার্শিয়ান ও বাইজেন্টাইনদের পরাজিত করেন এবং তিনিই নিজ হাতে জামা ও জুতায় তালি লাগিয়ে তা পরিধান করতেন। একথা তাঁর বা অন্য কোন মুসলমানের কোনদিনই মনে হয়নি যে, খিলাফতের ক্ষমতা ব্যতীত তাঁর ও জনসাধারণের মধ্যে আর কোন পার্থক্য থাকতে পারে। খলীফার পদ ও আইনের রক্ষক হিসেবে তিনি কেবল জনসাধারণের আনুগত্য এবং বশ্যতার দাবিদার ছিলেন, তার বেশি কিছু নয়।

ইসলামের ন্যায়বিচার এবং সাম্য এমন একটা গভীর বিশ্বাসের সৃষ্টি করেছিল যে, মুসলমানরা তা আগ্রহের সাথে গ্রহণ করেছিল এবং গভীর নিষ্ঠার সাথে পালনও করেছিল। বস্তুত এ বিষয় দুটি ছিল এমন এক অপার্থিব বাস্তব, যা ন্যায়ভিত্তিক ও স্থায়ী সমাজ গঠনে প্রকাশ্য ও গোপনে কার্যকর ছিল।

শরীয়ত বা ইসলামী আইন স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সকল বিশ্বাসীকেই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। তারা সকলেই সম-অধিকারের দাবিদার এবং তাদের এ দাবি অগ্রাহ্য করা যায় না। সুতরাং শরীয়ত অনুযায়ী প্রত্যেক বিশ্বাসীই পরোপকার, সাহায্য, আশ্রয়, উত্তরাধিকার, দেশপ্রেম ও পরামর্শ পাওয়ার অধিকারী। শাসনকর্তা উপস্থিত থাকুক বা না থাকুক, আইন কার্যকর থাকুক বা না থাকুক, তিনি ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারী। কারণ তাঁর বিশ্বাসের ফলস্বরূপ বিবেক থেকে উৎসারিত অধিকার থেকেই তিনি তার দাবিদার। এ ধরনের ন্যায়বিচার সমাজ থেকে কুসংস্কার ও গোঁড়ামি দূর করে সাম্যকে সব কিছুর ঊর্ধে স্থান দেয়। কারণ মুসলমানরা তাদের প্রাপ্য স্থানে তা সব সময়েই পেয়ে থাকে।

ইসলামের নিম্নোক্ত ঘোষণায় আধুনিক ন্যায়বিচারের সমস্ত নিয়ম ম্লান হয়ে পড়েছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

"আল্লাহ্ ন্যায়বিচার কায়েম করতে ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দানের জন্য আদেশ দিয়েছেন।"[৩৬]

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন ! তোমরা সবাই ন্যায়বিচারের ওপরেই কায়েম থেকো—আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে। যদিও তা তোমাদের নিজেদের কিংবা মা-বাপের কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়।"[৩৭]

"আর কোনও কওমের সাথে শত্রুতার কারণে ন্যায়বিচার বর্জন করো না। তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। কারণ তা তাকওয়ার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ।"[৩৮]

ইসলাম আদেশ করে ঃ "... লোকদের মধ্যে মিটমাট করার সময়ে ন্যায়বিচার মুতাবিক ফয়সালা করবে।"[৩৯]

"যখন তোমরা কথা দাও তখন ন্যায়বিচার কায়েম রাখবে। তা যদি স্বজনের বিরুদ্ধেও যায় ...।"[৪০]

ন্যায়বিচারকে সমগ্র বিশ্বের বিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে ইসলাম ঘোষণা করেছে ঃ তিনিই ত আসমানকে উঁচুতে তুলে রেখেছেন। আর তিনিই তুলাদণ্ড স্থির করে দিয়েছেন। যেন তোমরা ওজনের ব্যাপারে কম-বেশি না কর। তোমরা সঠিক ওজন কায়েম কর—ন্যায়নীতি মুতাবিক। মাপে কিছুমাত্র ঘাটতি করো না।"[৪১]

ন্যায়বিচারকে ইসলাম সবার ওপর স্থান দিয়েছে। মুসলমান, নাস্তিক, শত্রু-মিত্র সবাই সমান বিচার পাওয়ার অধিকারী। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে তারা সবাই সমান এবং ন্যায়বিচারের দৃষ্টিতে তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আর কোন কওমের সাথে শত্রুতার কারণে ন্যায়বিচার বর্জন করো না। তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। কারণ তা তাক্ওয়ার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ।"

এদিক থেকে ইসলামের শরীয়ত বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। কারণ আধুনিক সভ্যতার উন্নয়নের ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অনেক দিক থেকেই অগ্রগামী।

ইমাম ইবনুল কায়্যিম[৪২] বলেন, "আল্লাহ্ (যিনি সমস্ত প্রশংসা ও সম্মানের অধিকারী) এজন্যই তাঁর দূতগণকে প্রেরণ করেন এবং গ্রন্থ[৪৩] নাযিল করেন যেন মানুষ বুঝতে পারে যে, আসমান ও যমীন ন্যায়ের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেখানে ন্যায়বিচারের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হবে এবং ন্যায়বিচার যে কোনভাবেই হোক আত্মপ্রকাশ করবে, সেখানেই আল্লাহ্‌র আইন ও ধর্ম পূর্ণত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ ধর্মীয় আইন ও নীতিসমূহ ন্যায়বিচারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। ইমাম আল-শাতিবি বলেন, "শরীয়তের আইন শুধু জনগণের কল্যাণের জন্যই জারি করা হয়েছে—এ জনকল্যাণ যে কোন ক্ষেত্রেই হোক না কেন।"

www.nagorikpathagar.org

ইসলামের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শরীয়তের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ন্যায়বিচার। কারণ সব কিছুর উর্ধে শরীয়তের বিধান আল্লাহ্‌র নির্দেশিত ন্যায়বিচারের সাথে সংযুক্ত।

ইসলামে স্বাধীনতা একটি অতি পবিত্র অধিকার। ইসলাম রাজনৈতিক স্বাধীনতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং সামাজিক স্বাধীনতার এমনভাবে নিশ্চয়তা দান করেছে এবং তা এত প্রগতিশীল যে, আধুনিক সভ্যতা তা থেকে এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে।

ইসলামের ইতিহাসে স্বৈরতন্ত্র শাসন ব্যবস্থায়ও খলীফা ও বাদশাহ্‌র দরবারে এ ধরনের স্বাধীনতার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের[৪৪] সময় জনগণ তাঁর উপস্থিতিতেই খিলাফতে তাঁর এবং তাঁর পরিবারের শাসন করার অধিকার সম্পর্কীয় প্রশ্ন উত্থাপন করেছিল। আল-মামুনের[৪৫] দরবারেও অনুরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। কবি দিবিল ইবনে আলী আল-খুজায়ী আব্বাসীয় খলীফাদের চরম উন্নতির যুগেও কতিপয় আব্বাসীয় খলীফার বিরুদ্ধে একের পর এক ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন এবং একই সঙ্গে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী আলীর বংশধর ও তাদের সমর্থকদের[৪৬] সমর্থন করেন। কিন্তু তার জন্য তাঁকে কোন দুর্ভোগ পোহাতে হয়নি বা তাঁর স্বাধীনতাও খর্ব করা হয়নি।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী প্রচারিত হওয়ার পর আরবরা তাদের স্বর্ণময় দিনগুলোতে বিশেষ করে তাদের দেশ জয়ের দিনগুলোতে সাফল্য লাভ করেছিল এজন্য যে, ইসলাম স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছিল। মুসলমানরা স্বাধীনতাকে শ্রদ্ধা করত বলেই তারা সুদূর প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে এবং চীন থেকে স্পেন পর্যন্ত তাদের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। স্বাধীনতা ও বিশ্বাসের নিরাপত্তা বিধান এবং জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রার্থনার স্থানগুলোর পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করতে মুসলমানরা আদিষ্ট হয়েছিল। তাই তারা তাদের সাথে চুক্তি সম্পাদনকারীদের এবং নিজ রাজ্যের ভিন্নধর্মী প্রজাদেরও অধিকার প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

মুসলমানরা পুরোপুরিভাবে স্বাধীনতার অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছিল। বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যাপৃত কোন ভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তি নিজস্ব কোন তত্ত্ব প্রচার করলেও বা বিশেষ কোন মতের দাবি উত্থাপন করলেও তারা তার ওপর কোন অত্যাচার করেনি। সাবেইন,[৪৭] ম্যাজিসিয়ানস,[৪৮] খৃস্টান ও য়াহূদীদের বিদ্যা শিক্ষার পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং তাদের ধর্ম পালনের অধিকার ছিল অক্ষুণ্ন। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা নিজেরাও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করত এবং এ ব্যাপারে শরীয়ত আইনে কোন বাধা-নিষেধ আরোপিত ছিল না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি-স্বরূপ

www.nagorikpathagar.org

গোলমাল, হাঙ্গামা ও অশান্তি রোধ করার জন্যই কেবল ইসলামী রাষ্ট্রে মতামত প্রকাশ ও বিশ্বাসের স্বাধীনতার ওপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হত বলে জানা যায়।

তাদের শাসন ব্যবস্থার ওপর সরাসরি এবং তাৎক্ষণিক প্রভাব না পড়লে সামগ্রিকভাবে ইসলামের শাসনকর্তা ও বাদশাহগণ নীতিগতভাবে কোন মতাদর্শ, বিশ্বাস ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার কাজে হস্তক্ষেপ করতেন না। মধ্যযুগে মুসলিম ও অমুসলিমরা একত্রে শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মীয় চর্চার ব্যাপারে এমন স্বাধীন মতামত প্রকাশ করত যে, বর্তমান কালেও কোন রাষ্ট্রে তেমন স্বাধীনতা বিরল।

একটা সুস্থ সমাজের জন্য ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। ইসলাম মানুষের বিবেকের মধ্যে এ বিশ্বাস প্রোথিত করেছে কর্তৃত্বের সাথেই এবং সেই ন্যায়বিচার ও মানবিক স্বাধীনতা করেছে নিশ্চিত।

www.nagorikpathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্র

ইসলামী রাষ্ট্রের কতিপয় মূলনীতি

সাম্প্রতিককালে এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে বহু সংখ্যক স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। শরীয়তের নীতি মুতাবিক সরকারের পদ্ধতি গঠন করার উদ্দেশ্যে এসব দেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর পরই অনেকগুলোতে জাতীয়ভিত্তিক সংস্থা ও দল গঠিত হয়েছে এবং ইসলামী আইনের যথার্থ গঠন ও ইসলামের প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং তার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সক্ষম এমন শাসনতন্ত্র প্রণয়নের রীতি সম্পর্কেও বিভিন্ন মতামত উপস্থাপন করা হয়েছে।

ভৌগোলিক কারণে বিক্ষিপ্ত বলে ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে বিভিন্ন ধরনের লোক, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, প্রথা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে সরকারের বিভিন্ন পদ্ধতিও। অবস্থিতি ও সামাজিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে এসব রাষ্ট্রের প্রয়োজনও বিভিন্ন রকমের। সুতরাং একই ধরনের শাসনতন্ত্র এসব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের অবস্থা ও স্বার্থের প্রেক্ষিতে স্বাধীন যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এমন শাসনতন্ত্র রচনা করতে হবে যাতে শরীয়তের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে, মুসলিম আইনের লক্ষ্য অর্জনে একই ধরনের শাসনতন্ত্রের চেয়ে বিভিন্ন ধরনের সরকার পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্র অত্যন্ত কার্যকর। অবশ্য এসব শাসনতন্ত্র ও সরকার পদ্ধতি শরীয়তের সাধারণ নীতি এবং ইসলামের নৈতিক নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। বিভিন্ন পরিবেশের মধ্যে বসবাসকারী মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করাই হল শরীয়তের উদ্দেশ্য। সুতরাং শরীয়তের উদ্দেশ্য সফল করতে হলে সরকারী আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য থাকারও প্রয়োজন রয়েছে।

ইসলামী আইনশাস্ত্রের উৎপত্তি ও বিবর্তন এবং একই সাথে পণ্ডিত ও আইনশাস্ত্রবিদগণের বৈচিত্র্যপূর্ণ মতামতও এ ব্যাপারে আমাদের সঠিক পথনির্দেশ দিতে সক্ষম। পণ্ডিত ও আইনশাস্ত্রবিদগণ আইনের ব্যাখ্যা দান করে গেছেন এবং তাঁরা তাঁদের স্থানীয় অবস্থা ও ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন।

এভাবে ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, আরব রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য ইসলামী রাষ্ট্র যে ইসলামী শাসনতন্ত্র রচনায় আগ্রহী তা মূলগতভাবে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এসব

www.nagorikpathagar.org

রাষ্ট্রের প্রয়োজন অনুযায়ী ও জনগণের কল্যাণের জন্য যেসব আইন ঘোষণা করা হয়েছে, তা বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, কোন নির্দিষ্ট স্থান বা কালের প্রয়োজন অনুসারে জনগণের বাঞ্ছিত ন্যায়বিচার ও সাধারণ কল্যাণের জন্য আইনগত ও সামাজিক বিবর্তন ব্যাহত না করে মুসলমানদের একত্র করতে পারে—এমন আদর্শ শাসনতন্ত্র ও ইসলামী সরকার পদ্ধতি কি হতে পারে ?

পবিত্র কুরআন ও ইসলামী ঐতিহ্য (সুন্নাহ্) অধ্যয়ন এবং নিষ্ঠাবান খলীফাদের সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইসলামের সাধারণ নীতিগুলো সর্বকাল, সব স্থান ও সব মানুষের জন্য উপযোগী এবং তা যথাযথ ও চূড়ান্ত। এ নীতিগুলো বাস্তবায়িত হলে শরীয়তের নমনীয়তা এবং স্বাধীন ও যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যার প্রতি তার সমর্থন লক্ষ্য করা যাবে। শরীয়ত সব সময় রসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক প্রদর্শিত নীতির সমর্থন করে। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ "তোমাদের পার্থিব ব্যাপার সম্পর্কে তোমরাই ভাল জান।" এভাবে ভালমন্দ বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে।

এ নৈতিক উৎকর্ষই সম্ভবত ইসলামকে সমগ্র মানব জাতির একটা শাশ্বত জীবনবিধি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এভাবেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র ঘোষণাকে চিরসমুজ্জ্বল রেখেছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আমিই ত উপদেশপূর্ণ এই কিতাব (কুরআন) সঠিকভাবে নাযিল করেছি, আর এখন আমি তার হিফাযতকারী—একথা সত্য সুনিশ্চিত।"[১] ইসলাম যদি অন্যরকম কিছু হত তাহলে এত সহজে এ ধর্ম পালন করা যেত না। বিভিন্ন সময় ও স্থানে ইসলাম মানুষকে অসুবিধায় ফেলত এবং পরিবর্তনশীল প্রয়োজনের চ্যালেঞ্জ মুকাবিলা করতে সমর্থ হত না।

ইসলামের সাধারণ ও নৈতিক নীতির স্পষ্টতার জন্যই ব্যাখ্যা ও যুক্তির সাহায্যে অনেক সমস্যার সমাধান সম্ভব। এটা ইসলামের শাশ্বত নীতির কোন দুর্বলতা নয় ; তা সজীবতার লক্ষণ।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোন ব্যক্তি বা দলের হাতে ক্ষমতা ও শাসনের অধিকার ন্যস্ত থাকবে, এমন রাষ্ট্র ইসলাম অনুমোদন করে না। জনগণের মত ও সহযোগিতা রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে ইসলাম মনে করে। ইসলাম আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "যদি কেউ অবাধ্য হয়, তাহলে আপনাকে [মুহাম্মদ (স)] ত আর তাদের জন্য রক্ষক হিসেবে পাঠাইনি।"[২] "কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন।"[৩] "তারা (মুসলমানরা) প্রত্যেকটি কাজ নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে করে থাকে।"[৪] ইসলাম

www.nagorikpathagar.org

আলোচনা করাকে সাধারণ নীতি ও অবশ্য করণীয় বলে স্থির করে সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্র ও সমাজে সব সময় তা পালন করার নির্দেশ দিয়েছে। এ আদর্শ চালু রাখা ও ব্যবহার করা সম্পর্কে মানুষের অভিজ্ঞতা আছে। যা হোক, আলোচনার ব্যাপারে ইসলাম কোন বিশেষ পদ্ধতির নির্দেশ দেয়নি বা কোন স্থান বা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে তাও বলে দেয়নি। কারণ এতে আমাদের অসুবিধা হতে পারত। আমরা আমাদের ধর্ম ও বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব, এ বিশ্বাস নিয়ে ইসলাম আলোচনার ব্যাপারে নীতি-নির্ধারণের ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "প্রত্যেকটি কাজকে বিবেচনা করতে হবে তার উদ্দেশ্য দিয়ে এবং প্রত্যেকটি লোকই তার উদ্দেশ্য অনুসারে আল্লাহ্ কর্তৃক পুরস্কৃত হবে।" এ নিয়মের আওতায় রেখে কি ধরনের আলোচনা করতে হবে এবং কি পদ্ধতিতে আলোচনা চালাতে হবে, তার ভার আমাদের ওপর ছেড়ে দেওয়ার কারণ হল আমরা যেন প্রয়োজনবোধে জনগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করে একটা স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আমরা দেখতে পাই, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রধান প্রধান সাহাবী, পরবর্তী পর্যায়ে রাষ্ট্রপ্রধান ও আইনবিদগণ এ ব্যাপারে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আলোচনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এগুলো আমাদের জন্য মূল্যবান নযীরস্বরূপ। যথা—

১. প্রাথমিক যুগে মসজিদে উপস্থিত লোকদের সম্মুখে বা বাছাই করা কতিপয় লোকের কাছে আলোচনার বিষয় উপস্থিত করা হত বা রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রধান সাহাবিগণের মধ্য থেকে কয়েকজনকে ডেকে এ সম্পর্কে তাদের অভিমত ব্যক্ত করার আহ্বান জানানো হত।

২. পরবর্তী যুগে, বিশেষ কোন উপলক্ষে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সম্মুখে বিশেষ কোন সমস্যা আলোচনার জন্য পেশ করা হত।

৩. আরও পরে আমরা দেখতে পাই, রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক নিযুক্ত এক বা একাধিক ব্যক্তির বিবেচনার ওপরে কোন বিশেষ সমস্যার সমাধান ছেড়ে দেওয়া হত। এ সব ব্যক্তি যে জনগণের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন, তাও আমরা দেখতে পাই।

এ সব ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এ ছিল যে, সমস্যা সমাধানে নেতাদের সদিচ্ছা, ধর্মভীরুতা এবং আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের আগ্রহ প্রতিফলিত হত। এ প্রেক্ষিতে তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন যা ছিল তাঁদের ও জনগণের কাছে সন্তোষজনক এবং সময়োপযোগী।

মুসলমানরা আগে থেকেই স্বীকার করে আসছেন যে, উপযুক্ত আলোচনাকারীদের অবশ্যই 'আহল-আল-হাল ওয়াল-আকদ্' হতে হবে অর্থাৎ তাঁরা যেমন কঠোর হবেন তেমনি আবার কোমলও হবেন। তাঁদের কর্তৃত্বের মানদণ্ড হল, তাঁরা কোন ব্যাপারে

www.nagorikpathagar.org

একমত হলে জনগণ তা মেনে নেবে এবং তাঁরা তা অস্বীকার করলে সমাজের সকল লোকই তা প্রত্যাখ্যান করবে।

কারা যথার্থই স্বভাবনেতা, কাদের ওপর জনগণের আস্থা আছে এবং কারাই বা জাতির সত্যিকার প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন তা আমাদের স্থির করতে হবে। প্রথমক্ষেত্রে, স্বভাবনেতা নির্বাচনের প্রশ্নে এবং খলীফা নির্বাচনে কাদের অনুমোদন প্রয়োজন এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছার সমস্যাটা আমরা ইসলামের ইতিহাসের গোড়া থেকেই দেখতে পাই। দ্বিতীয় সমস্যা হল নির্বাচকমণ্ডলীকে কি পদ্ধতিতে বাছাই করতে হবে। এসব প্রশ্নে মতের বিভিন্নতা রয়েছে। কারও মতে, নেতারা হবেন বিদ্বান লোক ও সমাজের নেতৃস্থানীয় লোক ; আবার কারও মতে যেসব বিদ্বান লোক স্বাধীনভাবে বিচার-বিবেচনা করতে সক্ষম তাঁরাই নেতা হবেন।[৫]

আসল কথা হল, স্বভাবনেতা নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। এ প্রশ্নে শহরবাসী ও গ্রামবাসীদের মধ্যেই মতপার্থক্য দেখা যায়। কারণ পল্লী এলাকার সামাজিক কাঠামো শিল্প এলাকার সামাজিক কাঠামো থেকে ভিন্ন। কোন এক যুগে বিদ্বান ব্যক্তিরা নেতা হতে পারেন, আবার কোন এককালে গোত্রের, অঞ্চলের বা দেশের প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও জননেতা হতে পারেন। আমাদের যুগে দলনেতা, সমাজের নেতা বা ইউনিয়নের নেতা জননেতা হতে পারেন। সুতরাং সমগ্র ব্যাপারে কে জনগণের প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন এবং কেই বা ন্যায়ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার যোগ্যতা রাখেন তা নির্ধারণ করা, ব্যাখ্যা করা এবং স্বভাবনেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মতের ভিন্নতা থাকতে পারে। তাই সংস্কৃতি, প্রথা এবং জাতিগত বৈষম্যের সাথে সাথে বিভিন্ন স্থান-কাল-পাত্রের বৈষম্যও বিবেচনা করতে হবে।

সুতরাং উপরোল্লিখিত ভিন্নতার প্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দের বা জনগণের প্রতিনিধির মতামত প্রকাশ এবং তাদের সাথে ইমামদের আলোচনার প্রেক্ষিতে শাসনতন্ত্র রচনার পদ্ধতিও বিভিন্ন রকম হবে। এ প্রেক্ষিতে একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্র অন্য একটি ইসলামী রাষ্ট্রের সরকার পদ্ধতি ও শাসনতন্ত্র থেকে আলাদা হতে পারে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এসব শাসনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হবে মুসলিম আইন তথা শরীয়তের সার্বভৌমত্ব এবং অবাধ জনমত। এর ফলে সরকার পদ্ধতির ক্ষেত্রে যুক্তি প্রয়োগ ও ঐতিহ্য বিশ্লেষণে তা সহায়ক হবে এবং ইসলাম ও তার উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ শাসনতন্ত্র রচনা করা সম্ভব হবে।

শরীয়তকে নির্দিষ্টভাবে ব্যবহার করার অপর একটা উদাহরণ আমরা রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমাম নির্বাচন এবং তাঁর যোগ্যতা, অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেখতে পাই। এক্ষেত্রে আমরা আরও দেখতে পাই যে, শরীয়ত রাষ্ট্রপ্রধান বা ইমামের পদকে

www.nagorikpathagar.org

স্থায়ী করে দিয়েছে। কিন্তু জনস্বার্থ ও জনকল্যাণের অনির্দিষ্ট বিষয়গুলো মানুষের বিচার-বুদ্ধির ওপর ছেড়ে দিয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মৃত্যুর পর মুসলমানরা যেদিন 'সাকিফায়ে বনি সাইদায়' মিলিত হয়ে হযরত আবূ বকরের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করে, সেদিন থেকেই মুসলমানদের মধ্যে খিলাফত নিয়ে মতবিরোধ শুরু হয় এবং এ বিষয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন মতবাদের সৃষ্টি হয়। বেশির ভাগ মুসলমান গোঁড়া তথা সুন্নী মুসলমানদের মত স্বীকার করে নিলেও অনেক সূক্ষ্ম ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। বলা যেতে পারে যে, দুটো বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই মুসলমানরা মতৈক্যে পৌঁছাতে পারেনি। এ দুটো বিষয় হল, বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য একজন ইমামের আবশ্যকতা এবং তাঁদের ধর্মীয় বিধান পালন করার আগ্রহ।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, বিষয়টির তত্ত্বগত দিক নিয়ে আলোচনা করা বা সুন্নী (মুসলমানদের মধ্যে যারা শতকরা ৯০ জন), শিয়া ও ইবাদি (Ibadites) সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস বা মতামত সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। শরীয়ত কতগুলো কাজ বাধ্যতামূলক করেছে আবার কিছু কাজ মানুষের নিজস্ব মতামতের ওপর ছেড়ে দিয়েছে—এ পার্থক্যটা দেখানোর জন্য মতবিরোধটার কথা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। শেষোক্ত ব্যাপারগুলো স্থান-কাল-পাত্রভেদে জনস্বার্থের প্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা হয়।

এসব পার্থক্য পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে, ইমামতের ব্যাপারে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় এমন কি ইমামের উপাধি কি হবে তা নিয়েও মতপার্থক্য রয়েছে। সেজন্য মুসলমানরা রাষ্ট্রপ্রধানকে খলীফা (নবীর উত্তরাধিকারী), আমীরুল মুমিনীন (বিশ্বাসীদের নেতা), ইমাম (নেতা) এবং সুলতান (শাসক বা রাজা) হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।[৬]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এ মতপার্থক্য শুরু হয়। মুসলমানরা যখন 'সাকিফায়ে বনি-সাইদাতে' মিলিত হয় তখন তাদের কাছে বিষয়টা সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না। মদীনার আনসারগণ মক্কার মুহাজিরগণকে বলেন ঃ "আমাদের মধ্য থেকে একজন এবং আপনাদের মধ্য থেকে একজন আমীর থাকবেন।" অপরদিকে মুহাজিরগণ বলেন ঃ "আমাদের মধ্য থেকে থাকবেন মন্ত্রিগণ।" অন্য কথায় বলা যায়, দু'দলের একদল এক আমীরের আদর্শ সমুন্নত রাখে এবং অপর দল একের অধিক আমীরের পক্ষে রায় দেয়। যা হোক, পরিশেষে সর্বসম্মতিক্রমে হযরত আবূ বকরকে তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের জন্য একক নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। হযরত উমরের ভাষায়, "আবূ বকর ছিলেন অন্য সকলের ওপর দুর্গস্বরূপ।"

www.nagorikpathagar.org

ইমামতের বিষয়টা যেহেতু রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবিগণ 'ইজমার'৭ সাহায্যে বা সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট সময়ে সমাধান করে গেছেন, সেহেতু ইমামের প্রয়োজনীয়তা বা বিষয়টা ব্যক্তিগত বিবেচনা, ধর্মীয় আইন বা অন্য কোন বিবেচনার যোগ্য কিনা তা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। মুসলমানরা ইমাম নির্বাচন করে তাঁর অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণের কাজে এগিয়ে যায়। মুহাম্মদ (স)-এর শিক্ষা, পরিচালনা এবং সংগ্রামের ফলে সৃষ্ট সম্পূর্ণ নতুন সমাজের জনগণের ঐহিক ও পারত্রিক স্বার্থ সংরক্ষণে ইমামের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকার ক্ষমতা ও কর্তব্য নির্বাচন করার প্রয়োজন ছিল। এ সমাজ ছিল পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত এমন একটা আত্মনির্ভরশীল সমাজ, যেখানে আল্লাহ্র ওপর নির্ভরশীল থেকে সকলেই পূর্ণ সাম্য উপভোগ করবে। এদের মধ্যে শুধু পার্থক্য ছিল ধার্মিকতার ক্ষেত্রে। শরীয়তের বিধান ছাড়া কেউ কোন কর্তৃত্ব এ সমাজে খাটাতে পারবে না। যে বিশ্ব তখন পর্যন্ত রাজার স্বর্গীয় অধিকারে এবং সম্রাটের অস্ত্রবলের ওপর বিশ্বাসী ছিল সেই বিশ্বে সম্পূর্ণ নতুন আদর্শে প্রতিষ্ঠিত এ সমাজ ব্যবস্থা ছিল বাস্তবিকই একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

এভাবে সেদিন সেই সমাজে 'ইমাম' প্রতিষ্ঠিত ছিল ; শরীয়তের আইন চালু হল এবং পবিত্র ও প্রগতিশীল নতুন আইন ও রীতিনীতি চালু করা হল। এ রীতিনীতিগুলোই পরবর্তীকালে মুসলমানদের জন্য এক চিরস্থায়ী শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়—যার অধীনে শাসক শরীয়তে নির্দিষ্ট ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ছাড়া আর কিছু ভোগ করতে পারবে না। এ শাসনতন্ত্রে ব্যক্তির এবং সমাজের অধিকার ও কর্তব্য সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়েছে এবং কোন জাগতিক কর্তৃপক্ষই মানবিক এ অধিকার ও কর্তব্য পরিবর্তন বা সংশোধন করতে পারবে না। এসব বিধান মুতাবিক 'ইমাম' একটা আমানত স্বরূপ এবং ইমাম হচ্ছেন আমানতদার যিনি শাসনতান্ত্রিক বিধান অনুযায়ী জনকল্যাণের স্বার্থে কাজ করে যাবেন।

একটা একাগ্রচিত্ত জাতি ছাড়া ইমামত অনন্য ও অভূতপূর্ব ইসলামী প্রতিষ্ঠান হিসেবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারবে না। শরীয়ত মুতাবিক এ জাতির কার্যাবলী স্পষ্ট শাসনতন্ত্র কর্তৃক পরিচালিত এবং জাতির পরিবর্তনশীল চাহিদা মিটানোর জন্য বিশেষ নীতি অনুযায়ী জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী তা পরিবর্তনশীলও।

ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, কোন মুসলিম রাষ্ট্র দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বৈরাচারী হয়ে পড়লে জনগণ শরীয়তের বিধান মানতে বাধ্য থাকবে না এবং তথায় অরাজকতার সৃষ্টি হবে । এমন অবস্থায় শাসক ও শাসিতের অধিকার ও কর্তব্য অবহেলিত হবে, বিবাদ-বিসংবাদ বৃদ্ধি পাবে এবং আইনের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা হবে। এ সমস্ত দুর্যোগ প্রতিহত করতে ইসলামী ব্যবস্থা এবং জনসমর্থিত শাসনতন্ত্র

www.nagorikpathagar.org

পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করে আসমানী বিধানকে বাস্তবায়িত করতে হবে। এ শাসনতন্ত্রে ইসলামের চিরন্তন মৌলিক নীতিসমূহ যেমন থাকবে, তেমনি জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণে পরিবর্তনযোগ্য নমনীয় বিধানও থাকবে। উল্লেখ্য যে, সমাজের স্থিতিশীলতা, সন্তুষ্টি এবং মুসলমানদের শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনের জন্য শরীয়ত মুসলমানকে স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করেছে।

তাহলে ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধানের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বসম্মত নীতিগুলো কি ? বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত মুসলমান পণ্ডিত ও আইনবিদগণের অসংখ্য মতামত এবং ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমার ধারণা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপ্রধানের দফতর সম্পর্কে শরীয়ত মাত্র কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। এ মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে ইমামের অভিষেক। ইমামকে অবশ্যই পরিণত বয়স্ক ও জ্ঞানী হতে হবে এবং তাঁর জন্য জনসমর্থন থাকতে হবে। তিনি সব সময়ই সৎ নাগরিকের সাহায্য গ্রহণ করবেন এবং স্বভাবনেতাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। উপরন্তু তিনি প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অভিভাবক হিসেবে কাজ করবেন এবং আইনের প্রতি সমর্থন দান করবেন। কিন্তু তিনি যদি আল্লাহ্‌র আদেশ অমান্য করেন এবং জনস্বার্থকে উপেক্ষা করেন, তবে তাঁকে উৎখাত করা যাবে। এ মৌলিক নীতিগুলো ছাড়া বাদ বাকি সব কিছুই শরীয়ত মানুষের স্বাধীন বিচার-বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। ইসলামের সাধারণ ও সার্বজনীন বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে সার্বিক কল্যাণের উপযোগী বাড়তি যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা শরীয়তে সমর্থনযোগ্য।

জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ইসলামের এ নিজস্ব অভিমত বর্তমান যুগে প্রচলিত মতামত তথা রাষ্ট্রই সকল ক্ষমতার অধিকারী—এ অভিমত থেকে কিছুটা পৃথক।

ইসলাম একটা সার্বজনীন ধর্ম ; তার নিজস্ব আদর্শ আইন ও নীতিমালা রয়েছে এবং অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুষ্ঠু মতবাদও আছে। এ ধর্ম কোন নির্দিষ্ট স্থান, জাতি, গোত্র বা বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের সার্বভৌমত্বের ধারণা শরীয়তের মধ্যে নিহিত রয়েছে। অন্য কথায়, সার্বভৌমত্ব ঐ সমস্ত চিরন্তন নীতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে, যার ওপর ভিত্তি করে ইসলামী বিধান প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে সকলের জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত যে শাশ্বত অধিকার ও কর্তব্য ঘোষণা করা হয়েছে, তা লংঘন করার অধিকার কোন নির্দিষ্ট জাতির বা রাষ্ট্রপ্রধানের বা গণপরিষদের নেই। কোন নির্দিষ্ট দেশ বা সামগ্রিকভাবে মানব জাতির ক্ষেত্রেও এ নীতি প্রযোজ্য। এসব নীতি সার্বভৌম এবং অক্ষয়, কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়ই এদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে। এটা একটা মৌলিক ইসলামী

www.nagorikpathagar.org

ধারণা এবং এ সম্বন্ধে ইসলামের আলিম সমাজকে সজাগ থাকতে হবে। বর্তমান জগতে এর বহুল প্রচার অত্যাবশ্যক ; কারণ দেশ-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে এটা সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে এমন বন্ধনে আবদ্ধ করে, যা জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও স্বার্থের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

বর্তমানে মুসলমান এবং অমুসলিমদের নিকট সার্বভৌমত্বের অর্থ ভিন্নভাবে স্বীকৃত। ইসলামে সার্বভৌমত্বের অর্থ হল কতগুলো শক্তির সংযোজনে সৃষ্ট কর্তৃপক্ষ। এগুলো হচ্ছে শরীয়ত, জাতি এবং ইমাম। ইমাম হলেন শরীয়তের অভিভাবক এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি। এসব উপাদানের সমন্বয়ের দরুনই ইসলামী ব্যবস্থা অন্যান্য ব্যবস্থা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ন্যায়বিচার এ ব্যবস্থার সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এবং এতে নৈতিকতার সাধারণ নীতিসমূহও সুসংরক্ষিত। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত সার্বজনীন শাশ্বত নীতিকে ভিত্তি করেই এটা অধিকার ও কর্তব্যের নিয়মাবলী নির্দেশ করে। সুতরাং ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ, ভাবাবেগ, ধর্মোন্মত্ততা এবং পক্ষপাতিত্বের কোন অবকাশ এখানে নেই। যে কোন জাতি তার জাতীয় সার্বভৌমত্ব ইচ্ছামত ব্যবহারের অধিকারী—এ অজুহাতে কোন জাতি, কোন রাজা, কোন রাষ্ট্রপ্রধান বা সাধারণ কোন লোক এ মানবীয় অধিকার ও কর্তব্য নস্যাৎ করতে পারে না।

সুতরাং শরীয়ত মুতাবিক সার্বভৌমত্বের অর্থ এবং অমুসলিমদের সংবিধান এবং তদনুযায়ী রচিত মুসলমানদের সংবিধানে বিধৃত সার্বভৌমত্বের অর্থের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। কারণ শেষোক্ত সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় জাতীয় সার্বভৌমত্ব। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, তিনটি উপাদানের সমন্বয় ছাড়া ইসলামী সার্বভৌমত্ব সৃষ্টি হয় না। এ উপাদানগুলো হল– শরীয়ত, জননেতৃবৃন্দ এবং বাছাইকৃত ইমাম তথা রাষ্ট্রপ্রধান। এদের হাতে যৌথভাবে যে ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, তা-ই সার্বভৌমত্ব। প্রাচীনকালে এ ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত ছিল। আধুনিককালে অনৈসলামিক রাষ্ট্রে এটা জনগণের হাতে ন্যস্ত এবং ইসলামী রাষ্ট্রে তা উপরোক্ত ত্রয়ীর হাতে ন্যস্ত।

ইসলামী সার্বভৌমত্ব মানুষের ভাবাবেগ এবং স্থূল মতামতের আওতাবহির্ভূত বিষয়। এ সার্বভৌমত্ব মানুষের অধিকার ও কর্তব্যের রক্ষাকবচ স্বরূপ। ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে বা পরে কোন জাতির আদর্শের সমান্তরাল হিসেবে এ সার্বভৌমত্ব বিরাজিত ছিল না।

কারো একক ইচ্ছায় এ সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যকর করা যায় না। জনগণের নামে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল কর্তৃক বা রাজার নামে বা একনায়কত্বের নামে কমিউনিস্ট বা অকমিউনিস্ট রাষ্ট্রে যা হয়ে থাকে, এ সার্বভৌমত্বের কার্যকারিতা তা থেকে আলাদা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা যা পবিত্র বিধানের মাধ্যমে প্রকাশিত এবং রাষ্ট্রের ইচ্ছা যা জাতি এবং সরকারের যৌথ কার্যের মাধ্যমে প্রকাশিত ; কেবলমাত্র এর মাধ্যমেই এ সার্বভৌমত্ব

www.nagorikpathagar.org

কার্যকর করা যায়। অন্য কথায়, এ তিনটা যৌথ ইচ্ছার মাধ্যমেই পৃথিবীর সর্বত্র এবং সর্বদা মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সঠিকভাবে নির্ধারিত ও সংরক্ষিত করা সম্ভব।

দৃষ্টান্ত হিসেবে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ উল্লেখ করা যায় ঃ "আল্লাহ্ ন্যায়বিচার কায়েম করতে ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা কায়েক করতে আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সাহায্য-সহযোগিতা দানের জন্য আদেশ দিচ্ছেন।"৮ এবং "আর কোন কওমের সাথে শত্রুতার কারণে ন্যায়বিচার বর্জন করো না। তোমরা অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। কারণ তা তাকওয়ার সাথে খুবই ঘনিষ্ঠ।"৯ এবং "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমরা সবাই ন্যায়বিচারের ওপরই কায়েম থেকো, আল্লাহ্তা'আলার তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে। হোক না তা নিজেদের ব্যাপার কিংবা মা-বাবা অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপার।"১০ সুতরাং দেখা যায় যে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের নামে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের নামে হলেও ইমাম বা জাতি বা উভয়েই শরীয়ত নির্দেশিত ন্যায়বিচার এবং সাম্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে পারে না।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন জাতির পক্ষে সর্বময় ক্ষমতার উৎস হওয়া উচিত নয় ; নিজের বা অন্যের জন্য স্বীয় ইচ্ছা মাফিক কিছু করাও উচিত নয়। এ ধরনের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা আল্লাহ্প্রদত্ত সামাজিক ও নৈতিকতার নীতি, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার ও কর্তব্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

কিন্তু জাতি তার নিজস্ব সরকার ও শাসনতন্ত্র গ্রহণের এবং যৌথ সার্বভৌমত্বের আওতায় আইন প্রণয়নে সম্পূর্ণ স্বাধীন। সব বিষয়ের ওপরেই জাতি সার্বভৌম। কিন্তু আসমানী বিধানের মধ্য থেকে সেই সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। কারণ আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন এবং তাদের সরকার গঠনের দায়িত্ব দিয়েছেন এজন্য যে, তারা ন্যায়বিচার কায়েম করবে এবং সাম্য প্রতিষ্ঠা করবে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "হে দাউদ ! আপনি শুনুন। আমি আপনাকে এ দুনিয়ার বুকে প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করেছি। সুতরাং লোকজনের মধ্যে ন্যায়বিচার মুতাবিক ফয়সালা করে দিন। নিজের খেয়ালখুশী মুতাবিক কোনও কাজই করবেন না যা আল্লাহ্র পথ হতে আপনাকে গোমরাহ করে দেবে। নিশ্চয়ই একথা সত্য—যারা আল্লাহ্র পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের জন্য কঠোর সাজা রয়েছে, কারণ তারা ত হিসেবের দিনটাকে একদম ভুলেই বসল।"১১

হ্যাঁ, জাতিই ক্ষমতার উৎস। শরীয়ত মুতাবিক রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান কেবল জাতির অনুমতিক্রমেই শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারেন। জাতিই রাষ্ট্র গঠন করে এবং তা পরিচালনা করে, সরকার নির্বাচন করে—জাতির জন্য কোন্টা মঙ্গলজনক এবং কোন্টা অমঙ্গলজনক তা জাতিই নির্ধারণ করে। এসব ব্যাপারে জাতিই ক্ষমতার উৎস। তবে এ ক্ষমতাকে ইসলামের নির্দেশ মুতাবিক ব্যবহার করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

আসমানী বিধান হিসেবে শরীয়তের সার্বভৌমত্বকে কোন ব্যক্তি বা অন্য কোন শক্তি উপেক্ষা করতে পারে না। সুলতান অথবা জাতির সমর্থন থাকা সত্ত্বেও ইসলাম বিঘোষিত ন্যায়বিচার এবং অধিকারের পথে বাধা সৃষ্টিকারক কোন মতামত বা কার্যাবলী ইসলাম সমর্থন করে না। এক জাতি অন্য জাতির স্বার্থ নষ্ট করতে পারে না বা অন্য জাতির কল্যাণকে উপেক্ষা করে কোন জাতি তাদের আইন প্রয়োগ করতে পারে না। অনুরূপভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল অন্যায়ভাবে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের স্বার্থবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে পারে না, যদিও তা সাধারণ ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ বলে গণ্য করা হয়।

সমসাময়িক ইসলামী ও অনৈসলামী রাষ্ট্রসমূহে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আধুনিক ধারণা হল এই যে, রাষ্ট্র সার্বভৌম এবং যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারে। কিন্তু ইসলামের বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে এ ধারণা ভ্রান্ত। সমগ্র মানবজাতির জন্য ইসলাম কতগুলো পবিত্র বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠা করেছে। কোন এক জাতির স্বার্থ তথা জাতীয় কোন বিশেষ স্বার্থ রক্ষার জন্যই তা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সমগ্র মানবের স্বার্থ রক্ষার্থেই এসব বিধি-বিধান প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থ রক্ষার চেয়ে সমগ্র মানবের সাধারণ কল্যাণ সাধন করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এ ক্ষেত্রে দেখা যায়, আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাকারগণের ধারণা অনুযায়ী জাতীয় সার্বভৌমত্ব দ্বারা যে অধিকার বোঝায়, তা ইসলামের মানবাধিকার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামী রাষ্ট্রের মৌলিক নীতি আলোচনা করতে গিয়ে আমি তিনটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছি। তা হল—আলোচনা, রাষ্ট্রপ্রধান এবং জাতীয় সার্বভৌমত্ব। এ তিনটি মূল বিষয় ব্যাখ্যা করার মাধ্যমে সাধাণত শাসনতন্ত্রসমূহের কাঠামো রচনা করা হয়। অন্য কথায়, ইসলামের ঐতিহাসিক বিবর্তন এবং ধর্মতত্ত্ববিদ ও ব্যবহারশাস্ত্রবিদগণের মতামতের ওপর ভিত্তি করেই শাসনতন্ত্র রচিত। প্রতিষ্ঠিত এবং শাশ্বত নীতির ক্ষেত্রে এগুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও নির্ভুলভাবে বর্ণিত এবং প্রয়োজনের সময় তা পরিবর্তনযোগ্য ও নমনীয়।

আমাদের আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, প্রত্যেকটি মুসলিম দেশের মানুষ তাদের উপযুক্ত ইসলামী আইন ও শাসনতন্ত্র কার্যকরী করার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত এবং এর দ্বারা তারা প্রমাণ করছে যে, তাদের ধর্ম ব্যবহারিক এবং তা কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে না। ইসলামী শাসনতন্ত্র এক এক দেশের অবস্থা অনুসারে ভিন্ন হতে পারে ; তবে সে শাসনতন্ত্রকে কার্যকর ও কল্যাণমুখী হতে হলে তাকে অবশ্যই ইসলামের শাশ্বত মূলনীতির আওতার মধ্যে থাকতে হবে।

মুসলমানরা যদি সরল বিশ্বাসে কাজ করে যায় এবং শরীয়তের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা রেখে তাদের নিজ নিজ অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক সরকার গঠন করে, তাহলে তা কমিউনিস্টিক গণতন্ত্র বা ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চেয়ে তাদের

www.nagorikpathagar.org

অনেক বেশি উপকারে আসবে এবং তা হবে তাদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি উপযোগী। এভাবে মুসলমানরা অন্যদের সামনে একটা আদর্শ তুলে ধরতে পারবে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে মুসলমানদের আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে ঃ "এরূপে আমি তোমাদের ভারসাম্যশীল মধ্যপন্থী জাতি করেছি।"[১২] অর্থাৎ ইমাম সব রকমের চরমতার বিরোধী—তারা এমন সব সমস্যার সমাধান করবে যা অন্যেরা সমাধান করতে পারবে না। তারা মানুষের দৈহিক ও আত্মিক প্রয়োজন মিটিয়ে সভ্যতা গড়ে তুলবে এবং সত্যিকারের মানব জীবন যাপনের ব্যবস্থা দেবে। কারণ শান্তি, স্থিতিশীলতা এবং উন্নতির জন্য এ দুটো জিনিস অপরিহার্য। মানুষ পশু নয় যে, সে শুধু এ পৃথিবীতে খাওয়ার জন্যই এসেছে। আবার সে ফিরিশতাও নয় যে, কেবল ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেই জীবন কাটাবে। ইসলামের বাণীর বৈশিষ্ট্যই হল মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। মানুষের আত্মার ও দেহের নিয়ত প্রয়োজনের কথা ইসলাম গভীরভাবে বিবেচনা করেছে। এ প্রয়োজনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলাম কতিপয় চিরন্তন নীতির সৃষ্টি করেছে যা অমান্য করা যায় না এবং সময়ের বিবর্তনে যেসব গৌণ বিষয়ের পরিবর্তন প্রয়োজন, সে সবের পরিবর্তন করার সুযোগ ইসলাম দিয়েছে।

ইসলামের অমর বাণী ব্যাপকভাবে বিশ্বমানবের কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট। এটাকে কোন বিশেষ শ্রেণী বা জাতি অতিক্রম করতে পারে না। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই ইসলাম জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এ শর্তে যে, এর ক্ষমতা পূর্বোল্লিখিত সার্বভৌম ত্রয়ীর কাছ থেকে প্রাপ্ত হতে হবে এবং তা হবে সাধারণ মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এটা যে কোন ইসলামী সরকারের কর্তব্যের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ইসলাম প্রতিটি জাতির প্রতি এ নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের অন্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে না করে এবং একের স্বার্থকে অন্যের স্বার্থের ওপর অগ্রাধিকার না দেয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ

"তোমরা সেই স্ত্রীলোকটির মত হয়ো না, যে অনেক কষ্ট ক্লেশ করে কিছু সুতা কাটল। কিন্তু পরে তা টুকরা করে ফেললো। তোমরা নিজেদের শপথকে এক দলের ওপরে অন্য দল ভারী হওয়ার জন্যই ব্যবহার করছ।"[১৩]

"এরূপে আমি তোমাদের ভারসাম্যশীল জাতি করেছি, যেন তোমরা লোকদের সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের সাক্ষী হতে পারেন।"[১৪]

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র ও তার বৈদেশিক নীতি

ইসলামের প্রচার প্রথমে গোপনে শুরু হয়। যখন প্রকাশ্যে তা প্রচার হতে থাকে, তখন বিরাট রকমের একটা বাদানুবাদ আরম্ভ হয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ মুসলমানদের ওপর নির্যাতন শুরু হয়ে যায়। রসূলুল্লাহ্ (স) তখন তাঁর অনুচরবর্গকে দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার উপদেশ দেন। তাঁরা দেশ ত্যাগ করে আবিসিনিয়ায় চলে যাওয়ার পর থেকেই মুসলমানদের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সূচনা ঘটে।

মুহাম্মদ (স) সমাজচ্যুত অবস্থায় মক্কায় থেকে বিজ্ঞোচিত উপায়ে মানুষকে আল্লাহ্‌র পথে চলার জন্য উপদেশ দিয়ে যেতে থাকেন। এ সময় হাশেমী ও মুত্তালিব গোত্রদ্বয় মক্কার অদূরে এক উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে মক্কার নেতৃবৃন্দ 'বয়কট' উঠিয়ে না নেওয়া পর্যন্ত সেখানেই তারা অবস্থান করতে থাকে।

'বয়কট' উঠিয়ে নেওয়ার পর কিছুদিন বেশ শান্ত পরিবেশ বজায় ছিল। এ সময় উপত্যকায় ও আবিসিনিয়ায় পলাতক মুসলমানরা তাদের স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে এ আশায় যে, তথায় তারা শান্তিতে বসবাস করতে পারবে। কিন্তু অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটলে রসূলুল্লাহ্ (স) পুনরায় তাদের আবিনিসিয়ায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। দেশত্যাগী অবস্থায় তথায় তাদের নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। কারণ কুরায়শরা আমর ইবনুল আসের নেতৃত্বে উপঢৌকনসহ একদল প্রতিনিধি আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট প্রেরণ করে। প্রবাসী মুসলমানদের আবিসিনিয়া থেকে বিতাড়িত করার জন্য তারা সম্রাটকে অনুরোধ করে। মুসলমানরা তখন আত্মরক্ষার জন্য মুহাজির হিসেবে তাদের অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং তা প্রতিষ্ঠা করে। এভাবেই আবিসিনিয়ার সাথে মুসলমানদের প্রথম বৈদেশিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

তারপর মদীনায় পৌঁছার পর মুহাম্মদ (স) ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের সাথে তাঁর প্রথম সন্ধি[১] স্থাপন করেন। মদীনার (য়াছরিব) এ চুক্তি একটি অতি মূল্যবান আন্তর্জাতিক চুক্তি। এ ধরনের চুক্তি আজ পর্যন্ত কোন রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি। এ চুক্তি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নের দাবি রাখে। নিজেদের মধ্যে এবং অন্যান্য ধর্মের লোকদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে মৌলিক

www.nagorikpathagar.org

নীতি হিসেবে এ চুক্তি মুসলমানদের নিকট আলোকবর্তিকা স্বরূপ। এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং একটা ইসলামী রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

এ চুক্তি ছিল শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এবং আক্রমণের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার সম্মিলিত সহযোগিতার দলীল। চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক রাষ্ট্রই স্ব স্ব লোকের ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব বজায় রাখার এবং স্বাধীনভাবে তাদের নিজ নিজ ধর্ম প্রচার করার অধিকার পেয়েছিল। চুক্তিতে দস্তখতকারী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহ আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করার এবং একে অপরের ধর্মীয় বিশ্বাস রক্ষা করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিল। এভাবে ধর্মীয় বিশ্বাসের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও চুক্তিবদ্ধ ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতা ও তা প্রচারের স্বাধীনতাও রক্ষিত হয়।

এ চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর মুসলিম রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপিত হয়। জাতি ও গোত্র নির্বিশেষে সকলেই লাভ করে এ মুসলিম রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব। উপজাতীয় সর্দার থেকে শুরু করে আশ্রয়প্রার্থী মাওয়ালী (Mawali) পর্যন্ত সকলে মিলে এমন একটা জাতির সৃষ্টি করে যা অন্য জাতি অপেক্ষা ভিন্নতর। এ প্যাক্ট অনুযায়ী মুসলমানরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাষ্ট্রের সাথে জোটভুক্ত হয় এবং এভাবে জন্মলাভ করে একটা 'লীগ অব নেশন্স'। এর উদ্দেশ্য ছিল অত্যাচারিতকে সাহায্য করা, শান্তির জন্য যথার্থ উপদেশ দেওয়া এবং চুক্তিভুক্ত মুসলমান ও জাতিসমূহের মর্যাদা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্য ছিল চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রক্ষা করা এবং ভিন্নতা সত্ত্বেও স্বাধীনভাবে ধর্ম প্রচারে সাহায্য করা। এ চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিল মুসলমান এবং য়াহূদী ও খৃস্টানদের মধ্যে। এ সময় মদীনায় বহু মূর্তি উপাসকও ছিল। তারাও এ চুক্তিতে যোগ দেয়। এ সময় মদীনায় খৃস্টানরা থাকলে তারাও চুক্তির আওতার বাইরে থাকত না। এ চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ইসলাম তেরশ বছর আগে আধুনিক 'লীগ অব নেশন্স' বা জাতিসংঘের মত একটা সংঘ গড়ে তুলেছিল।

এ মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের আগে নির্যাতন ও অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার জন্য একটা পারস্পরিক সমঝোতা হয় এবং তা ১৪ বছর স্থায়ী হয়েছিল। মুসলমানদের মহানুভবতা, দয়া, আপসমূলক মনোভাব এবং সর্বোপরি রক্তের সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও কুরায়শরা তাদের ওপর অত্যাচার অবিচার করত। মুসলমানদের ধন-সম্পত্তি লুট করে তাদের বিভিন্ন স্থানে তাড়িয়ে দিয়ে, তাদের সম্মান নষ্ট করে এবং তাদের বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রাখার জন্য কুরায়শরা তাদের জনশক্তি নিয়োগ করেছিল। বহু বছর যাবত মুসলমানরা এর প্রতিশোধ নেওয়া থেকে বিরত থাকে এবং এর পরিবর্তে কুরায়শদের শুভবুদ্ধি ও সুবিবেচনার অপেক্ষা করে। কারণ শক্তি দিয়ে শক্তির মুকাবিল করার বা অন্যকে বাধ্য করার ইচ্ছা মুসলমানদের ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু মুসলমানদের ওপর কুরায়শদের অত্যাচার চরম আকার ধারণ করলে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র নিকট থেকে যুদ্ধ করার জন্য আদেশ লাভ করে। বিশ্বাস, স্বাধীনতা ও আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হয়। নিম্নলিখিত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয় ঃ

"যারা কাফিরদের দ্বারা যুদ্ধে আক্রান্ত হয়, তাদের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল। কেননা তাদের প্রতি অবশ্যই জুলুম করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাদের বিজয়ী করার ক্ষমতা রাখেন। যাদের অন্যায়ভাবে গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেবল এ কারণে যে, তারা বলে, "আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র প্রভু।" যদি আল্লাহ্ মানুষের এক দলকে দিয়ে অন্য দলকে দমন না করতেন, তবে নিশ্চয়ই ধ্বংস করে ফেলত (খৃস্টানদের) আশ্রম ও গীর্জা, (য়াহূদীদের) উপাসনাগৃহ এবং (মুসলমানদের) মসজিদ—যথায় হামেশা আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হয়। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সেই ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন, যে আল্লাহ্‌কে সাহায্য করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমতাশালী ও শক্তিমান। তারা এরূপ ভাল লোক যে, যদি আমি তাদের দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজ করতে হুকুম করবে, অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখবে এবং সব কাজের শেষ ফল আল্লাহ্‌রই ক্ষমতার অধীন।"২

প্রথমে চুক্তি সম্পাদন করে রসূলুল্লাহ্ (স) একটা সার্বজনীন নীতি (World order) প্রতিষ্ঠিত করার পথ সুগম করেছিলেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটা নয়া ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। কারণ এ মৈত্রী স্থাপিত হয়েছিল চুক্তিবদ্ধ পক্ষসমূহের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে।

তৎপর মহৎ এবং সীমিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আল্লাহ্ যুদ্ধ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এ আদেশগুলোর মধ্যে কিছু হল ইতিবাচক আর কিছু হল নেতিবাচক। বহিরাক্রমণ ও স্বৈরাচার রোধ করার জন্য যে যুদ্ধ তা হল নেতিবাচক এবং ন্যায়পরায়ণতা ও সাধারণ কল্যাণ সাধনের জন্য যে যুদ্ধ তা হল ইতিবাচক। আল্লাহ্ বলেছেন ঃ "তারা এমন ভাল লোক যে, যদি আমি তাদেরকে দুনিয়াতে ক্ষমতা দান করি তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজ করতে হুকুম করবে এবং অন্যায় হতে ফিরিয়ে রাখবে।"৩

যুদ্ধজয়ের পর কি করণীয়, সে বিষয়েও আল্লাহ্‌র নির্দেশ রয়েছে। যুদ্ধের উদ্দেশ্য সীমিত করা হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মত শুধু দেশ জয় করা বা অন্য দেশকে পঙ্গু করা, ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করা বা বিশ্বের সমস্ত ধন-ভাণ্ডারের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়া, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অধিকারী হওয়া বা অন্য যে কোন উদ্দেশ্য যা মূলত কোন দেশের শক্তি বৃদ্ধির জন্যই করা হয়, তা যুদ্ধের উদ্দেশ্য

www.nagorikpathagar.org

নয়। যুদ্ধের এ উদ্দেশ্যসমূহের দ্বারা কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পায় না। অপরদিকে যুদ্ধের একটা সীমিত ও নির্ধারিত উদ্দেশ্য আছে—আল্লাহ্‌র ইবাদতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা, গরীবকে তার প্রাপ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা, সৎ কাজের হুকুম করা এবং অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করাই হল যুদ্ধের সে উদ্দেশ্য।

প্রথম মহাযুদ্ধেও মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশসমূহ ন্যায় যুদ্ধ ও অন্যায় যুদ্ধের সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টায় ব্রতী হয় এবং নিজেদের লোভ-লালসাকে খর্ব করে যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে সীমিত করার প্রয়াসে 'লীগ অব নেশন্স' গঠন এবং 'কিলগ ব্রিয়াণ্ড প্যাক্ট' করে। তখন এটাকে আমরা শুভ সূচনা বলে ধরে নিয়েছিলাম এবং মনে করেছিলাম যে, যা হোক, শেষ পর্যন্ত বিশ্ব রাজনীতিতে মুহাম্মদ (স)–এর নীতি স্থান পেয়েছে। আমরা এখনও আশা করি যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার পরিণতি হিসেবে পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মূলোচ্ছেদ করে যাবে। আমরা প্রার্থনা করি যে, ইসলাম যে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে, তা থেকে যেন মানব জাতি সঠিক পথের সন্ধান পায় এবং যেসব দুঃখ-দুর্দশা তাদেরকে গ্রাস করেছে, তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একটু সুষ্ঠু সমাধান খুঁজে বের করতে পারে। কারণ মুহাম্মদ (স) মদীনায় য়াহূদী ও পৌত্তলিকদের সাথে যে চুক্তি করেছিলেন, তা ছিল শান্তি প্রতিষ্ঠায় সকলের কল্যাণ ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইতিহাসে প্রথম রাষ্ট্রীয়ভিত্তিক চুক্তি।

তেরশ বছর আগে ইসলামী শরীয়ত এমন এক ব্যবস্থার সূত্রপাত করে গেছে, যার উপাদান হল চুক্তি, মৈত্রী, পারস্পরিক প্রতিশ্রুতি এবং সালিসি। ইসলামী আইনে আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমর্থন করা হয়েছে আক্রমণকারীকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য নয় বরং তাকে ভর্ৎসনা এবং সংশোধন করার জন্য। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "আর যদি তারা শান্তি চায়, তুমিও শান্তি চেয়ো এবং আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর করো।"[৪]

"এবং বিচার করো তাদের মধ্যে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদনুসারে।"[৫]

"যদি মুসলমানদের দুটো দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। তারপরেও যদি তাদের মধ্যকার কেউ অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে সেই দলটির সাথে লড়াই কর—যারা নাকি বাড়াবাড়ি করছে—তারা যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে রুজু হয়। যদি তারা রুজু হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও—ন্যায়বিচার মুতাবিক। তোমরা বিচারে ইনসাফের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে। নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন।"[৬]

www.nagorikpathagar.org

প্রতিশ্রুতি, চুক্তি এবং সন্ধি

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীভিত্তিক যে নীতির ওপর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই নীতি অনুযায়ী বিশ্বের জাতিসমূহ হল : (১) মুসলমান এবং মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক (যিম্মী), (২) মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অমুসলমান (Muahid status) অথবা (৩) মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয়—এমন অমুসলমান--এ তিনটি সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে মুসলিম আইন প্রয়োগ করার জন্য পরবর্তীকালে মুসলিম চিন্তাবিদগণ ব্যাপক ভিত্তিতে অনুরূপ তিনটি শ্রেণী নির্ধারণ করেছেন, যেমন- (১) দারুল ইসলাম (Muslim lands), (২) দারুল সুলেহ্ (Abode of peace) এবং (৩) দারুল হরব (Abode of war or enmity)।

মুসলিম আইনের অধীনে বিশ্বাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন পুরোপুরি বিদ্যমান। মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অমুসলিমদের প্রতি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হয় এবং সন্ধির শর্ত যেরূপই হোক না কেন, তাদের সঙ্গে সদ্ভাব ও মৈত্রী বজায় রাখা হয়। মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয়—এমন অমুসলিমদের মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা হয়—যে দেশে মুসলমানদের ওপর নিয়ত অত্যাচার করা হয় এবং তাদের ধর্ম পালন ও প্রচার করতে দেওয়া হয় না, সেই দেশ ইসলামের শত্রু বলে পরিগণিত ; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হোক বা না হোক। কিন্তু যে দেশে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করা হয় না এবং তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, সেই দেশের বিরুদ্ধে ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করে না। বরং মুসলমানদের সাথে শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করার জন্য তাদের প্রতিও শান্তিপূর্ণ ব্যবহার করা হয়।

ইসলামের মৌলিক নীতি হলো বিনা কারণে শত্রুতা না করা। ধর্মীয় স্বাধীনতা, ধর্ম প্রচার এবং মানুষের অন্যান্য মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ইসলাম শুধু যুদ্ধ করার অনুমতি দেয়। এ সম্পর্কে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। অন্যের সাথে শত্রুতা করা অপরিহার্য হয়ে পড়লে মুসলিম আইনের বিধান হলো—তাদের সাথে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন করা। কেউ কেউ মনে করেন যে, এ ধরনের পরিস্থিতি দেখা দিলে মীমাংসার জন্য ইসলামের মাত্র তিনটি বিকল্প পন্থা আছে, যথা—হয় ইসলাম গ্রহণ, না হয় জিযিয়া কর প্রদান ; আর না হয় যুদ্ধ। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়।

ইসলাম বিজয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু এ তিনটি বিকল্প পন্থা প্রচলিত ছিল, সেহেতু এটাই মুসলিম আইন বলে সমালোচকদের ধারণা। কিন্তু এ ধারণা ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল ব্যাপার হল এই যে, এ তিনটি বিকল্প পন্থা অবলম্বন করার সাথে সাথে রসূলুল্লাহ্ (স) নিজেই অনেক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করেছেন এবং তাঁর উত্তরসূরিগণও অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করেছেন—

www.nagorikpathagar.org

যার মধ্যে এ তিনটি বিকল্প পন্থার কোন একটারও সন্ধান পাওয়া যায় না। জনগণের কল্যাণার্থে যে কোন রকমের চুক্তি বা সন্ধি স্থাপনে মুসলমান ও তাঁদের ইমামগণের অধিকার সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলত না। দৃষ্টান্ত হিসেবে হুদায়বিয়ার সন্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। এ সন্ধিতে এ ধরনের কোন শর্ত আরোপের দাবি ছিল না। বরং এ সন্ধির মধ্যে এমন কতগুলো শর্ত ছিল যার জন্য প্রতিপক্ষেরই সুবিধা হয়েছিল বেশি। এ জন্যই হযরত ওমর (রা) এ সন্ধিকে মুসলমানদের জন্য রীতিমত অবমাননাকর এবং পৌত্তলিকদের কাছে ইসলামকে অনেকটা হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু তবু তিনি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রতি শ্রদ্ধাবশত এ শান্তি চুক্তির শর্তসমূহ মেনে নিয়েছিলেন।

রসূলুল্লাহ্ (স) কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন চুক্তি বা সন্ধি ভাল করে পরীক্ষা করলে আমরা দেখতে পাই যে, তার মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। এ উদ্দেশ্য হলো—স্বাধীনভাবে ধর্মমত প্রচার এবং শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা। বিশ্বাসের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান করাকে রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর বাণীর সাফল্যের পূর্বশর্ত বলে মনে করতেন। সুতরাং এটা অতি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, শান্তি বা মৈত্রী চুক্তির জন্য বোঝাপড়া বা শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম প্রচারে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীকে জিযিয়া প্রদান বা শর্ত আরোপ ইসলামের একমাত্র শর্ত নয়। এটাও অনুরূপ কোন সত্য নয় যে, শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামের নেতৃবৃন্দ বা অনুসারিগণ হয় জিযিয়া প্রদান, না হয় ইসলাম গ্রহণ নীতিকেই একমাত্র ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করবেন।

আমরা যদি বর্তমান ইসলামী জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করি, প্রতিবেশীর সাথে মুসলমানদের এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক অনুধাবন করি এবং তাঁরা যেসব চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করি এবং যদি দেখি যে, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কথামত এসব চুক্তি মুসলমানদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে, তাহলে আমরা অনুধাবন করতে সক্ষম হব যে, সমগ্র মানব জাতি একটা সাধারণ নিরাপত্তা চুক্তির কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রয়েছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, তিনটি শ্রেণীবিভাগের ওপর ইসলামের সম্পর্ক কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা—মুসলমান, মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ অমুসলিম এবং মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয় এমন অমুসলিম। আসমানী বিধান মুতাবিক মুসলমানদের মধ্যকার শান্তি চিরন্তন এবং কেবল ধর্মবিরোধী কাজের ফলেই এ শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। যদি কোন মুসলিম দল অন্য মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে তাহলে সব মুসলমান মিলে আক্রমণকারীর বিরোধিতা করবে যতদিন পর্যন্ত না অন্যায়কারী দল সত্যের পথে আসে এবং সালিসি গ্রহণ করতে রাযী হয়।

www.nagorikpathagar.org

সালিসির মাধ্যমে ন্যায় এবং সাম্য টিকিয়ে রাখতে হবে—শক্তি প্রয়োগ করে নয়। কারণ সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই সালিসির গুরুত্ব নির্ভরশীল। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআানে ঘোষিত হয়েছে ঃ

"যদি মুসলমানদের দুটো দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও। তারপরেও যদি তাদের মধ্যকার কেউ অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি করতে থাকে তাহলে সেই দলটির সাথে লড়াই কর—যারা বাড়াবাড়ি করছে—তারা যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে রুজু হয়। যদি তারা রাযী হয়, তাহলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও—ন্যায়বিচার মুতাবিক। তোমরা বিচারে ইনসাফের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরই ভালবাসেন।"

"মুমিন মুসলমানরা ত ভাই ভাই। সুতরাং তোমরা দুই ভাইয়ের মধ্যে আপস-রফা করিয়ে দাও।"[৭]

বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে এ আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং একে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কোন জাতীয় সীমানা, গোত্রীয় আনুগত্য, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ, ভীতি বা দাসত্ব বা অন্য কোন অবস্থা মুসলমানদের পৃথক করতে পারে না। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ মুসলমানরা এক জাতি।

একজন মুসলমান যে কোন মুসলিম দেশের নাগরিক। আবাসিক নাগরিকদের মত তারও অধিকার রয়েছে এবং সে যেখানেই থাকুক না কেন, মুসলিম আইনে নির্ধারিত কর্তব্যের জন্য সে দায়ী থাকবে। যেমন, একজন প্রাচ্যদেশীয় মুসলমান হজ্জে যাওয়ার পথে মিসরে উপস্থিত হয়েছে। মিসর তখন যুদ্ধে রত। তখন তাকে মিসরবাসীর পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যে, তার নিজের দেশ আক্রান্ত হলে তার যে কর্তব্য ছিল, এখানেও ঠিক সেই কর্তব্য রয়েছে। আবার সে যদি বিপদাপন্ন হয়, তাহলে যে দেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে সেই দেশের যাকাতের টাকার ওপরও তার হক থাকবে। মুসলিম সম্প্রদায় তার নিরাপত্তা বিধান করতে বাধ্য, কারণ দেশ ও জাতি নির্বিশেষে সে একই অধিকার পাওয়ার দাবিদার। ইসলামের দৃষ্টিতে সাদা ও কালো, ক্রীতদাস ও মনিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সম্প্রদায় নির্বিশেষে কোন মুসলমানের মনে এব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

এই ভিত্তিতে পৃথিবীতে শত কোটি মুসলমান একে অন্যের ভাই এবং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র, স্বদেশ ভূমি বা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যের অজুহাতে কোন মুসলমান রাষ্ট্রই অপর মুসলিম রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে না। দৈবক্রমে কোন মুসলিম দেশ যদি এমন পরিস্থিতিতে পড়ে যায়, তাহলে যেসব

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম দেশ এতে সংশ্লিষ্ট নয়, তাদের এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে এবং যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে কুরআনের নির্দেশানুসারে শান্তি স্থাপন করতে হবে।

এ থেকে বোঝা যায় যে, মুসলিম আইনের ব্যক্তি আন্তর্জাতিক এবং এর নির্দেশাবলী সার্বজনীন সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এ নির্দেশ সমভাবে প্রযোজ্য।

ইসলামের এ বিশ্ব-বিধানে কোন একটা মুসলিম রাষ্ট্র বা একজন মুসলমানও যদি একটা অঙ্গীকার করে, তাহলে সমগ্র জগতের মুসলমান এ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়ে যায়। কারণ ইসলামের মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় আছে যেক্ষেত্রে একজন মুসলমানের কর্তৃত্ব সমগ্র মুসলমান সমাজের কর্তৃত্বের সমান। যেমন, আইনের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামাজিক নৈতিকতা সংরক্ষণ। শত্রুকে আশ্রয় দান ও তার নিরাপত্তা বিধানের অঙ্গীকারের অধিকার ইসলাম ব্যক্তিকে (Individual) দিয়ে থাকে। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নির্দেশ মুতাবিক তাঁর অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি সমগ্র ইসলামী সমাজকে সম্মান করতে হবে। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "মুসলমানরা এক এবং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিনীত ব্যক্তিরও প্রতিশ্রুতি দানের অধিকার আছে।"

একজন ক্রীতদাসের দেয়া অঙ্গীকারকেও সম্মান প্রদর্শনের বিধান ইসলামে আছে। আবূ ওবায়দা একবার খলীফা ওমর (রা)-কে লিখে পাঠান যে, একজন ক্রীতদাস ইরাক শহরের অধিবাসিগণকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং এ সম্পর্কে তিনি খলীফার অভিমত জানতে চান। উত্তরে খলীফা ওমর (রা) লিখেন, "আল্লাহ্ প্রতিশ্রুতি পূরণকে মহান কাজ বলে গণ্য করেছেন এবং তুমি প্রতিশ্রুতি পূরণ না করা পর্যন্ত মুসলমান হতে পার না। সুতরাং তাদের প্রতি তোমার প্রতিশ্রুতি পালন কর এবং এ ব্যাপারে সবকিছু তাদের ওপর ছেড়ে দাও।" ঠিক এমনিভাবেই মুসলমানরা একজন মহিলার দেয়া নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতিও পালন করেছিল। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছিলেন, "হে হানির মাতা ! তুমি যাদের আশ্রয় দিয়েছ, আমরাও তাদের আশ্রয় দিলাম।" প্রথমদিকে, মুসলিম আইনবিদগণের মধ্যে অনেকে মুসলমানের পক্ষ থেকে দেয়া ক্রীতদাস অথবা স্ত্রীলোকের প্রতিশ্রুতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন সাপেক্ষ করার পক্ষপাতী ছিলেন। যা হোক, স্বাধীন পুরুষ কর্তৃক দেয়া প্রতিশ্রুতি বিনা শর্তে মেনে নেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত।

মুসলমান ও অমুসলমানদের সম্পর্কে এবার কিছু আলোচনা করা যাক। যারা আগে থেকে মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ আছে, তারা আশ্রয় পাওয়ার বা অন্য যে কোন ধরনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি উপভোগ করতে পারে। আশ্রয় পাওয়ার প্রতিশ্রুতি আধুনিককালে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি বলা চলে। উভয় প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেই পক্ষসমূহের পারস্পরিক স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা থাকে।

www.nagorikpathagar.org

যিম্মী চুক্তি বা আশ্রয় দানের চুক্তি ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলমান নাগরিকদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধান করে। মুসলমানরা অমুসলিমদের অভিভাবকত্ব ও আশ্রয় দানের প্রতিশ্রুতি দেয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে এবং বার্ষিক 'জিযিয়া' কর প্রদানের পরিবর্তে। মুসলমানদের নামে ইসলামের ইতিহাসে 'যিম্মী' কথাটা বেশ কিছুকাল যাবত কিছুটা বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছিল। কারণ যিম্মী কথাটা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হত। যদিও মূলত এ শব্দটা ছিল উন্নততর অর্থবহ। কারণ 'যিম্মী' কথাটির উৎপত্তি ঘটেছে 'যিম্মাত-আল্লাহ্' (God's custody) থেকে। এর দ্বারা সংখ্যালঘুদের পূর্ণ ধর্মীয়, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করার প্রতিশ্রুতি বোঝাত। এ অধিকার ভোগ করার পরিবর্তে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন এবং ন্যায়সঙ্গত একটা 'কর' প্রদান করতে হত—যা দেশরক্ষা খাতে ব্যয় করা হত।

একজন 'যিম্মী' হল একজন মুসলমানের প্রতিবেশী। তারা একে অপরের বন্ধু এবং সহযোগী। তার কোন অধিকারই খর্ব করা হয় না। মুসলিম আদালতে একজন মুসলমান যে বিচার পাওয়ার অধিকারী, সেও তদ্রূপ। তার ওপর অত্যাচার, নির্যাতন বা তাকে অপমান করা বা তাকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্পূর্ণ বেআইনী। মুসলমানদের যেমন ধর্ম আছে তেমনি তারও ধর্ম আছে। তার ধর্ম, অধিকার এবং স্বাধীনতা বিপন্ন হলে মুসলমানদের কর্তব্য হলো তা রক্ষা করা। তার পরিবর্তে আশা করা হয় যে, মুসলমানদের ধর্ম ও নিরাপত্তার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা আছে, এমন কাজ থেকে 'যিম্মী'রা বিরত থাকবে।

প্রথম দিকে মুসলিম বিজেতাগণ যিম্মীদের প্রতি তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন, কারণ যিম্মীরা ছিল 'যিম্মাত-আল্লাহ্'। খালিদ বিন ওয়ালিদ হেমস শহরের খৃস্টানদের তাদের দেয়া 'জিযিয়া' কর ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কারণ তিনি উক্ত শহর বাইজেন্টাইন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমরা তোমাদের কাছ থেকে জিযিয়া কর আদায় করেছিলাম তোমাদের শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে এবং এর পরিবর্তে তোমাদের রক্ষা করব এ প্রতিশ্রুতি দিয়ে। কিন্তু এতে আমরা ব্যর্থ হয়েছি।"[৮] এ ঘটনার পাঁচ শ বছর পরেও দেখা যায়, সুলতান সালাহউদ্দিন যখন ক্রুসেডারদের কাছে পরাভূত হয়ে সিরিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন, তখন তথাকার খৃস্টানদের দেয়া 'জিযিয়া' কর তিনি তাদের ফেরত দিয়েছিলেন। সুতরাং 'জিযিয়া' কর বিজয়ীদের প্রতি বিজিতদের খেসারতস্বরূপ ছিল না। বরং এটা ছিল অধিকার ভোগ করার পরিবর্তে একটা কর্তব্য—স্বয়ংসম্পূর্ণ কাজের ক্ষতি পূরণস্বরূপ।

একবার চুক্তি হয়ে গেলে এবং 'জিযিয়া' কর প্রদান করা হলে আশ্রিতকে (ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায়) মুসলমানদের সঙ্গে সমান অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দেয়া

www.nagorikpathagar.org

হয়। তাছাড়া যে এ কর প্রদান করে, তার আর সামরিক বিভাগে চাকরি করার বা যাকাত দেওয়ার দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু তার যাকাতের টাকা ভোগ করার অধিকার থাকে। কারণ যাকাত জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল গরীবেরই প্রাপ্য। যদি কোন অমুসলিম বা আশ্রিত ব্যক্তি মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য নিজেই নাম তালিকাভুক্ত করে, তাহলে সে যুদ্ধলব্ধ ধনরত্নের সমান অধিকার পাবে এবং জিযিয়া কর প্রদান করা থেকে রেহাই পাবে।

অনেক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কর্তৃক সম্পাদিত চুক্তির মত যিম্মীদের সাথে মুসলমানদের সম্পাদিত চুক্তি মানব ভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বাসের পবিত্রতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। জাতিগত, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিগত সামর্থ্যের পার্থক্যের জন্য যিম্মীর অধিকার বিলুপ্ত হয় না। একজন মুসলমান যেমন জাতিগত পার্থক্য সত্ত্বেও অন্য মুসলমানের সঙ্গে একই রকম অধিকার ভোগ করে, ঠিক তেমনি একজন যিম্মীও মুসলমানদের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করে। যে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে সে সমান অধিকার ও নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। যদি সে তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তবে এর ব্যতিক্রম ঘটে। শরীয়তের বিধান সার্বজনীন এবং সকল মুসলমানকে তা মানতে হবে।

যিম্মীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ছাড়াও মুসলমানরা ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে এ ধরনের নানা রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। যেমন—নিরাপত্তার চুক্তি, আক্রমণ চুক্তি, বন্ধুত্বের চুক্তি, বাণিজ্য চুক্তি, শান্তি রক্ষার চুক্তি, স্বীকৃতির চুক্তি, কূটনৈতিক চুক্তি ইত্যাদি।

মুহাম্মদ (স) তাঁর বাণীর মাধ্যমে যে ভ্রাতৃত্বের পয়গাম দিয়ে গেছেন, তা কেবল মুসলিম দেশ এবং মুসলমানদের মধ্যেই স্থায়ী শক্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে না, সারা বিশ্বেও তা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"শোন হে মানব জাতি ! তোমরা নিজেদের পালনকর্তাকে ভয় কর। তিনি তোমাদেরকে একটি মাত্র প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্য থেকেই তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। সেই দুটি প্রাণী থেকে অসংখ্য পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন। তোমরা সেই আল্লাহ্কে ভয় কর, যার বরাত দিয়ে নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করে থাক।"[৯]

আগেই বলা হয়েছে যে ন্যায়বিচার, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে শান্তি কায়েম ছাড়া যুদ্ধের কোন উদ্দেশ্যই আল্লাহ্র নিকট গ্রহণীয় নয়। যুদ্ধে জয় করার পর বিজয়ী একটি মাত্র অধিকারের মালিক হয়, আর তা হলো আক্রমণ ও অবিচার প্রতিরোধ করা। যুদ্ধান্তে সম্পাদিত কোন চুক্তি যদি স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও মানবাধিকার হরণকারী নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে তা ইসলামের আদর্শ বিরোধী বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ্ বলেন, "তোমরা সেই স্ত্রীলোকটির মত হয়ো না, যে নাকি

www.nagorikpathagar.org

অনেক কষ্ট-ক্লেশ করে কিছু সুতা কাটল। কিন্তু পরে তা টুকরা করে ফেলল। তোমরা নিজেদের শপথকে একদলের ওপরে অন্য দল ভারী হওয়ার জন্যই ব্যবহার করছ ... ।"[১০]

ইসলামে শান্তি চুক্তির অর্থ এ নয় যে, বিজিত জাতিকে চিরদিন অধীনস্থ রাখা, বঞ্চিত রাখা বা তাদেরকে অপমানিত করা। বরং ইসলামে শান্তিচুক্তির অর্থ হচ্ছে শত্রু অথবা বন্ধু উভয়ের জন্যই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাই আল্লাহ্র নির্দেশ। আল্লাহ্ বলেন ঃ "মানুষের দুশমনি যেন তোমাদের অবিচার করতে বাধ্য না করে। হক বিচার কর, কারণ তা পরহিযগারীর নিকটতম।"[১১] পৃথিবীর পুরাতন এবং আধুনিক জাতিসমূহ (মুসলিম অমুসলিম উভয়ই) যদি কুরআনের নির্দেশকে এ ব্যাপারে মেনে চলত, তাহলে যুদ্ধলিপ্সা খর্ব হত এবং বিদ্রোহের কারণসমূহ হত বিদূরিত।

আধুনিক বিশ্বের নেতৃবৃন্দ যখন বলেন, যুদ্ধের উদ্দেশ্য ন্যায়বিচার ও সাম্যের প্রতিষ্ঠা করা এবং স্বৈরাচার দমন করা, তখন তারা মুহাম্মদ (স)-এর বাণীরই প্রতিধ্বনি করেন। অবশ্য তাঁদের এ স্বীকৃতি আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসের শক্তিতে বলীয়ান নয়। আমরা দেখেছি যে, ইসলামী শরীয়ত যুদ্ধকে অনুমোদন করে কেবলমাত্র স্বৈরাচার দমন ও আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। স্বৈরাচার ও আক্রমণ শেষ হলে যুদ্ধও শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র নির্দেশিত ন্যায়বিচার ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। একইভাবে, ভয় ও লোভের তাড়নায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের সত্য পথ অনুসরণ করার জন্য উৎসাহিত করেছেন এবং এ পথেই তাদের বিজয় সুনিশ্চিত করেছেন যদি আল্লাহ্র উদ্দেশ্য সাধন তথা পরোপকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তা করা হয়ে থাকে।

যদি ইউরোপীয় জাতিসমূহ ন্যায় ও সাম্যের জন্য কাজ করে যেত তাহলে ১৮৭০ সালের যুদ্ধ ১৯১৪ সালের যুদ্ধের কারণ হতো না বা ১৯১৪ সালের যুদ্ধ ১৯৩৯ সালের যুদ্ধের কারণ হতো না। এ মোহমুক্তি অবলোকন করার জন্য অনেকেই জীবিত ছিলেন। শঠতা প্রতারণা অপরাধীর বিপদ বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই করে না।

বিশেষ কোন জাতির বা জোটের বদনাম করা এখানে আমার উদ্দেশ্য নয় বা মুসলমানরা কাজ ও কথায় অন্য ধর্মাবলম্বী বা জাতির চেয়ে বেশি সততা দেখিয়েছে, সেটাও দাবি করছি না। বরং খুব কম জাতিই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং সততার সাথে তার আদর্শগুলো মেনে চলেছে—একথা বলাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য। মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, প্রত্যেক চুক্তিই পবিত্র—কারণ তা আল্লাহ্র চোখের সামনে সম্পাদন করা হয় এবং তাঁর নামেই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। সুতরাং এর মধ্যে একটা ধর্মীয় পবিত্রতা

www.nagorikpathagar.org

আছে এবং এখানে কোন শঠতা বা মুনাফিকীর স্থান নেই। খলীফা হওয়ার পর হযরত উসমান (রা) তাঁর কর্মচারী ও গভর্নরকে এক পত্রে লিখেছিলেন ঃ

"নিশ্চয়ই সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্‌র একটা সৎ উদ্দেশ্য আছে। তিনি সৎ জিনিস ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ করেন না। তোমরা সৎ জিনিস গ্রহণ করবে এবং সৎ জিনিস প্রদান করবে। তোমরা তোমাদের বিশ্বাসের ওপর অটল থেকো। তোমরা নীতিভঙ্গকারীদের মধ্যে প্রথম হয়ো না এবং তোমাদের পরবর্তী বংশধরের নিকট তোমরা দুষ্কর্মের সহচর বলে পরিগণিত হয়ো না। তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে এবং অনাথ বা মিত্রদের (যারা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ) প্রতি অত্যাচার থেকে বিরত থাকবে। যারা অত্যাচারী আল্লাহ্ তাদের বিরোধী।"

মুসলমান বা অন্য কেউ মুহাম্মদ (স)-এর নৈতিক আদর্শকে যথাযথভাবে গ্রহণ করছে না বলেই মনে হয়। এ নৈতিক আদর্শ হলো ঃ প্রতিশ্রুতির মর্যাদাকে সবকিছুর উর্ধে স্থান দিতে হবে, যা অবস্থানুসারে ধর্মীয় পবিত্রতারও উর্ধে। বাস্তবিকপক্ষে, শরীয়ত ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির পবিত্রতাকে মুসলিম ভ্রাতৃত্বের উর্ধে স্থান দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হলে অমুসলিমরা রক্তের বদলে অর্থ বা 'দিয়া'র দাবিদার অথচ মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ নয় এমন মুসলমানদের আত্মীয়বর্গ এর দাবিদার নয়।

মুসলমানদের আশ্রিত কোন অমুসলমানের বিরুদ্ধে কোন মুসলমানকে সাহায্য করা শরীয়ত বিরোধী—এমন কি তা ধর্মীয় ব্যাপার হলেও। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ "তবে তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তোমরা সাহায্য করবে। কিন্তু যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে, তাদের মুকাবিলায় নয়।"[১২]

এ বাণীর প্রবক্তা নিজেই ওয়াদার প্রতি শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন তিনি হুদায়বিয়াতে ইবনে সোহায়েল ইবনে আমরের সাথে সন্ধির কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সন্ধির শর্তাবলী যখন ঠিক করা হচ্ছিল, তখন সোহায়েলের পুত্র আবূ জান্দালকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সম্মুখে হাযির করা হয়। এর আগে জান্দাল রসূলুল্লাহ্ (স)-এর শত্রু বাহিনীর দল থেকে পালিয়ে এসেছিল। শত্রুবাহিনীর অধিনায়ক সোহায়েল (জান্দালের পিতা) শত্রু বাহিনীর পক্ষ থেকে রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে সন্ধির আলোচনা করছিল। সোহায়েল তার পুত্র আবূ জান্দালকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে এবং পুত্রের গলা ধরে বলে, "হে মুহাম্মদ, আপনার এবং আমার মধ্যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই ফায়সালা হয়ে গেছে।" অন্য কথায়, আবূ জান্দাল রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই সন্ধির শর্তাবলী চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। উত্তরে মুহাম্মদ (স) বলেন, "আপনি সত্য কথাই বলেছেন।" আবূ জান্দাল

www.nagorikpathagar.org

তখন চিৎকার করে বলে, "হে মুসলমানগণ ! আমার ধর্ম বর্জন করে আমাকে কি আবার পৌত্তলিকদের মাঝে ফিরে যেতে হবে ?" কিন্তু এতে তার কোন অসুবিধা হল না। সন্ধির শর্তগুলো তখনও লেখা বা সীলমোহর করা না হলেও সন্ধির শর্ত মুতাবিক রসূলুল্লাহ্ (স) তাকে ফিরিয়ে দিলেন। যেহেতু তিনি তাঁর মত দিয়েছেন সুতরাং তা পুনর্বিবেচনা বা সে ব্যাপারে ইতস্তত করার প্রশ্ন উঠেনি। এভাবেই সন্ধির মর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর অনুসারীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও একজন মুসলমানকে অবিশ্বাসীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে আর একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং তা আমাদের সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। তা হলো, প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা ভঙ্গ না করা। ইসলাম যেমন কোন ওয়াদা গোপন বা প্রকাশ্যভাবে ভঙ্গ করা নিষিদ্ধ করেছে, তেমনি বস্তুগত বা অপার্থিব কোন আমানত খেয়ানত করাকেও নিষিদ্ধ করেছে।

সামরিক শক্তি বেশি আছে বলে স্বীয় সংকীর্ণ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যদি অপর পক্ষের প্রতিকূলে চুক্তির খেলাপ করা হয় বা শঠতার সাথে চুক্তির অপব্যাখ্যা করা হয় তাহলে আর চুক্তি করে লাভ কি ?

তদুপরি, চুক্তির কার্যকারিতা স্থগিত রাখা কেবল তখনই সমর্থন করা যায়, যখন মুসলমানদের কল্যাণ অপরপক্ষ কর্তৃক ক্ষুণ্ন হয় এবং তাদের অশুভ চক্রান্ত সন্দেহাতীতভাবে ধরা পড়ে। এক্ষেত্রে চুক্তি প্রত্যাহার করা সমর্থনযোগ্য। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "যদি কোন কওমের তরফ থেকে খিয়ানত বা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আশংকা দেখা দেয় তাহলে আপনি তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি ফিরিয়ে দিন। যেন এ বিষয়ে আপনি এবং তারা বরাবর বলে গণ্য হতে পারেন। একথা সত্য সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্‌তা'আলা বিশ্বাসভঙ্গকারীদের মোটেই ভালবাসেন না।"[১৩] কিন্তু চুক্তি ভঙ্গ করতে গিয়ে মুসলমানরা কোন চাতুর্যের আশ্রয় নিতে পারবে না বা হঠাৎ করে চুক্তি ভঙ্গ করে প্রতিপক্ষকে অবাক করে দিতে পারবে না। এর জন্য পূর্বাহ্নে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দিতে হবে এবং কিছু সময়ের জন্য দেরি করতে হবে। শরীয়তের এ নীতির মধ্যে নৈতিকতা ও আইনের সমন্বয় ঘটেছে এবং আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে এ আদর্শ স্বীকৃত। রসূলুল্লাহ্ (স) এবং আদর্শ খলীফাগণ এ মর্মে তাঁদের গভর্নর ও সেনাধ্যক্ষগণকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, যুদ্ধ ঘোষণা করার আগে তাঁরা যেন প্রতিপক্ষকে সাবধান করে দেয়। ইসলামের আইনবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, শত্রুদের পূর্বাহ্নেই সতর্ক করে দিতে হবে, কিসের জন্য চুক্তি নাকচ হয়ে যাচ্ছে তার কারণ জানাতে হবে এবং তাদের এও জানাতে হবে যে, তাদের ধন-সম্পদ

www.nagorikpathagar.org

হস্তগত করা, তাদের অধিকার হরণ করা বা তাদের জীবন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা মুসলমানদের উদ্দেশ্য নয়। এ ব্যাপারে প্রতিপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণের অনুরোধ জানানো হয়েছে এজন্য যে, তারা হয়ত সাড়া দিতে পারে এবং এর ফলে যুদ্ধ এড়ানো যেতে পারে। সতর্ক করার আগে যুদ্ধ ঘোষণা করার অর্থ হলো আল্লাহ্‌র অভিশাপ ডেকে আনা। কিন্তু যখন সকল যুক্তিই ব্যর্থ হয় এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেয়, তখন এবং কেবলমাত্র তখনই আল্লাহ্ নির্দেশ দেন ঃ "সুতরাং তোমরা হতাশ হয়ো না, আর তাদের সন্ধি করার জন্য আহ্বান জানাবে না। তোমরাই ত জয়ী হবে ...।"[১৪]

ন্যায়যুদ্ধ (Legitimate war)

মুসলমানরা যখন নির্যাতিত ও অত্যাচারিত হচ্ছিল এবং সন্ধির শর্তানুসারে (এ সন্ধি স্থাপিত হয় মুসলমান ও তাদের প্রতিবেশী অন্যান্য ধর্মাবলম্বীর সাথে) য়াছরীবে (মদীনা) গিয়ে আশ্রয় নেয়া থেকেও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিল, তখনই তারা আল্লাহ্‌র নিকট যুদ্ধ করার অনুমতি চেয়েছিল এবং তা পেয়েছিল।

এখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে যুদ্ধের কারণ, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয় ও উদ্দেশ্যসমূহ বিচার-বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ থেকে আমরা আধুনিক জগতের অনেক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাব এবং সেই সঙ্গে চিন্তার খোরাক ও পথচলারও নির্দেশ পাব।

যুদ্ধের ব্যাপারে অনুমোদন দিতে গিয়ে ইসলাম যুদ্ধের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করেছে, তা হলো—স্বৈরাচার দমন, ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা, ধর্মীয় ব্যাপারে নির্যাতন দমন এবং সকল মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ।

বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন উপাসনালয়ে সকল মানুষের স্বাধীনতার কথা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন—সন্ন্যাসীদের মঠ, খৃস্টানদের গীর্জা, য়াহূদীদের সিনাগগ এবং মুসলমানদের মসজিদ। অন্য সকল ধর্মের এবং ইসলামের ধর্মীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য ইসলাম আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ অনুমোদন করেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "গোলযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর আল্লাহ্‌র দীন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা লড়াই কর। যদি তারা থামে, তাহলে জালিমদের ছাড়া অন্যের উপরে কড়াকড়ি করা ঠিক হবে না।"[১৫]

এ পবিত্র আয়াতের মধ্যে ইসলামের যে শিক্ষা বিধৃত, তা অন্য সকল আদর্শকে ছাড়িয়ে গেছে। কারণ এ বাণী যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে সীমিত করেছে। স্বৈরাচার দমনের সাথে সাথে এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনাকারী তাদের অত্যাচার বন্ধ করলে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বৈরাচারী শাসক স্বৈরাচারমূলক

www.nagorikpathagar.org

কার্যকলাপ অব্যাহত না রাখলে, জনগণকে তাদের ধর্ম ত্যাগ করার জন্য বাধ্য না করলে ইসলাম যুদ্ধের পুনর্ঘোষণার অনুমতি দেয় না। অত্যাচার, বলপূর্বক ধর্মান্তরিতকরণ এবং ধর্মীয় মতামতের স্বাধীনতা হরণ করাকে আল্লাহ্ খুন করার চেয়েও বেশি জঘন্য কাজ বলে মনে করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আপনার কাছে তারা সম্মানিত মাসগুলোতে লড়াইয়ের বিষয়ে জানতে চায়। আপনি বলে দিন—এ সময়ে লড়াই করা কঠিন গুনাহের কাজ। তাছাড়া আল্লাহ্র পথে এগুতে কাউকে বাধা দেওয়া, আর তাঁকে অমান্য করা, পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দেওয়া, সেখানে যারা থাকে তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দেওয়া—আল্লাহ্র কাছে তার চাইতেও অনেক বড় গুনাহ্। গোলযোগ সৃষ্টি করা খুনাখুনির চাইতেও কঠিন গুনাহের কাজ। তারা তোমাদের সাথে চিরকাল লড়াই-ঝগড়া করতে থাকবে যতক্ষণ না তোমাদের 'দীন' থেকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নিতে পারবে—যদি সাধ্যে কুলায়।"[১৬]

আমরা যদি যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কুরআনের আয়াতসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করি এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনের যুদ্ধাভিযানসমূহ একে একে পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে, ইসলাম শুধু আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ অনুমোদন করেছে এবং এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। স্থানাভাবে এখানে সমস্ত ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া সম্ভব নয়। তবে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর জীবনী আলোচনা করলে পর্যবেক্ষক ইসলামে ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের বহু ব্যাখ্যা এবং কি পরিস্থিতিতে ইসলাম আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধের অনুমতি দেয় তার বিস্তারিত বিবরণ জানতে পারবেন, যেখানেই হোক পৌত্তলিকদের সাথে যুদ্ধ পরিচালনা, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ, তাদের শাস্তি বিধান ও বন্দী করার অনুমতি ইসলাম যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে যুদ্ধের পরিণতি, যুদ্ধ ঘোষণার কারণ নয়। আল্লাহ্র ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ

"হে নবী, আপনি শুনুন! আপনি কাফির ও মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করুন। তাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। নিকৃষ্ট বাসস্থান।"[১৭]

"কাফির সরদারদের সাথে তোমরা সবাই লড়াই কর, কারণ তাদের প্রতিজ্ঞা বলবত থাকেনি, হয়ত এভাবেই তারা বিরত হবে। তোমরা সেই কওমের সাথে কেন লড়াই করছ না, যারা নিজেদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। তাছাড়া রসূলকে নির্বাসন দেওয়ার জন্য তৎপর হয়েছে, তারাই যে তোমাদের ওপরে প্রথম বাড়াবাড়ি করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় করছ ? অথচ আল্লাহ্তা'আলাই ত একমাত্র সত্তা—যাঁকে ভয় করা উচিত। অবশ্য তোমরা যদি সত্যিকার মুমিন হয়েই থাক, তাদের সাথে তোমরা

www.nagorikpathagar.org

লড়াই কর। আল্লাহ্ তোমাদের দ্বারাই ওদের শায়েস্তা করবেন, ওদের ওপরে জয়লাভে তিনি সাহায্য করবেন। আর মুমিনদের অন্তরে আরোগ্য দান করবেন। তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ্ নিবিষ্ট হবেন যাকে খুশী তার ওপর। আল্লাহ্ সবই জানেন আর তিনি বড়ই কুশলী।"[১৮]

"গোলযোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর আল্লাহ্র 'দীন' কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তাদের সাথে তোমরা লড়াই কর।"[১৯]

"যেখানে পাও তাদের হত্যা কর, তাদের তাড়িয়ে দাও ঠিক যেমন তারা তোমাদের তাড়িয়েছে।"[২০]

"হে নবী, আপনি শুনুন! মুমিনদের লড়াইয়ের জন্য উৎসাহ দিতে থাকুন। যদি তোমাদের মধ্যে বিশজন ধৈর্যশীল লোক থাকে, তাহলে তারা দুশ' লোককে কাবু করতে পারবে। আর যদি তোমাদের মধ্যে একশ' জন তেমন লোক থাকে, তাহলে তারা কাফিরদের মধ্যে এক হাজার লোককে পরাস্ত করতে সক্ষম হবে। কারণ তারা ত এমন কওম—যারা কিছুই ভাবতে ও বুঝতে পারে না।"[২১]

"তোমরাও মুশরিকদের সাথে ব্যাপকভাবে লড়াই কর। ঠিক তারা যেমন তোমাদের সাথে সর্বাত্মক লড়াই করেছে। তোমরা সবাই জেনে রাখ ঃ আল্লাহ্ পাক পরহিযগারদের সাথেই রয়েছেন—একথা সুনিশ্চিত।"[২২]

এ আয়াতগুলো পাঠ করলে পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, একটা যুদ্ধাবস্থা ধরে নেয়া হয়েছে। একটা সন্তোষজনক পরিণতি না হওয়া পর্যন্ত একাগ্রতা এবং ধৈর্যের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য এতে উৎসাহিত করা হয়েছে। এতে বিশ্বাসীদের শান্তি ও নিরাপত্তা এবং ধর্মের অবাধ অধিকার অর্জন, পৌত্তলিকদের পরাস্ত করে নির্যাতন ও ধর্মদ্রোহিতার অবসান ঘটানোর কথা বলা হয়েছে এবং আশা করা হয়েছে যে, সর্বশেষে আক্রমণকারীরা আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে।

শরীয়তের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল, দৈনন্দিন জীবনে তার কার্যকর ব্যবহার। এটা ধর্মীয় ও মানবীয়—এ উভয় সমস্যার মুকাবিলা করে এবং একটা কার্যকরী সমাধান এনে দেয়। যতদিন পর্যন্ত উদার প্রচার ব্যবস্থায় আক্রমণ এবং স্বৈরাচার বিলুপ্ত না হবে এবং যতদিন ইসলামের শত্রুরা ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে সৎ প্রতিবেশীসুলভ মনোভাব গ্রহণ না করবে ও অশুভ শক্তির দৌরাত্ম্য না কমবে ততদিন পর্যন্ত যুদ্ধই হবে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ইসলাম এদের সামনে কোনদিন করজোড়ে দাঁড়ায়নি বরং কঠিন প্রত্যয় ও সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে যেমন দাঁড়িয়েছিলেন মুহাম্মদ (স) তাঁর বাণী প্রচার করার সময়। রসূলুল্লাহ্ (স) আজীবন এ ধারণা পোষণ করতেন যে, বিশ্বাসীরা প্রস্তুত থাকবে—"তাদের সাথে মুকাবিলার জন্য তোমরা যতটা পার তৈরী থাকবে, শক্তিশালী ও শিক্ষিত ঘোড়া আর জরুরী সরঞ্জাম নিয়ে।

www.nagorikpathagar.org

এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন, তোমাদের দুশমন ও তাদের বাদ দিয়ে আর যারা রয়েছে, তারাও যেন তোমাদেরকে সমীহ করে চলে।[২৩] কে না জানে যে, সমর প্রস্তুতিই যুদ্ধ বন্ধ করতে ও শান্তি স্থাপনে বেশি সহায়ক।"

মুসলমানদের যখন যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প ছিল না এবং তাদের জন্য যখন যুদ্ধ করার অবস্থা স্পষ্ট দেখা দিয়েছিল, তখনই তাদের যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয় এবং সেই যুদ্ধেরও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শান্তি স্থাপন। আল্লাহ্ বলেন, "যদি তারা থামে, তাহলে জালিমদের ছাড়া অন্যের ওপর কড়াকড়ি করা ঠিক হবে না।"[২৪] "এবং তারা যদি আপস-রফার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে আপনিও সে জন্য এগিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ্র ওপরেই ভরসা রাখুন।"[২৫]

অনুমোদিত এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ একবার স্থিরীকৃত হলে এবং তার কারণগুলো নিরূপিত হলে যুদ্ধ সমগ্র জনসাধারণের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে অনুমোদিত যুদ্ধ অর্থাৎ জিহাদ[২৬] প্রত্যেকটা মুসলিম নারী-পুরুষের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এ কর্তব্য পালন করার অর্থ ইসলামের নির্দেশকে অন্তরের সাথে গ্রহণ করা এবং সকল জাতির যিনি অধিকর্তা সেই আল্লাহ্র আদেশ পালন করা।

এ ধরনের সংকটকালেও ইসলামের বাঞ্ছিত ও উদার মনোভাবের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণ ও পলায়ন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ধৈর্য, সাহস, দৃঢ় সংকল্প, ত্যাগ ও অকাতরে জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করা এমন কি শত্রু দ্বারা দেশ অধিকৃত হলে দেশ ত্যাগ করার নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন ! তোমরা যখন যুদ্ধের ময়দানে কাফিরদের মুকাবিলা করবে, তখন তোমরা কিছুতেই ওদের সামনে নিজেদের পিঠ ফেরাবে না। কিন্তু যদি কেউ লড়াইয়ের দিন পেছনে সরে যায়, দুশমনকে ঘায়েল করার কৌশল হিসেবে কিংবা নিজে সৈন্যদলে শামিল হওয়ার জন্য তাহলে অন্য কথা। এ ছাড়া যে কেউ পিঠ ফেরাবে, সে ত আল্লাহ্র গজব নিয়েই ফিরল। তার ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সে ত বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান।[২৭]

যে যুদ্ধ পবিত্র বিশ্বাস রক্ষার্থে ন্যায়সঙ্গত হিসেবে ঘোষিত হয়নি, সে রকম যুদ্ধ হতে পলায়নের জন্য কারো ওপর আল্লাহ্র অভিশাপ এবং শাস্তি আপতিত হবে না ; এবং কোন অন্যায় যুদ্ধের জন্যও ইসলাম মানুষের ওপর কড়াকড়ি আরোপ করে না। আর ন্যায়যুদ্ধে কড়াকড়ি আরোপের অর্থ হলো, বিশ্বাসীদের ধৈর্যশীল হওয়ার শিক্ষা প্রদান—যাতে অবিশ্বাসীরা তাদের পিছু হটাতে সমর্থ না হয়, এমন কি তাদের শক্তি দশগুণ বেশি হলেও না। কিন্তু বিশ্বাসীরা যদি যুদ্ধে যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহমুক্ত হতে না পারে, তাহলে তাদের কাছ থেকে এরকম দৃঢ়তা আশা করা যায় না। সুতরাং তাদের নিশ্চিত হতে হবে যে, তারা নিজেদের ধর্ম রক্ষার জন্যই আক্রমণকারীর

www.nagorikpathagar.org

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে। একটা আক্রমণাত্মক যুদ্ধে যোদ্ধাকে সহনশীল ও দৃঢ়চেতা হতে বাধ্য করা যায় না এবং সে রকম যুদ্ধে দশ জনের বিরুদ্ধে একজন কখনও লড়তে পারে না। কারণ সে জানে যে, সে আক্রমণকারী এবং তারাই যুদ্ধের অগ্নি প্রজ্বলিত করেছে। আত্মোৎসর্গের প্রেরণা ছাড়া তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারে না।

পবিত্র কুরআনের কতিপয় আয়াতে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে, সাহসের সাথে শাহাদত বরণ করার কথা বলা হয়েছে, শত্রুকে পদানত রাখার পদ্ধতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, তাদের অতর্কিত আক্রমণের কথা বলা হয়েছে, তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার এবং তাদের জন্য অপেক্ষা করতে বলা হয়েছে, এবং শত্রুর আগমন ও নির্গমন পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। আবার কতিপয় আয়াতে জীবন ও ধন-সম্পদ উৎসর্গ করার এবং আল্লাহ্‌র বিজয়ের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। এসব উপদেশ একমাত্র ইসলামের আইন মুতাবিক অনুমোদিত আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

তাহলে কুরআন, সুন্নাহ্‌ রসূলুল্লাহ্‌ (স)-এর জীবনী এবং তার জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে এতদসংক্রান্ত যেসব নির্দেশ, উপদেশ ও দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম আক্রমণাত্মক যুদ্ধের বা পার্থিব সম্পদ আহরণের জন্য যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। কারণ আল্লাহ্‌র ধন-সম্পদের অভাব নেই। যুদ্ধের অপরাপর উদ্দেশ্যের জন্য জনমত সংগঠন করার অর্থ হলো—অন্য সম্প্রদায় বা লোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার, কোন অধিকর্তা বা সামাজিক শ্রেণীকে অপরের চেয়ে পদমর্যাদায় উন্নত করা, অর্থনৈতিক বা সামরিক উদ্দেশ্যে কোন দেশের সীমানা বৃদ্ধি করা, কাঁচামাল এবং বাজার সৃষ্টি করা অথবা সংস্কৃতির দিক থেকে পশ্চাদপদ জাতিকে গ্রাস করা। এসব উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানবিক এবং সার্বজনীন। ইসলামের শুভাশিস সমগ্র মানব জাতির জন্য এবং এর দৃষ্টিভঙ্গি হল উদার। সমগ্র মানব জাতিকে ইসলাম এক পরিবারভুক্ত মনে করে এবং সকলকে অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করতে চায়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ কেবল মুসলমানদের আল্লাহ্‌ নন—তিনি সমগ্র বিশ্বের। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

"শোন হে মানব জাতি ! আমি তোমাদের সবাইকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে পয়দা করেছি। আর আমিই তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী-গোত্র ও পরিবার হিসেবে বানিয়েছি—যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার, জানতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত মর্যাদাসম্পন্ন, যে নাকি তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহিযগার ... ।"[২৮]

www.nagorikpathagar.org

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন ! যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করবে, সালাম দেবে, তাকে এমন কথা বলো না ঃ তুমি মুসলমান নও। সে ত পার্থিব সুযোগ-সুবিধার আশা রাখে–।"[২৯]

"আল্লাহ্ পাক তাদের সাথে তোমাদেরকে সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে বারণ করেন নি, যারা তোমাদের সাথে দীন ইসলাম নিয়ে লড়াই-ঝগড়া করেনি, আর তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়নি—নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন। আল্লাহ্পাক শুধু তাদের সাথেই বন্ধুত্ব করতে বারণ করেছেন, যারা দীন ইসলাম নিয়ে তোমাদের সাথে লড়াই-ঝগড়া করেছে, আর তোমাদের দেশ ত্যাগে বাধ্য করেছে, তোমাদের নির্বাসনে সাহায্য করেছে। আর যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে—তারাই ত জালিম দল।"[৩০]

সুতরাং তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে আলাদা থাকে, তোমাদের সাথে লড়াই না করে আর তোমাদের কাছে আপস-রফার প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপরে তোমাদের কোনও সুযোগ করে দেন নি।"[৩১]

স্থায়ী শান্তি রক্ষার প্রতিশ্রুতিতে ইসলাম প্রতিবেশী ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে যে কোন রকমের চুক্তি সম্পাদনে সদা প্রস্তুত। এর জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহকে অবশ্যই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এবং চুক্তির প্রতি বিশ্বস্ত থাকার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাতে হবে। স্থায়ী শান্তি রক্ষার ব্যাপারে এমন প্রগাঢ় ইচ্ছা যেখানে বর্তমান, সেখানে ইসলাম কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য ব্যতিব্যস্ত হয় না বা অতর্কিতে আক্রমণও করে না। বরং এক্ষেত্রে ইসলাম যুক্তিসহকারে প্রতিপক্ষের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরে, তাকে সতর্ক করে এবং এ অপ্রীতিকর পরিস্থিতি কিভাবে এড়ানো যায় তার উপায় নির্দেশ করে। তবুও সে যদি তা মানতে রাযী না হয়, অবাধ্য হয়, শত্রুতা করতে থাকে এবং যুদ্ধ ছাড়া আর কিছুই গ্রহণ না করে, তাহলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। আর যুদ্ধ শুরু হলে কেবলমাত্র তখনই মুসলমানদের গভীর আগ্রহ, সাহস, ধৈর্য এবং দৃঢ়তা প্রদর্শনের, জীবন ও সম্পদ উৎসর্গের ও নির্বাসন গ্রহণের এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহে উল্লিখিত সবকিছু করতে বলা হয়।

কতিপয় লোক, বিশেষ করে ইসলাম-বিরোধীরা এসব নির্দেশের বিকৃত অর্থ করে মুহাম্মদ (স)-এর বাণীকে নিষ্ঠুর আদর্শ বলে কলঙ্ক লেপন করতে চায়। তাদের মতে, মুহাম্মদ (স)-এর এ বাণী অন্য লোকের ওপর আধিপত্য বিস্তার এবং তাদের সম্পদ ও জীবন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করার জন্য যুদ্ধকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অত্যন্ত স্পষ্ট। যুদ্ধ পরিত্যাগ করা থেকেই এর শুরু। কিন্তু যখন মুসলমানদের ওপর নির্যাতন শুরু হয় এবং শক্তিকে শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা না হলে তাদের টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ে, কেবল তখনই দেওয়া হয় যুদ্ধের

www.nagorikpathagar.org

অনুমতি। আর যুদ্ধ শুরু হলে জয়ী হওয়ার জন্য যা প্রয়োজন, তা করারও নির্দেশ রয়েছে। এ ধরনের যুদ্ধে ইসলামের জয় হলে ঘোষিত হয় ঃ "ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় কোনও জবরদস্তি নেই। সুষ্ঠু সঠিক পথ—গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে বাতলে দেয়া হলো"।[৩২]

ইসলাম একটা সফলকাম আদর্শ, কারণ এটা সত্যকে সত্য দিয়ে, সরলতা দিয়ে এবং বিশ্বস্ততা দিয়ে মুকাবিলা করে। কিন্তু মন্দ লোকের মন্দ কাজ যারা মেনে নেয় তারা অন্যায় সমর্থন করে—নিজের পরাজয়ই শুধু গ্রহণ করে না, তারা নিজেদের করে তোলে দুর্বলতর।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তাদের জান বের করার জন্য যখন ফিরিশতারা হাযির হয়, তখন তারা জিজ্ঞেস করে ঃ তোমরা কি হালে ছিলে ? জওয়াবে তারা বলে ঃ আমরা ত এ দুনিয়ার বুকে বড়ই অসহায় ছিলাম। তখন ফিরিশতারা বলে ঃ আল্লাহ্‌র দুনিয়া কি অনেক বড় ছিল না ? তোমাদের উচিত ছিল দেশ ত্যাগ করে কোথাও চলে যাওয়া। আসলে তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম। সে যে বড়ই নিকৃষ্ট বাসস্থান। কিন্তু পুরুষ ও নারীদের মধ্যে যারা দুর্বল আর শিশুদের কথা আলাদা—কোনও রকম ব্যবস্থা করার মত সঙ্গতি যাদের ছিল না, পথ-ঘাট যাদের জানা ছিল না। সুতরাং তাদের জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমা আশা করা যায়। আল্লাহ্ বড়ই করুণাময় এবং ক্ষমাশীল।"[৩৩]

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে আক্রমণ পরিচালনা করতে নিরুৎসাহিত করেছে। কারণ আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "দেখ ! আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের মোটেই পছন্দ করেন না।"[৩৪] কিন্তু এ আদেশও ঘোষিত হয়েছে যে, অপমানিত ও বঞ্চিত জীবন যাপন করার চেয়ে সাময়িকভাবে স্বদেশ ত্যাগ করে নির্বাসন গ্রহণ অথবা শাহাদত বরণ শ্রেয়।

অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে যুদ্ধ

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী যুদ্ধকে অনুমোদন করেছে দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের অত্যাচার প্রতিহত করার (এ আক্রমণ ব্যক্তি বিশেষ বা দলের বিরুদ্ধে হতে পারে) এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

স্বৈরাচার দমন করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স) এবং তাঁর উত্তরাধিকারগণ জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে তিনি অন্যায় আক্রমণ ও স্বৈরাচার প্রতিরোধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালান। ইসলাম-পূর্ব যুগে সম্পাদিত চুক্তি 'হিল্‌ফ আল-ফুজুল' পরবর্তীকালে অনুমোদন করার সময় তিনি ঘোষণা করেন,

www.nagorikpathagar.org

"তখন যদি আমি মুসলমান থাকতাম তবুও আমি এ চুক্তির শর্ত মেনে চল্‌তাম। কারণ এটা ইসলামের শক্তিকেই জোরদার করত।" ইসলাম ধর্ম এবং ইসলামী রাষ্ট্র—উভয়েই বিশ্বাসীদের মজলুমের পক্ষ অবলম্বন করে জালিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য বলে ধরে নিতে নির্দেশ দিয়েছে—তা সে অত্যাচারী ব্যক্তি বিশেষ হোক বা দল হোক বা মুসলমান বা অমুসলমান যাই হোক না কেন। কারণ, মুহাম্মদ (স) যখন যুবক ছিলেন এবং নুবূওতও পাননি, তখনই তিনি 'হিল্‌ফ–আল–ফুজুল' প্রতিজ্ঞা-পত্র সম্পাদিত করেছিলেন।

আক্রান্ত দেশের সাথে কোন চুক্তি থাকুক বা না থাকুক, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অত্যাচারীকে প্রতিহত করার জন্য ইসলামী রাষ্ট্র যে কোন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রবর্গের সাথে মিত্রতা করতে পারে।

ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে জাতিসংঘ সনদ মেনে নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের দিক থেকে কোন আপত্তি নেই। জাতিসংঘ সনদের উদ্দেশ্য যেহেতু কল্যাণ সাধন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, অত্যাচার এবং আক্রমণ প্রতিরোধ, সেহেতু মুসলমানরা এ সনদ প্রশংসনীয় বলেই গ্রহণ করে। কারণ এর নির্দেশসমূহ 'হিল্‌ফ-আল-ফুজুল'-এর নির্দেশের অনুরূপ যার ওপর ইসলাম অধিক গুরুত্ব আরোপ করে।

অপরপক্ষে, স্বৈরাচারকে স্থায়ী করার জন্য, পরাজিতকে দাবিয়ে রাখার জন্য এবং দুর্বলকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করার জন্য যদি প্যাক্ট বা চুক্তি করা হয় তাহলে তা ইসলামের চোখে অপরাধ ও আক্রমণের হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং তা ইসলামী রীতির বিরোধী। কারণ ইসলাম পরোপকার এবং আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রচার করে। পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, "তোমরা নেক কাজ এবং তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা কর। গুনাহের কাজ এবং জুলুমবাজির ব্যাপারে কোনও রকম সহযোগিতা করবে না।"[৩৫]

ইসলামের মতে প্রত্যেকটা কাজকে বিচার করা হয় তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য দিয়ে। কোন কাজের ভাল-মন্দ নির্ভর করে তার উদ্দেশ্যের ওপর। কোন কাজ তখনই মর্যাদা অর্জন করতে পারে যদি তা কল্যাণ ও ন্যায়বিচারের পথকে প্রশস্ত করে এবং এটাই সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহ্‌র নির্দেশ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ

"তিনিই ত আসমানকে উঁচুতে তুলে রেখেছেন এবং তিনিই তুলাদণ্ড স্থির করে দিয়েছেন।"[৩৬]

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন! তোমরা সবাই ন্যায়বিচারের ওপরেই কায়েম থাকো—আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে সাক্ষ্যদাতা হিসেবে। হোক না তা নিজেদের ব্যাপার, কিংবা মা-বাবা অথবা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপার।"[৩৭]

www.nagorikpathagar.org

ন্যায়বিচার যে শরীয়তের একমাত্র উদ্দেশ্য সে ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্ এবং ইজমা একমত। সুতরাং মজলুমের পক্ষ সমর্থনে যুদ্ধ করা এমন একটা কাজ যার জন্য আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যদি ইসলাম যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সেই যুদ্ধের উদ্দেশ্য যদি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং স্বৈরাচার দমন হয় তাহলে তা শরীয়তসম্মত।

যুদ্ধের অনুমোদনের জন্য এটাই একমাত্র সাধারণ কারণ, যা আক্রমণের শর্ত থেকে মুক্ত। অন্য কথায় এ ধরনের যুদ্ধ আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ নাও হতে পারে।

এ প্রেক্ষিতে যে কোন ইসলামী রাষ্ট্র জাতিসংঘের মত সংস্থায় যোগদান করতে পারে ; কেননা তা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে ন্যায়বিচার কায়েম রাখতে চায়। স্বৈরাচার দমন ও দুর্বলের প্রতি ন্যায়বিচার করার জন্য এ ধরনের কোন জোট গঠনের অধিকার ইসলামী রাষ্ট্রের রয়েছে।

স্বভাবতই ইসলামী রাষ্ট্র কোন যুদ্ধে জড়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হওয়া চলে যে, যুদ্ধটা অত্যাচারিতদের রক্ষার জন্য, ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সংশ্লিষ্ট মুসলিম রাষ্ট্র সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলে আকাঙ্ক্ষিত ইনসাফ অর্জনে ব্যাঘাত ঘটবে।

অন্য একটা চুক্তি, যার মধ্যে ইসলামের প্রাথমিক যুগে অত্যাচারিতদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করার শর্ত ছিল, তা হলো হুদায়বিয়ার সন্ধি। রসূলুল্লাহ্ (স) এবং কুরায়শদের মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। এ সন্ধির চতুর্থ শর্তে তৃতীয় পক্ষকে তার ইচ্ছামত যে কোন পক্ষ অবলম্বন করার অনুমতি দেয়া হয়েছিল। তদনুসারে বনূ-বকরগণ কুরায়শদের এবং খোজাগণ নবী করীম (স)-এর পক্ষ অবলম্বন করেছিল। জাহিলিয়া যুগে 'খোজা' গোত্র আবদুল মুত্তালিবের মিত্র ছিল এবং তারা নবীর পিতামহের সাথে সম্পাদিত চুক্তি পুনরুজ্জীবিত বা নবায়ন করতে চেয়েছিল।

রসূলুল্লাহ্ (স) সেই মৈত্রী চুক্তির শর্তসমূহ অনুমোদন করে তার সাথে আরও দুটো শর্ত আরোপ করেছিলেন। প্রথমত, 'খোজা'রা যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তাদের সাহায্য করা হবে না এবং দ্বিতীয়ত, 'খোজা'রা অত্যাচারিত হলে তাদের সাহায্য করতে হবে। উভয় পক্ষকে এক কপি এ চুক্তির অনুলিপি দেয়া হয়েছিল।

এ সময় 'খোজা'রা ইসলাম গ্রহণ করেনি এবং তারা তখনও পৌত্তলিক ছিল। মুহাম্মদ (স)-এর সাথে তাদের একমাত্র বন্ধন ছিল যে, তারা ইসলাম-পূর্ব যুগে মুহাম্মদ (স)-এর পিতামহের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। ভাল ও মন্দ কাজের মধ্যে কোন পার্থক্য এ চুক্তির মধ্যে ছিল না। সেজন্য রসূলুল্লাহ্ (স) উল্লিখিত শর্তগুলো আরোপ করেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রথমত, তিনি এমন কোন চুক্তি অনুমোদন করতে চান নি, যার মধ্যে অনুল্লিখিত সহযোগিতার শর্ত বিদ্যমান। সে সহযোগিতা হয়ত এমন কাজের জন্য হতে পারে যা বেআইনী। কারণ তিনি ছিলেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্‌র দূত। সেজন্য তিনি চুক্তির মধ্যে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিলেন যে, তাঁর মিত্র 'খোজা'রা যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তিনি তাদের সাহায্য করবেন না।

দ্বিতীয়ত, কোন পৌত্তলিক যদি অত্যাচারিত হয়, তাহলে তিনি সাহায্য করা থেকে বিরত হবেন না।

তৃতীয়ত, তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল অত্যাচারিতকে তিনি সাহায্য করবেন।

চতুর্থত, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের শর্তই হল 'রক্ষা' ; তা সে আত্মরক্ষাই হোক বা অন্য কোন আক্রান্ত ব্যক্তি বা জাতিকে রক্ষা করাই হোক। কোন চুক্তি না থাকলে মুসলিম রাষ্ট্র নিরপেক্ষ থাকতে পারে। কিন্তু কোন চুক্তি থাকলে, যেমন ছিল 'খোজা'দের সাথে, তাকে অবশ্যই চুক্তির শর্ত পালন করতে হবে।

ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে অন্য ধর্মসমূহও যুদ্ধের বিস্তার রোধ ও তার ধ্বংসলীলা পরিহার করার জন্য সচেষ্ট ছিল। কিন্তু মানুষের অসংশোধনযোগ্য স্বভাবের কাছে সেসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

খৃস্টধর্ম যুদ্ধকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করার পরামর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। যীশুখৃস্ট (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেছেন ঃ "আমি তোমাদের বলছি ঃ তোমরা মন্দ কাজকে বাধা দিও না। কেউ যদি তোমাদের ডান গালে চড় মারে, তাহলে তার দিকে তোমাদের বাম গালও এগিয়ে দিও ... কেউ যদি তোমাদের এক মাইল যেতে বাধ্য করে, তোমরা তার সাথে দু'মাইল যেও।"[৩৮] যাঁরা মনে করেন যে যুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে পরিহার করা যায়, তাদের জন্যেও যীশু সেন্ট পিটারকে যে কথা বলেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য ঃ "তোমরা তলোয়ার যথাস্থানে রেখে দাও। কারণ যারা তলোয়ার ধারণ করে তারা তলোয়ারের সাথেই ধ্বংস হয়ে যায়।"[৩৯] বাইবেলের এসব বাণী থেকে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টধর্ম শুধু যুদ্ধই নিষিদ্ধ করেনি, অস্ত্র-শস্ত্র বহন করাও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। খৃস্টধর্ম প্রচারের গোড়ার দিকে পশ্চিমা যাজক সম্প্রদায় যুদ্ধের মনোভাব এমন কি আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধও পরিহার করতে চেয়েছিল।

কিন্তু পরবর্তীকালে খৃস্টানরা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সীমান্তে উপনীত হয়। প্রাচ্যের খৃস্টানরা (বাইজেন্টাইনে) সম্রাট, রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মীয় প্রধানের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে মনে করত না। রাষ্ট্রপ্রধানই জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। বাইজেন্টাইনরা এভাবে পাশ্চাত্যের যাজক সম্প্রদায় থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি অনুসরণ করে।

www.nagorikpathagar.org

যীশুখৃস্ট কর্তৃক নিষিদ্ধ যুদ্ধকে তারা শুধু অনুমোদন করে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করার জন্য মধ্যপন্থা অবলম্বন করার বা অত্যাচারিতকে রক্ষা করার (যা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে) পন্থা অবলম্বন করেই ক্ষান্ত হলো না, যুদ্ধ ঘোষণার সমস্ত ক্ষমতাও তারা সম্রাটের হাতে ন্যস্ত করল। এভাবে যুদ্ধ ঘোষণার অনুমতি ও ক্ষমতা লাভ করে সম্রাট রাষ্ট্রের স্বার্থে যে কোন সময় যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারতেন।

খৃস্টধর্ম আবির্ভাবের প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত তা মানব জাতির জন্য কল্যাণ ও আশীর্বাদস্বরূপ ছিল। কারণ, যীশু তাঁর অনুসরণকারীদের মন্দ কাজ করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দিয়েছিলেন। ফলে রক্তপাত, লুটতরাজ, যুদ্ধরত জাতি কর্তৃক নিরপেক্ষ জাতির জাহাজ লুণ্ঠন, আক্রমণ ও স্বৈরাচার ইত্যাদি বন্ধ ছিল। খৃস্টধর্ম যদিও তার সংগ্রাম অনেক দিন যাবত অব্যাহত রেখেছিল, তবু পরবর্তীকালে খৃস্টানরা যীশুর ধর্ম ও 'মিশন' ভুলে গিয়ে লোভ, উচ্চাশা এবং স্বার্থ চিন্তায় আক্রমণাত্মক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। ফলে মধ্যযুগের শেষভাগ থেকে শুরু করে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই যুদ্ধের দাবানলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমগ্র মানব জাতি হতে থাকে ক্ষত-বিক্ষত।

তবু শেষ পর্যন্ত এক শ্রেণীর খৃস্টান ছিল, যারা তাদের বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে রেখেছিল এবং যুদ্ধ ও সেনাদল গঠন করা রোধ করতে গিয়ে তারা জীবন উৎসর্গ করেছিল। আর একদল খৃস্টান ছিল যারা ধর্মীয় আদেশ ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এ দল ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ এবং নিষিদ্ধ যুদ্ধের মধ্যে একটা তফাত অনুধাবনে প্রয়াস পেয়েছিল এবং ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল। তাদের মতে, শাসক কর্তৃক সদুদ্দেশ্যে ঘোষিত যুদ্ধই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। এর মধ্যে শাসকের কোন স্বার্থপরতা বা দস্যুসুলভ মনোভাব থাকবে না। ন্যায়পরায়ণ খৃস্টানদের দৃষ্টিতে যুদ্ধ ছিল বৈধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করার একটা উপায় মাত্র। তাদের মতে, অহমিকা থেকে সে যুদ্ধের সূত্রপাত হবে না এবং ন্যায়বিচার ও দয়ার আবরণে তা ঢাকা থাকবে।

এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে আলোচনা ও বিতর্কের পর খৃস্টানরা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল তা যদি আমরা পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব যে, অনুমোদিত যুদ্ধের জন্য ধর্মপ্রাণ খৃস্টানদের ধারণা মুসলমানদের ধারণার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় মতেই অত্যাচারিতের সাহায্যার্থে যুদ্ধই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধ। যা হোক, অশুভ ইচ্ছাকে প্রতিহত করে এবং মানুষের জীবনকে রক্ষা করে বিশ্বে শান্তি, ইনসাফ ও দয়া প্রতিষ্ঠা করা এবং সেই সাথে মানব সমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলার জন্য একটা মজবুত ভিত্তি কেবল ইসলামী আদর্শই দিতে পারে। মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত মহৎ এবং বাস্তব আদর্শের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও বিশ্ব শান্তির ভিত্তির প্রতিষ্ঠা করতে দূরদর্শী ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের ইসলামী শরীয়তের

www.nagorikpathagar.org

বিধানকেই আঁকড়ে ধরতে হবে এবং একমাত্র এ পন্থায়ই মানুষের নিজস্ব উদ্দেশ্য ও উচ্চাশা পূর্ণ করার যে কোন যুদ্ধ পরিহার করে জাতিসংঘের চুক্তিসমূহ বাস্তবায়িত করা সম্ভব। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "তোমাদের মধ্যে এমন একদল থাকা উচিত যারা ভালাইয়ের দিকে ডাকবে, নেক কাজের আদেশ দেবে, অন্যায় অত্যাচার থেকে ফিরিয়ে রাখবে।"[৪০]

আন্তর্জাতিক চুক্তির ক্ষেত্রে আমরা কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াত থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে পারি ঃ "যদি মুসলমানদের মধ্যে দুটো দল নিজেদের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া শুরু করে দেয়, তাহলে তাদের মধ্যে ফায়সালা করে দাও। তার পরেও যদি তাদের মধ্যকার কেউ অন্যের ওপরে বাড়াবাড়ি করতে থাকে, তাহলে সেই দলটির সাথে লড়াই কর যারা নাকি বাড়াবাড়ি করছে—তারা যতক্ষণ না আল্লাহ্‌র হুকুমের দিকে রুজু হয়। যদি তারা রুজু হয়, তা হলে তাদের মধ্যে আপস করিয়ে দাও—ন্যায়বিচার মুতাবিক। তোমরা ইনসাফের দিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ন্যায়বিচারকদেরই ভালবাসেন।"[৪১]

বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহ্‌র এই নির্দেশ নিঃসন্দেহে সকল মানুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এ প্রেক্ষিতে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহ প্যাক্ট করতে পারে। এ অবস্থাকে জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রাম করতে পারে এবং যারা এটাকে অমান্য করে, তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে।

অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থনে ঘোষিত যুদ্ধে কোন জাগতিক ইচ্ছা বা জাতীয় উচ্চাভিলাষ থাকে না এবং ঈর্ষা ও ঘৃণার বশবর্তী হয়ে কোন প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা সেখানে কার্যকর নয়। এ ধরনের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো সত্যের প্রতিষ্ঠা এবং মিথ্যার উচ্ছেদ। বাহ্যত হয়ত দেখা যাবে যে, এটা এক পক্ষের বিরুদ্ধে তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এ হস্তক্ষেপ হল আত্মরক্ষা এবং দুর্বলকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়াস। আমরা যদি মানব সংহতিকে প্রগতির ভিত্তি এবং ইনসাফকে মানব সংহতির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, তাহলে দেখব যে, আক্রমণকারীর বিরুদ্ধাচরণ করার অর্থ হলো ন্যায়বিচার, শান্তি ও প্রগতির বাধা মুক্ত করা। এ ধরনের কাজ শিক্ষা-সংস্কৃতি সংরক্ষণের সাথে তুলনীয়। একদিক দিয়ে এ ধরনের কাজের মাধ্যমে আক্রমণকারীকেও রক্ষা করা বোঝায়। কারণ এতে করে তাকে তার নিজের ধ্বংসের হাত থেকেও বিরত রাখা হয়।

যুক্তি দেখানো যেতে পারে যে, এ ধরনের কাজ অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ বোঝায় এবং এর দ্বারা ইসলামী রাষ্ট্রের আক্রমণাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করাও বোঝাতে পারে। এও বলা যেতে পারে যে, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের পক্ষে শুধু নিজের ব্যাপারে ব্যাপৃত

www.nagorikpathagar.org

থাকা উচিত। কিন্তু এ সত্য এড়িয়ে যাওয়ার কোন উপায় নেই যে, অত্যাচারিতের অধিকার যখন ক্ষুণ্ন হতে থাকে তখন হস্তক্ষেপ অনিবার্য না হয়ে পারে না।

ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহ 'লীগ অব নেশন্স'[৪২] গঠন করার তেরশ বছর পূর্বে 'হিলফ-আল-ফুজুল' গঠিত এবং 'খোজা'দের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। লীগ অব নেশন্স যেসব শর্ত চুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল তেরশ বছর আগেই ইসলাম তা সম্পাদন করেছিল। তা হলো, অত্যাচারিতকে সাহায্য করার যৌথ হস্তক্ষেপের মাধ্যমে যৌথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং মিথ্যার বিনাশ সাধন করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করা।

পরিশেষে বলা যায়, কোন কাজের প্রকৃত মূল্যায়নের মাপকাঠি হচ্ছে সেই কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। কারণ উদ্দেশ্যই কোন কাজকে ভাল বা মন্দ করতে পারে। বস্তুত মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশ্বাস ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে সত্য উপলব্ধি ও আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূরণের জন্য যখন কোন ইসলামী রাষ্ট্র কোন কাজে হস্তক্ষেপ করে, তখন তার পরিণতি যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ালেও সে বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর ছাড়া কিছুই হবে না।

যুদ্ধের নিয়মাবলী ও শিষ্টাচার

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী যখন প্রথম প্রচারিত হয়, তখন যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল সমাজের সাধারণ নিয়ম। মানুষের মনে ও তাদের সাম্প্রদায়িক জীবনে তা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইসলামের ইতিহাস শুরু হয় যুদ্ধকে শুধু বেআইনী ঘোষণা করে নয়—আক্রমণ প্রতিহত করা ও অত্যাচারিতকে রক্ষা করার মধ্যে যুদ্ধকে সীমাবদ্ধ রাখার দ্বারাও। এভাবে ইসলাম যুদ্ধের উদ্দেশ্যকে সীমিত করেছিল এ আদেশ জারি করে যে, শত্রুপক্ষ শান্তি স্থাপনে সম্মত হলে যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে এবং চুক্তির শর্ত পালনকে কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকারের উপরে স্থান দিতে হবে। যুদ্ধ-বিগ্রহ হ্রাস এবং তার বিভীষিকা দূর করার জন্য যুদ্ধ করা ছাড়াও নানাবিধ কারণ, ওয়াদা ও আইনের দ্বারাও যুদ্ধকে সীমিত করা হয়েছিল। তদুপরি যুদ্ধকালীন অবস্থায় যুদ্ধরত পক্ষসমূহ কি কি নিয়ম ও শিষ্টাচার পালন করবে তাও ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

যুদ্ধের সহজাত ও সুস্পষ্ট অপকার চিহ্নিত হওয়ার দরুনই মুহাম্মদ (স)-এর বাণী যথার্থ আচরণের নিয়মাবলী প্রণয়নের মাধ্যমে যুদ্ধ সীমিত করেছিল। আক্রমণ প্রতিহত করার এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ—এ বক্তব্যে যুদ্ধকে অনুমোদন করলেও যথার্থ ও স্থায়ী চুক্তির ক্ষেত্রে তা যুদ্ধকে পরিহার করার ক্ষেত্রেও প্রস্তুত করেছে। একই উদ্দেশ্যে ইসলাম যুদ্ধকালীন সময়ে যুদ্ধরত পক্ষসমূহের অবশ্য পালনীয় বিশেষ নিয়মাবলীও নির্ধারণ করে দিয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

মুসলমান ও অন্যান্য লোকের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিলে প্রতিপক্ষকে সর্বাগ্রে সাবধান করে দেওয়া মুসলমানদের কর্তব্য এবং প্রতিপক্ষ যদি আলাপ-আলোচনা করতে চায় তবে তাদের সময়ও দিতে হবে। কোন কোন আইনবিদ এ বিরতির সময়টাকে আধুনিক কালের আলটিমেটাম বা 'চরম পত্রের' সাথে তুলনা করেছেন। এ বিরতির সময়টা যথেষ্ট হওয়া প্রয়োজন, যেন প্রতিপক্ষ তার দেশের সর্বস্তরের লোকদের অবহিত করতে পারে। এ ধরনের আচরণ বর্তমান কালের আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

আজকাল কোন কোন রাষ্ট্র শত্রুকে পূর্বে সতর্ক না করেই অতর্কিতে আক্রমণ করাকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। আক্রমণেচ্ছু রাষ্ট্রের যুদ্ধের প্রস্তুতি এত গোপনে গ্রহণ করে যে, প্রতিপক্ষ এর কিছুই জানতে পারে না এবং সব সময় শান্তির ভান করে শত্রুর ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়ে তাদেরকে হতচকিত করে দেয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে যুদ্ধের উদ্দেশ্য প্রায়ই প্রকাশ করা হয় না। আধুনিক সভ্যতার ধ্বজাধারীরা প্রতারণায় এত বেশি পারদর্শী হয়ে উঠেছে যে, মানবেতিহাসে তা অভূতপূর্ব। তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এমন সব প্রতারণামূলক চুক্তি সম্পাদন করে যা প্রতিপক্ষকে তাদের নিজেদের নিরাপত্তায় আগ্রহী রাখে অথচ নিরাপত্তার এ প্রতিশ্রুতি নিছক ভাওতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ধরনের চুক্তি সম্পাদনের উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে বেসামাল করে সফলতা অর্জন।

এটা একটা নতুন যুদ্ধ-রীতি অথবা যথার্থভাবে বলতে গেলে, এটা হলো পুরাতন নীতির অপব্যবহার। ইসলামের কাছে এর চেয়ে বেশি অগ্রহণীয় আর কিছুই নেই এবং মুসলিম আইনের অনুশাসনসমূহ এ ধরনের আচরণ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। যারা এ ধরনের আচরণের আশ্রয় নেয় তারা অপরাধী বলে গণ্য এবং তাদের জন্য আল্লাহ্র অভিশাপ অবশ্য প্রাপ্য।

আলোচনা ব্যর্থ হলে, আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়ার পরও ইসলামী শরীয়ত শত্রুর ওপর আধুনিক রাষ্ট্রসমূহের মত অতর্কিতে আক্রমণ অনুমোদন করে না। ইসলাম ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং যুদ্ধের সময় মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসকারী শত্রু-নাগরিকের বাড়ি-ঘরের পবিত্রতাও ক্ষুণ্ন করে না। শরীয়তে স্পষ্ট বিধান রয়েছে যে, মুসলমান তথা বিদেশী শত্রু-নাগরিকেরও কতগুলো অধিকার রয়েছে এবং যুদ্ধের অজুহাতে তা লংঘন করা যায় না, যদিও তারা এমন এক দেশে বাস করে, যে দেশ তাদের আসল দেশের শত্রু কর্তৃক শাসিত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার করা যাবে না, তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত বা তাদের জীবনও বিপন্ন করা যাবে না, তাদের আসল দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার বন্দোবস্ত না করা পর্যন্ত তাদের জীবন ও ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

তাদেরকে নিজ দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার পর কেবল তাদের প্রতি যুদ্ধের সময়কার শত্রুসুলভ আচরণ করা যাবে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দাও। যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র কালাম না শুনতে পারছে। তারপর তাকে নিরাপদ শান্তিপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দাও।"[৪৪]

শত্রু নাগরিকের তথা মুসতামিনের অধিকার রক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছে। বাস্তবিকপক্ষে, মুসলিম আইনবিদগণ এ মত পোষণ করেন যে, প্রতিকূল অবস্থায় সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্যতা যাতে নাকচ হয়ে না যায়, সে জন্য কোন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান যেন শত্রু-নাগরিকের অধিকার ভোগ করার ব্যাপারে কোন সময়-সীমা নির্ধারণ না করেন। মুসলিম ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যে, শত্রু-নাগরিকদের নিজ দেশের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ চরম অবস্থায় পৌঁছানোর পরও তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেছে। অবশ্য তাদের প্রবাসী দেশের আইন-কানুন মেনে চলতে হবে, তাদের আচরণ শালীন হতে হবে এবং প্রবাসী রাষ্ট্রের নাগরিককে ক্ষতি করার জন্য তাদেরকে ষড়যন্ত্রমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

যুদ্ধকালীন অবস্থায় শত্রু-নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধানের ক্ষেত্রে যে সম্পর্ক ইসলাম স্থাপন করেছে তার ভিত্তি হলো সাম্য এবং ইনসাফ। গভীরভাবে চিন্তা করলে এটাই কি ধরা পড়ে না যে, সাম্য এবং ইনসাফের অভাবই যুদ্ধের কারণ ?

শরণার্থীদের প্রতি মুসলমানদের সদয় ব্যবহারের অনেক ঘটনার মধ্যে মুতাজিলা সম্প্রদায়ের নেতা ওয়াসিল ইবনে আতা একটা চমৎকার ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। ওয়াসিল একবার তাঁর কতিপয় বন্ধুসহ খারেজীদের (মুসলমানদের একটি সম্প্রদায়) হাতে ধরা পড়ে। খারেজীরা ধর্মীয় অনুশাসন অনমনীয়ভাবে পালন করে এবং তাদের চিন্তাধারাকে চরম বলে গণ্য করা হয়। মারাত্মক অসুবিধা এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে অনুমান করে খারেজীদের সাথে আলোচনা করার জন্য ওয়াসিল তাঁর বন্ধুদের অনুমতি চান। খারেজীরা ওয়াসিল ও তাঁর বন্ধুদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। উত্তরে ওয়াসিল বলেন যে, তাঁরা পৌত্তলিক এবং তাঁরা আশ্রয়প্রার্থী। তাঁরা আল্লাহ্‌র কালাম ও তাঁর ওয়াদা সম্পর্কে জানতে ইচ্ছুক। খারেজীরা তখন তাদের মতবাদ সম্পর্কে তাদের শিক্ষা দেয় এবং পরে বলে, "বন্ধু হিসেবে তোমরা আমাদের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ কর কারণ তোমরা আমাদের ভাই।" এ কথার উত্তরে ওয়াসিল বলেন, "একথা তোমরা বলার কে ? কারণ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন, মুশরিকদের মধ্যে যদি কেউ তোমাদের আশ্রয় চায়, তাহলে তাকে আশ্রয় দাও— যতক্ষণ পর্যন্ত সে আল্লাহ্‌র কালাম না শুনতে পারছে। তারপরে তাকে নিরাপদ

www.nagorikpathagar.org

শান্তিপূর্ণ স্থানে পৌঁছে দাও।[৪৫] সুতরাং আমাদের নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দাও।" একথা শোনার পর খারেজীরা তাদের অনুরোধ গ্রহণ করে এবং তাদেরকে প্রহরা দিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়।

এ ঘটনায় দেখা যায়, যারা আশ্রয় চেয়েছিল তাদেরকে কিভাবে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কোন গুণগ্রাহীর মতে, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের যে কর্তব্য, আশ্রয়প্রার্থীর কর্তব্য তার চয়ে অনেক বেশি।

মুহাম্মদ (স)-এর নীতিমালার মধ্যে যুদ্ধ সম্পর্কীয় আচরণের একটা মহৎ আদর্শ দেখতে পাওয়া যায়। তা হলো যুদ্ধের বিস্তার রোধ এবং নিরস্ত্র নাগরিকের ওপর কোন অত্যাচার না করা। বৃদ্ধ, কিশোর, স্ত্রীলোক, পঙ্গু, সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-করা ব্যক্তি, শ্রমিক, কৃষক, ব্যবসায়ী, অন্য কথায় যাদের আজকাল সাধারণ নাগরিক বলা হয় তাদের হত্যা না করার জন্য এ আইনে নির্দেশ রয়েছে। সাধারণ নাগরিককে হত্যা করা বেআইনী। যুদ্ধের ভয়াবহতা ও বিভীষিকা থেকে সাধারণ নাগরিককে রক্ষা করার জন্য শরীয়ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং যুদ্ধরত বাহিনীর মধ্যেই যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সীমাবদ্ধ রাখতে বলেছে। এমন কি আইনবিদগণ একথাও বলেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদলের মধ্যে যুদ্ধের ফলে সাধারণ লোক মারা যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিরতি করতে হবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পাইকারী হারে বোমাবর্ষণের ফলে অসংখ্য সাধারণ লোকের মৃত্যুর কথা আমরা যদি চিন্তা করি, তাহলে যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আচরণের ইসলামী নীতির যথার্থতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হব।

বর্তমান যুগে কি মানব জীবনের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাবোধ খুঁজে পাওয়া যাবে ? আধুনিক সমরনীতিতে শুধু অস্ত্রধারণকারীর জন্যই কি অস্ত্র ব্যবহার করা হয় ? চেঙ্গিস খানের সময় মঙ্গোলরা এবং তার উত্তরাধিকাররা যুদ্ধ নীতিতে যে বর্বরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল, তার সাথে আজকের সমরবাজদের পার্থক্য কোথায় ? চেঙ্গিস খানের বর্বরতা ও ধ্বংসলীলার চিহ্ন আজও পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি।

বর্তমান যুগের বিমান ও গোলন্দাজ বাহিনীর বোমা ও গোলাবর্ষণে সাধারণ নাগরিকের ওপর যে পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়, তা সাড়ে সাতশ বছর পূর্বে মঙ্গোলদের অনুসৃত পদ্ধতি অপেক্ষা ভয়াবহ। অবাধ বোমা বর্ষণের ফলে বর্তমান যুগে যে সব পবিত্র স্থান ধ্বংস করা হয়েছে, তার তুলনা বিরল। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের সমরনীতির তীব্র প্রতিবাদ করে এবং দুর্বল বা শক্তিশালী, পরাজিত বা জয়ী নির্বিশেষে সমস্ত ইসলামী রাষ্ট্রকে এ ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়। মুসলিম আইনবিদগণ পাইকারী ধ্বংস ও হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষে অভিমত দিলেও ইসলামী রাষ্ট্রের যে এ ধরনের ঘটনার সূত্রপাত ঘটানো উচিত নয়,

www.nagorikpathagar.org

সে বিষয়ে তাঁরা একমত। যারা প্রতিশোধ নেওয়ার পক্ষপাতী, তারা আল্লাহ্‌র নিম্নলিখিত আদেশের আশ্রয় গ্রহণ করে, "এবং কেউ যদি তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তোমরাও তার ওপর আক্রমণ কর, যেমন সে তোমাদের ওপর করেছে।"[৪৬] এবং "অন্যায়ের প্রতিশোধ ঠিক ততটুকুই। কিন্তু যে কেউ মাফ করে দেবে, আপস করবে তার পারিশ্রমিক ত আল্লাহ্‌র দরবারেই রয়েছে।"[৪৭] পবিত্র কুরআনের এ আয়াত ও অন্যান্য আয়াতে একথা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্য হলো শত্রুকে সতর্ক করা এবং এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের বাধ্য করা। "কিন্তু যে কেউ মাফ করে দেবে, আপস করবে তার পারিশ্রমিক ত আল্লাহ্‌র দরবারেই রয়েছে"—এ কথার দ্বারা প্রতিহিংসামূলক কাজের প্রতিশোধ গ্রহণ না করার কথাই বলা হয়েছে। যদিও এক্ষেত্রে দয়া যথার্থ আচরণের বিরোধী।[৪৮]

বর্তমান যুগে যারা যুদ্ধ করে বেসামরিক লোককে পাইকারীভাবে হত্যা করে, বাড়ি-ঘর, ধন-সম্পত্তি, শহর ও গ্রাম জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দেয় এবং এভাবে প্রতিপক্ষকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করে, তারা যদি মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর অনুমোদিত যুদ্ধের আচরণসমূহ গ্রহণ করত তবে কতই না উত্তম হত।

যারা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত রাইফেল দিয়ে যুদ্ধ করে—সেই যুদ্ধরত বেদুইনদের ওপর যেসব আধুনিক সভ্য জাতি বিমান থেকে বোমা ও গোলাবর্ষণ করে এবং চারণ ভূমিতে চলমান উট ও ভেড়া এবং তাঁবুর ওপর মেশিনগান ব্যবহার করে, তারা এ ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ কোথায় পেয়েছে ?

বস্তুত আজ আল্লাহ্‌র কথা যীশু, মূসা ও মুহাম্মদ (স)-এর প্রচারিত ধর্মের নীতি স্মরণ করার এবং যুদ্ধের ধ্বংসলীলা সীমিত রাখার জন্য যুদ্ধনীতি প্রণয়ন করার সময় এসেছে। যুদ্ধ সম্পর্কে মুহাম্মদ (স) যে আচরণ বিধি প্রবর্তন করে গেছেন, তার সমকক্ষ নীতি আমরা আর কোথায় পাব ? এ নীতি হলো আল্লাহ্‌র বাণীকে মহীয়ান করে তোলা, বিকৃত বা ধ্বংস করা নয়। আর আল্লাহ্‌র বাণী সত্য, ন্যায়বিচার ও সাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং সমগ্র মানুষের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য।

যুদ্ধ সম্পর্কীয় এ নীতি মানবতা ও দয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। এতে মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দেওয়া হয়েছে তারা যেন প্রতিপক্ষকে উপোস রেখে বা জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যথা—ঔষধপত্র এবং কাপড়-চোপড়ের সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে তাদেরকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য না করে।

আধুনিক যুদ্ধাভিযান বড় নির্মম। সেনাবাহিনী পশ্চাদপসরণের সময়ও পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করে এবং এতে তাদের শত্রু ও মিত্র উভয়ই মারা যায়। শরীয়ত এ ধরনের নীতি কোন অবস্থাতেই সমর্থন করে না। নাগরিকদের বাড়ি-ঘর ও ধন-

www.nagorikpathagar.org

সম্পত্তির ওপর এ ধরনের বর্বরোচিত হামলার কথা অগ্রসররত বা পশ্চাদপসরণকারী মুসলিম সেনাবাহিনী কোনদিন কল্পনাও করতে পারে না। ইসলাম ধর্মে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, অগ্রসররত বা পশ্চাদপসরণকারী সৈন্যবাহিনী যেন পথিমধ্যে গাছপালা পুড়িয়ে বা কেটে না ফেলে এবং বেসামরিক লোককে তাদের জীবন ধারণের উপায় থেকে বঞ্চিত না করে।

মুসলিম আইনবিদগণ একমত যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধরত পৌত্তলিক যোদ্ধাকে হত্যা করা অনুমোদনযোগ্য। মতের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এ ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য পোষণ করেন যে, যেসব শিশু ও স্ত্রীলোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না, তাদের হত্যা করা বে-আইনী। এ থেকে যে কেউ ধরে নিতে পারেন যে, যেসব লোক যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তারা, বেসামরিক লোকের ক্ষতি করা এবং দালান-কোঠা ও শস্যক্ষেত্র ধ্বংস করা ইসলামী শরীয়ত মুতাবিক বেআইনী।

রাবাহ্ ইবনে রাবিয়াহ[৪৯] বর্ণনা করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাথে যুদ্ধে যাওয়ার পথে তাঁরা একজন রমণীর লাশ দেখতে পান। সেই লাশের নিকট দাঁড়িয়ে রসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করেন, "তাঁকে হত্যা করা উচিত হয়নি।" তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁর একজন সঙ্গীকে খালিদ বিন ওয়ালিদের নিকট এক নির্দেশ দিয়ে পাঠান। এ নির্দেশ ছিল কোন শিশু, স্ত্রীলোক এবং মজদুরকে যেন হত্যা না করা হয়। তাছাড়া, রসূলুল্লাহ্ (স) জীবনে কোন পশুকেও হত্যা করেছেন বলে জানা যায়নি।

মালিক[৫০] বর্ণনা করেছেন যে, খলীফা হযরত আবূ বকর (রা) একবার বলেছিলেন, "তোমরা যদি এমন কোন লোকের সম্মুখীন হও যারা দাবি করে যে তারা আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত তবে তারা যা করতে চায় তা করার জন্য তাদেরকে ছেড়ে দাও এবং কোন স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধকে হত্যা করো না।"

যায়দ বিন ওহাব[৫১] একবার ওমর ইবনে আল-খাত্তাবের নিকট থেকে একটা নির্দেশ পেয়েছিলেন। তা ছিল, "বাড়াবাড়ি বা প্রতারণা করো না অথবা শিশুকে হত্যা করো না। কৃষকদের সাথে কোন কিছু করার সময় আল্লাহ্‌কে ভয় করো।" হযরত ওমর আরও বলেন, "বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও শিশুকে হত্যা করো না ; যুদ্ধ চলাকালীন সময়েও এসব হত্যা থেকে বিরত থাকবে।"

ইমাম ইবনে রুশদ বলেন[৫২] যে, আবূ বকর গাছ কেটে ফেলা বা ঘর-বাড়ি ধ্বংস করার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্‌র নবীর মতের বিরুদ্ধে যাওয়া আবূ বকরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি জানতেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স) বনূ নাদির গোত্রের খেজুর গাছগুলো কেটে দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে আইনবিদগণ ব্যাখ্যা করেন যে, এ বিশেষ গোত্রের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ কারণের জন্যই তা করা হয়েছিল। এ ঘটনা পবিত্র কুরআনে 'আল-হাশর' অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

এ ঘটনার পর থেকে মুসলমানরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানে বিরত থাকে। বনূ-নাদিরদের ঘটনা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিশদ বিবরণ দেয়া হয়নি, অন্য প্রসঙ্গে সামান্য উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। অনুরূপভাবে বনূ কুরায়জাদের ঘটনাটি উল্লেখ করা হয়েছে পবিত্র কুরআনের 'আল-আহযাব' অধ্যায়ের নিম্নলিখিত আয়াতটিতে ঃ

"আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা তাদের সাহায্য করেছিল, তাদেরকে দুর্গ হতে নামিয়ে দিল আর তাদের মনে তোমাদের প্রতি ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাদের এক দলকে তোমরা হত্যা করতে লাগলে, আরেক দলকে বন্দী করে নিলে। আর তোমাদের তিনি উত্তরাধিকারী করলেন—তাদের জমি-জমা, তাদের বাড়ি-ঘর, তাদের ধন-সম্পদ এমন কি সে সব জমি-জমার ওপরে যেখানে তোমরা পৌঁছাওনি। আল্লাহ্‌তা'আলাই ত সকল বিষয়ে শক্তির একমাত্র অধিকারী।"[৫৩]

বন্দীকে হত্যা করার বা ক্রীতদাসে পরিণত করার কোন নির্দেশ কুরআনে নেই। রসূলুল্লাহ্ (স) কোন বন্দীকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছেন এমন কোন ঘটনার কথাও উল্লেখ নেই। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানকে মাত্র দুটো বিকল্প পন্থা (কোন তৃতীয় পন্থা নয়) অবলম্বন করার আদেশ দিয়েছে। তা হলো—দয়া বা মুক্তিপণ। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "তোমরা যখন যথেষ্ট পরিমাণে তাদের রক্তপাত করে মারবে, তখন তাদের বেশ শক্ত করেই বাঁধবে। তার পরেই হয় তাদের বিনা ক্ষতিপূরণে কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় করে ছেড়ে দাও, যতক্ষণ না যুদ্ধবাজরা অস্ত্র সংবরণ করে।"[৫৪] ইবনে রুশদ বলেন যে, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবিগণ সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, "বন্দীকে হত্যা করা বে-আইনী।"[৫৫]

মুসলিম আইনের সাধারণ নিয়মানুসারে আত্মসমর্পণকারী সৈনিক বা বেসামরিক লোককে হত্যা করা বেআইনী। মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধান যদি এ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাহলে তা বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয়োজনে করতে পারেন, যেমন রসূলুল্লাহ্ (স) করেছিলেন বনূ-কুরায়জাদের ক্ষেত্রে।

পৌত্তলিক ও মূর্তি উপাসকদের হত্যা করার যে অনুমতি কোন কোন মুসলিম আইনবিদ দিয়েছেন, তা আমার মতে কুরআনের বলপ্রয়োগের নীতি, রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কার্যাবলী এবং হিজরী সনের প্রথম থেকে ধর্মপ্রাণ খলীফাদের শেষ সময় পর্যন্ত (খৃঃ ৬৬১) মুসলমানদের নীতির পরিপন্থী। অবিশ্বাসীদের জন্য যে সব আইনবিদ মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেন, তাঁরা সুবিবেচক নন। কারণ মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ পৌত্তলিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হয় এবং তারা সকলেই ন্যায়বিচার ভোগ করার অধিকারী। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "নিহত ব্যক্তি যদি এমন কওমের লোক হয় যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি বহাল রয়েছে, তাহলে নিহত ব্যক্তির

www.nagorikpathagar.org

পরিবার-পরিজনদের কাছে ক্ষতিপূরণ বাবদ পাওনা পৌঁছে দিতে হবে এবং একটি মুসলিম গোলামকে মুক্তি দিতে হবে।"[৫৬]

অবিশ্বাসীদের জন্য ইসলাম যদি মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করত, যেমন কতিপয় আইনবিদ দাবি করেন, তাহলে রসূলুল্লাহ্ (স) যখন মক্কা ও হুনায়নের যুদ্ধের পর হাওয়াজিন দখল করেন, তখন তথাকার অধিবাসীদের হত্যা করতেন এবং অবিশ্বাসী 'খোজা'দের সাথেও মৈত্রী স্থাপন করতেন না। ভারত থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত জয় করার সময় মুসলমানরা তাহলে পৃথিবীর বুকে 'প্লেগ' হিসেবে চিহ্নিত হতেন এবং কোন অবিশ্বাসীই মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেত না। রসূলুল্লাহ্ (স) যে তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু ও নিকট-আত্মীয়ের হত্যাকারীসহ শক্তিশালী শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন ও তাদের প্রতি দয়া দেখিয়েছেন, তার যথেষ্ট নযীর রয়েছে। তাঁর জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, ইকরামা ইবনে আবূ জহল ও সুফিয়ান ইবনে উমাইয়াকেও তিনি ক্ষমা করেছিলেন। এদের পিতারাও তাঁর শত্রু ছিল। তাঁর চাচা হামযার হত্যাকারী ওয়াহ্শীকেও তিনি ক্ষমা করে দেন। ওয়াহ্শী ছিল একজন সাধারণ আবিসিনীয় ক্রীতদাস। তিনি আবূ সুফিয়ান ইবনে আল-হারিসকেও মাফ করে দেন। যদিও সে রসূলুল্লাহ্ (স)-কে অপমান করেছিল এবং ইসলাম প্রচারের ঘোরতর বিরোধী ছিল। এসব দৃষ্টান্ত সেই ন্যায়বিচারের স্পষ্ট প্রমাণ, যে বিচারে বেসামরিক লোক, বাঁদী বা শান্তি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী লোককে হত্যার অনুমোদন নেই।

কোন এক যুদ্ধের পর রসূলুল্লাহ্ (স) জানতে পারেন যে, একদল কিশোরকে গ্রেফতার করে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে। এ সংবাদে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। একজন তাকে বলে, "আপনি দুঃখ করছেন কেন ? এরা ত সব পৌত্তলিকদের সন্তান।" এতে রসূলুল্লাহ্ (স) খুবই বিরক্ত হন এবং বলেন, "তারা তোমাদের চেয়ে বেশি মূল্যবান ; কারণ তারা নির্দোষ। তোমরা কি পৌত্তলিকদের সন্তান নও ? সাবধান, শিশুকে হত্যা করো না। সাবধান, শিশুকে হত্যা করো না।"

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, একবার এক শোকাবহ মিছিল যাচ্ছিল। রসূলুল্লাহ্ (স) শ্রদ্ধা দেখানোর জন্য দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গীরাও তাঁকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু পরে তাঁরা বলেন, "এটা ত একটা য়াহূদীর শোক মিছিল।" এতে রসূলুল্লাহ্ (স) উত্তর দেন, "এটা কি একটা আত্মা নয় ? কোন শোকমিছিল দেখলেই তোমরা উঠে দাঁড়াবে।"

মানুষের প্রতি এ শ্রদ্ধা সার্বজনীন এবং এর মধ্যে কোন ব্যতিক্রম নেই। কেবল অবিশ্বাসী বলেই বন্দী বা বেসামরিক লোককে হত্যা করার অনুমতি দেওয়া যায় না।

বস্তুত বেসামরিক লোককে হত্যা ও তাদের উপোস রাখা, বন্দীকে হত্যা, ধন-সম্পত্তি ধ্বংস এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সম্পর্কে ইসলামের যে স্পষ্ট নিষেধ রয়েছে, সে

www.nagorikpathagar.org

সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও রুগ্ন, শ্রমিক এবং চাষীকে পূর্বে সতর্ক করা ছাড়াই ভূমি, সাগর বা শূন্য থেকে উদ্দেশ্যহীনভাবে বোমাবর্ষণের যে আধুনিক যুদ্ধনীতি ও তার আনুষঙ্গিক ধ্বংসলীলা, ইসলামী শরীয়ত তা মোটেও অনুমোদন করে না।

সুন্নাহ্ এবং সাধারণ আইনে যুদ্ধের যথার্থ আচরণের উল্লেখ রয়েছে, যেমন—শত্রুপক্ষের দূতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার। ইসলামে অনাথ ও দরিদ্ররা যে ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার, বন্দীরাও ঠিক সেই ব্যবহার পাওয়ার দাবিদার। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ "আর তারা বিশেষ আগ্রহের সাথে গরীব, মিসকিন, য়াতিম, কয়েদীদেরকে খাবার দিয়ে থাকে—তাঁরই প্রেমে। আমরা তোমাদের জন্য শুধু আল্লাহ্ তা'আলার জন্যই খাবার দিচ্ছি। আমরা এজন্য তোমাদের কাছে মজুরি কিংবা কৃতজ্ঞতা কিছুই পেতে চাইনে।"[৫৭]

স্থায়ী শান্তি

কিছু কিছু আইনবিদ ও প্রাচ্য পণ্ডিতের মধ্যে দারুল-হরব ও দারুল-ইসলাম সম্পর্কে একটা অস্বাভাবিক ও অতিরঞ্জিত ধারণা আছে। তাদের মতে, দারুল-হরব-এ ইসলাম রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সদা যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান থাকবে এবং দারুল-ইসলামে সব সময় নির্ভেজাল শান্তি বিরাজমান থাকে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে আহ্বান রয়েছে তা হলো স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, কিভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করার অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল এবং অনুমোদিত যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও আচরণ কি হওয়া উচিত। আমরা আরও দেখেছি যে, শরীয়তের অনুমোদিত যুদ্ধ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম এবং তার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল মানুষের জন্য শান্তি স্থাপন।

হাদীস, কুরআন এবং মুসলমানদের ইতিহাসে এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুকাবিলা করতে ইচ্ছা পোষণ না করে আল্লাহ্র কাছে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য প্রার্থনা কর।" যুদ্ধের জন্য আশা করাকে তিনি নিরুৎসাহিত করেছেন এমন কি তা জঘন্যতম শত্রুর বিরুদ্ধে হলেও। বরন্তু তিনি এ ব্যাপারে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করেছেন।

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন যে, একবার একটা লোক রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করে, "কেউ যুদ্ধ করে লাভের আশায়, কেউ যুদ্ধ করে দেশের জন্য এবং কেউ যুদ্ধ করে পদমর্যাদার আশায়। কিন্তু আল্লাহ্র জন্য কে যুদ্ধ করে ?" উত্তরে

www.nagorikpathagar.org

নবী বলেন, "পার্থিব লাভ বা উচ্চাশার জন্য যুদ্ধ না করে যে আল্লাহ্‌র কালামকে শ্রেষ্ঠ স্থানে অধিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে-ই আল্লাহ্‌র জন্য যুদ্ধ করে।"

ইসলামের যখন শৈশবাবস্থা তখন য়াছরিবে মুসলমানদের আহ্‌যাব বা পরিখা খুঁড়ে শত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করতে হয়েছিল। মুসলমানরা যখন পরিখা খনন করেছিল, তখন রসূলুল্লাহ্‌ (স) নিজ হাতে ময়লা সাফ করতে করতে নিম্নলিখিত আয়াত আবৃত্তি করেছিলেন ঃ

"হে আল্লাহ্‌ ! তুমি না থাকলে আমরা পথের সন্ধান পেতাম না ; বিশ্বাসও করতাম না। ইবাদতও করতাম না। তুমি তোমার শান্তি বর্ষণ কর এবং আমাদের যদি যুদ্ধ করতেই হয়, তাহলে আমাদের শক্তি দাও। তারাই আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে, কারণ তারা ইচ্ছা করেই আমাদের সাথে ফিতনা সৃষ্টি করতে চায়, যা আমরা চাই না।"

এ ধরনের আক্রমণ যদি না আসত এবং মুসলমানদের তা যদি প্রতিহত করতে না হত, তাহলে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি বজায় থাকত।

এ সম্বন্ধে আমরা আরও প্রমাণ পাই পবিত্র কুরআনের নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেঃ

"তোমরা যারা ঈমান এনেছ, শোন ! তোমরা সবাই ইসলামের ছায়াতলে পরিপূর্ণরূপে দাখিল হও। শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের জন্য প্রকাশ্য দুশমন।"[৫৮]

"তারা যদি আপস-রফার দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাহলে আপনিও সে জন্য এগিয়ে যাবেন। আর আল্লাহ্‌র ওপরেই ভরসা রাখুন। একমাত্র তিনিই ত সব কিছু শোনেন ও জানেন। তারা যদি আপনাকে ধোঁকা দিতে চায়, তা হলে আল্লাহ্‌তা'আলাই আপনার জন্য যথেষ্ট। তিনিই ত আপনাকে তাঁর নিজের সাহায্য আর মু'মিনদের দিয়ে শক্তিশালী করছেন।"[৫৯]

"... যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করবে, সালাম দেবে, তাকে এমন কথা বলো না ঃ 'তুমি মুসলমান নও।' সে ত পার্থিব সুযোগ-সুবিধার আশা রাখে ... ।"[৬০]

"আল্লাহ্‌ পাক তাদের সাথে তোমাদের সদ্ব্যবহার ও ন্যায়বিচার করতে বারণ করেন নি—যারা তোমাদের সাথে দীন ইসলাম নিয়ে লড়াই-ঝগড়া করেনি, আর তোমাদের বাড়ি-ঘর থেকে তাড়িয়ে দেয়নি—নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ ন্যায়বিচারকদের ভালবাসেন। আল্লাহ্‌ পাক শুধু তাদের সাথেই বন্ধুত্ব কায়েম করতে বারণ করেছেন, যারা দীন ইসলাম নিয়ে তোমাদের সাথে লড়াই-ঝগড়া করেছে, আর তোমাদের দেশ

www.nagorikpathagar.org

ত্যাগে বাধ্য করেছে। তোমাদের নির্বাসনে সাহায্য করেছে। আর যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব কায়েম করবে—তারাই ত জালিম দল।"[৬১]

"সুতরাং তারা যদি তোমাদের ব্যাপারে আলাদা থাকে, তোমাদের সাথে লড়াই না করে আর তোমাদের কাছে আপস-রফার প্রস্তাব দেয়, তাহলে আল্লাহ্ তাদের ওপরে তোমাদের কোনও সুযোগ করে দেন নি।"[৬২]

নিম্নলিখিত আয়াতগুলোতেও আমরা শান্তি ও ভালবাসার বাণী শুনতে পাই ঃ

"সুতরাং আপনি তাদের সেদিকেই ডাকতে থাকুন—আপনাকে যেভাবে আদেশ দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনিভাবে কায়েম থাকুন। তাদের খেয়াল-খুশী মেনে চলবেন না মোটেই। আর আপনিই বলে দিন ঃ আল্লাহ্ পাক যত কিতাব নাযিল করেছেন সে সবের প্রতি আমি ঈমানদার, আস্থাবান। আর আমাকে হুকুম দেয়া হয়েছে—যেন আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার কায়েম রাখি। আল্লাহ্ আমাদের পালনকর্তা, আর তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের কাজকর্ম আমাদের জন্যই, আর তোমাদের কাজকর্ম সে ত শুধু তোমাদের জন্যই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মোটেই কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই। আল্লাহ্ পাক আমাদের সবাইকে একত্র করবেন। আর তাঁরই মহান দরবারে ফিরে যেতে হবে।"[৬৩]

"যাদের কিতাব দান করা হয়েছে, যারা নিরক্ষর—তাদের আপনি বলুন ঃ তোমরা মেনে নাও। যদি তারা অনুগত হয়, তবেই সরল পথ পাবে। আর যদি বিমুখ হয়, তবে শুধু বাণী পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আপনার দায়িত্ব।"[৬৪]

"আপনি তাদের বলে দিন যারা ঈমানদার তারা যেন সেসব লোককে মাফ করে দেয়—যারা আল্লাহ্ তা'আলার হিসাব সম্পর্কে মোটেই বিশ্বাসী নয়—যেদিন একটি কওমকে তিনি দান করবেন, যা তারা কায়েম করেছে।"[৬৫]

"আহলে কিতাবের সাথে তোমরা ঝগড়া করো না তবে মনোজ্ঞ উপায়ে করতে পার। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জালিম তাদের কথা আলাদা ... ।"[৬৬]

"আমি তোমাদের সবার জন্য একটি করে শরীয়ত ও ব্যবস্থা ঠিক করে দিয়েছি। আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তিনি তোমাদের সবাইকে একটি মাত্র উম্মতে পরিণত করতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান, যা তিনি তোমাদের দান করেছেন, তাই দিয়ে। সুতরাং সবাই তোমরা নেক কাজে তৎপর হও। আল্লাহ্র কাছেই তোমাদের সবাইকে ফিরে যেতে হবে।"[৬৭]

"অথচ এমন কোন লোক নেই, যে নাকি আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ছাড়া ঈমান আনতে পারে। যারা বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না, তাদের ওপরে ময়লা আবর্জনাই নিক্ষেপ করা হয়।"[৬৮]

www.nagorikpathagar.org

"আমি আপনাকে মানব জাতির জন্য পরিপূর্ণ সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী নবী ব্যতীত আর কোনও কাজের জন্য পাঠাইনি।"৬৯

কোন কোন সমালোচকের মতে, মক্কায় কুরআনের যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে, তা দয়া ক্ষমার কথায় ভরপুর ; কিন্তু মদীনায় যেসব আয়াত নাযিল হয়েছে তাতে অবিশ্বাসী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য জোর দেয়া হয়েছে। এ ধরনের মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ্র কিতাব অবিভাজ্য এবং যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সবগুলো আয়াতেই যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ধৈর্য ও আত্মত্যাগের জন্য উৎসাহ দেয়া হয়েছে এবং যখনই শান্তি স্থাপনের সম্ভাবনা দেখা দেবে তখনই যুদ্ধ বন্ধ করার কথা বলা হয়েছে। এ আচরণ ঘটনাপ্রসূত, যুদ্ধের কারণ নয়। মদীনায় নাযিল হওয়া কতিপয় আয়াত আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি।

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুষ্ঠু সঠিক পথ—গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে বাতলে দেয়া হল।"৭০

"আপনি বলুন ঃ তোমরা সবাই আল্লাহ্র অনুগত হও, তোমরা সবাই রসূলের অনুগত হও। তবে তোমরা যদি বিমুখ হও, অবাধ্য হও, তাহলে তাঁর দায়িত্ব —সে বোঝা তার যিম্মায় রয়েছে। যেন তাঁরই ওপরে, আর তোমাদের বোঝা তোমাদের ওপরেই চাপানো রয়েছে। কিন্তু তোমরা যদি তাঁকেই মেনে চল—তাহলেই ত পথ পাবে। আসলে রসূলের ওপরে সুস্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে নির্দেশ পৌঁছানোর দায়িত্ব ছাড়া আর কিছুই ন্যস্ত করা হয়নি।"৭১

আল্লাহ্ তাঁর নবীকে বলেন ঃ "তুমি হামেশা বিশ্বাসঘাতকতার খবর পাচ্ছ তাদের অল্প কিছু লোক সম্বন্ধে ছাড়া। যা হোক, তুমি উপেক্ষা কর তাদের অপরাধ এবং ছেড়ে দাও নিশ্চয়ই আল্লাহ্ নেক্কারদের ভালবাসেন।"৭২

মক্কা ও মদীনায় রসূলুল্লাহ্ (স)-এর প্রচারকার্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলাম সব সময় যুক্তির ওপর নির্ভর করেছে এবং আত্মরক্ষার জন্যই শুধু তরবারির আশ্রয় নিয়েছে। ইসলাম প্রচারের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে আমরা এর যথেষ্ট প্রমাণ পাই। স্যার থমাস আর্নল্ড-এর৭৩ মতে, ইসলামী রাষ্ট্রের পতন ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় ইসলামের আধ্যাত্মিক বিজয় মোটেই ক্ষুণ্ন হয়নি। আর্নল্ড স্বীকার করেন যে, ইসলামের রাজনৈতিক পরাজয়ের দিনগুলোতে তার সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক বিজয় সংঘটিত হয়।

ইসলামের ইতিহাসের দুটো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা থেকে আমরা একথার সত্যতা খুঁজে পাই। প্রথমত, মোঙ্গল ও সেলজুক তুর্কীরা যখন ইসলামী রাষ্ট্র ও জনপদসমূহ সমানে পদদলিত করছিল, তখন ইসলাম তাদের হৃদয় জয় করেছিল। বিজয়ী হলেও তারা বিজিতের ধর্ম গ্রহণ করেনি। তাদের এ মানসিক পরিবর্তনের জন্য ইসলাম ক্ষমতা বা

www.nagorikpathagar.org

তলোয়ারের আশ্রয় নেয়নি। দ্বিতীয়ত, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, সন্ধির শর্তানুসারে মুসলমানদের দশ বছরের জন্য অস্ত্র সংবরণ করতে হয়েছিল। এ সময়ের মধ্যেই ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মিক বিজয় সম্ভব হয়। কারণ হুদায়বিয়ার সন্ধির মাধ্যমে যে শান্তিপূর্ণ বিজয় সাধিত হয়, তা মক্কাবাসীর হৃদয় জয় করে এবং সমগ্র আরব দেশে ইসলাম প্রচারের পথ সুগম করে।

ইসলামের যুদ্ধে জয় সুসংগঠিত ও নিয়মিত সেনাবাহিনী দ্বারা হয়নি[৭৪] শত্রুদের সাথে মুসলমানদের রাষ্ট্রের সাধারণ সীমা নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে মুসলমানেরা নিয়মিত সংগঠিত সেনাবাহিনী গঠন করার কথা চিন্তাও করেনি। নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ৬৮৫–৭০৫ খৃস্টাব্দের মধ্যে সংগঠিত স্থায়ী সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুহাম্মদ (স)-এর মৃত্যুর অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় পরে এ প্রয়োজন পড়েছিল।

মুসলমানদের কাছে যুদ্ধ হলো একটা আকস্মিক ব্যাপার এবং শান্তিই হলো মূলনীতি। সেজন্যই ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থায়ী ও বিশ্বজনীন শান্তির নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। যুদ্ধ দ্বারা তা কেবল বিঘ্নিতই হয়।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাণীর বিস্তার

বিধর্মীদের মধ্যে বাণী প্রচার

মুসলিম ও অমুসলিম অনেকের মনেই এ ধারণা বদ্ধমূল যে, মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রচার এবং প্রসার একমাত্র তলোয়ারের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তারা বিশ্বাস করে যে, আরব উপজাতীয়রা আল্লাহ্‌র কিতাব বুকে নিয়ে এবং সত্যের তরবারি হাতে নিয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে দুর্বার গতিতে অগ্রসর হয়েছিল এবং কুরআনের প্রতি মাথা নত করার জন্য তারা সেই তরবারি ব্যবহার করেছিল। এর চেয়ে সত্যের অপলাপ, অসার ও বিকৃত ঘটনা আর হয় না। এ সম্পর্কে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করতে হবে যেন সত্য থেকে মিথ্যাকে আলাদা করা যায়। বিভিন্ন সময়ে ইসলাম বিস্তারের ধারাকে আমরা যদি সঠিকভাবে অনুধাবন করি, তাহলেই বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এ সব মিথ্যা ধারণা প্রচার হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, আরব দেশের বাইরে ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সেসব দেশে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা। এজন্যই অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সাথে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টার পার্থক্য বুঝতে পারেন নি এবং একই কারণে তাঁরা তৌহিদে তথা এক আল্লাহ্‌র ওপর জনগণের বিশ্বাস স্থাপন এবং ক্রমবর্ধমান ইসলামী রাষ্ট্রের[১] রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ওপর আস্থা স্থাপনের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখতে পান নি।

ইসলামের বিজয় শুরু হওয়ার আগেই যে হাজার হাজার নিপীড়িত মুসলমান মক্কা ও অন্যান্য স্থান দখল করেছিল, তা অবজ্ঞা করার প্রবণতা প্রায়ই দেখা যায়। ভুলে যাওয়া হয় যে, ইসলাম গ্রহণের অপরাধে তাদের ওপর প্রকাশ্যে অত্যাচার করা হয়েছিল এবং দু'বার তাদেরকে সাগর পাড়ি দিয়ে আবিসিনিয়ায় আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

মুহাম্মদ (স)-এর আহ্বানে যারা প্রথম সাড়া দিয়েছিল, তারা হলো তার পরিবারের লোক। এদের মধ্যে অনেকেই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং অনেকেই তা প্রত্যাখ্যান করে। তিনি তখন গোপনে ইসলাম প্রচার

www.nagorikpathagar.org

করতেন। যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক তাঁর পরিবারের গণ্যমান্য লোক ছিল এবং কিছু ছিল জাহিলিয়া যুগের শক্তিমান লোক। এছাড়া তাদের মধ্যে লা-ওয়ারিশ এবং ক্রীতদাসও ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ রসূলুল্লাহ্ (স)-কে নিরাপত্তা দিতে পারেনি। কুরায়শরা তাঁকে ও তাঁর অনুচরবর্গকে একটা সংকীর্ণ উপত্যকায় নির্বাসন গ্রহণ করতে বাধ্য করে। প্রায় তিন বছর তথায় তাদের মক্কার বিভিন্ন গোত্র ও অন্যান্য গোত্রের লোকদের থেকে পৃথক থেকে অবহেলিত অবস্থায় দিন কাটাতে হয়েছিল। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার পর মুহাম্মদ (স) গোত্রে গোত্রে তাঁর বাণী প্রচার করতে থাকেন। তায়েফ নগরী থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি আল-মুতিম ইবনে আদিয়ের আশ্রয়ে মক্কায় পুনঃ প্রবেশ করেন। আদিয়ে ছিল অবিশ্বাসী। মানবতা গুণে উদ্বুদ্ধ হয়ে অত্যন্ত সাহসের সাথে সে মুহাম্মদ (স)-কে আশ্রয় দিয়েছিল।

অতপর হযরত মুহাম্মদ (স) গোপনে এবং প্রকাশ্যে তাঁর প্রচারকার্য অব্যাহত রাখেন এবং তাঁর অনুচরদের ওপর সবরকমের অত্যাচার চলতে থাকে। এ অত্যাচারের অবসান হয় পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে, যখন তিনি য়াছরিব (পরবর্তীকালে মদীনা) থেকে আগত একদল যুবকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা রসূলুল্লাহ্ (স)-কে তাঁর অনুচরসহ মদীনায় হিজরত করতে রাযী করান। এভাবে তিনি মৃত্যুর ছোবল থেকে বন্ধুপ্রতিম য়াছরিবের কোলে আশ্রয় নেন। নির্বাসনে থাকা অবস্থায়ও তাঁর শত্রুরা তাঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। যখন তারা দুরভিসন্ধি নিয়ে তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে তখন তিনি তাদের সৈন্যের সাথে বদর নামক স্থানে মুকাবিলা করেন। এখানেই আল্লাহ্ যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে নিম্নলিখিত আয়াত নাযিল করেন ঃ

"তাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে যাদের সাথে তারা লড়াই করেছে, এজন্য যে তাদের ওপরে বড়ই জুলুম করা হচ্ছে। আর আল্লাহ্ তাদের সাহায্য দানে নিশ্চয়ই সক্ষম। তাদের নিজেদের বাস্তুভিটা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছে—বিনা দোষে—শুধু এ কারণে যে তারা বলছে, আল্লাহ্ তা'আলাই আমাদের পালনকর্তা। আল্লাহ্ যদি একদলকে দিয়ে আরেক দল মানুষকে শায়েস্তা না করতেন, তাহলে যত মন্দির, গীর্জা, উপাসনালয় ও মসজিদ—যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার নাম খুব বেশি পরিমাণ স্মরণ করা হয়, সব মিসমার হয়ে যেত। আল্লাহ্ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন, যে নাকি তাঁকে সাহায্য করল। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী ও সার্বভৌম ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী। তাদের আমি যদি দেশে প্রতিষ্ঠা দান করি, তাহলে তারা নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় আর গর্হিত কাজে বারণ করে থাকে।"[২]

www.nagorikpathagar.org

যুদ্ধ অনুমোদনের কারণ বর্ণনায় উক্ত আয়াতটি অত্যন্ত স্পষ্ট এবং এর দ্বারা আল্লাহ্‌র কালাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে বলে যাঁরা মত পোষণ করেন, তাঁদের মন থেকে এ ধারণা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যাওয়া উচিত।

বদরের যুদ্ধের আগে পনের বছর পর্যন্ত রসূলুল্লাহ্ (স) অত্যন্ত মনোরম প্রজ্ঞার সাথে ইসলাম প্রচার করেন এবং একই সাথে অত্যাচারিত হন। কিন্তু যখন তিনি নিজেকে এবং তাঁর অনুচরবর্গকে রক্ষা করার জন্য শক্তি প্রয়োগ ছাড়া আর কোন উপায় দেখতে পেলেন না, তখনই আল্লাহ্ তাঁদের আত্মরক্ষার্থে শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেন এবং তারপর বদর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে দুর্বল সবলকে পরাজিত করে। আল-কালিব[৩] কূপে শক্তিশালী কুরায়শদের লাশ সমাধিস্থ করা হয়।

রসূলুল্লাহ্ (স) মদীনায় ফিরে গিয়ে ধৈর্য সহকারে সকলকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানাতে থাকেন। কিন্তু কুরায়শ ও তাদের সমর্থকরা সহনশীলতার পরিচয় দিতে ব্যর্থ হয় এবং মদীনায় তারা মুহাম্মদ (স)-কে আক্রমণ করে। তিন বছর পর তিনি শান্তি স্থাপনের সুযোগ গ্রহণ করে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করেন। মুহাম্মদ (স)-এর বাণী যদি তরবারির ওপর নির্ভরশীল হত তাহলে তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির শর্তসমূহ গ্রহণ করতেন না। কারণ সন্ধির শর্তগুলো রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সঙ্গীদের মোটেই মনঃপূত ছিল না এবং তাঁদের কাছে এটা ছিল অবমাননাকর। তাঁদের বক্তব্য ছিল, তাঁরা যুদ্ধ শুরু করেনি বা যুদ্ধে পরাজিতও হয়নি। মুহাম্মদ (স) জানতেন যে, তরবারির সাহায্যে তাঁর বাণী প্রচার করলে মানুষ তাঁকে স্বাগত জানাবে না। তিনি আরও জানতেন যে, কেবলমাত্র শান্তির মাধ্যমেই তাঁর 'মিশনের' বিজয় সূচিত হতে পারে। হুদায়বিয়ার সন্ধি ছিল একটা বিরাট বিজয়। কারণ এর ফলেই ইসলাম ব্যাপ্তি লাভ করে এবং সমগ্র আরবে ইসলামের আহ্বান জানান হয় এবং আরববাসী তা গ্রহণ করে। বিজয় সম্পর্কে কুরআনের আয়াত[৪] নাযিল হয় সম্ভবত হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদিত হওয়ার পর। পরবর্তী সময়ে এ আয়াতের অর্থ মানুষ বুঝতে পারে। সন্ধি সম্পাদনের সময়ে মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে। কারণ ইসলাম হলো আল্লাহ্‌র ধর্ম এবং এর ভিত্তি হলো হিতোপদেশ। শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই ইসলাম যুদ্ধ অনুমোদন করে—অন্য কোন কারণে নয়।

আরব উপদ্বীপে ইসলাম প্রচারের ইতিহাস হচ্ছে মুসলমানদের ধৈর্যের ইতিহাস। ইসলামের ইতিহাসের প্রত্যেকটি বিষয় অনুসন্ধান করলে এ সত্য প্রকাশ পায় এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কার্যাবলীতেও এর অনুমোদন পাওয়া যায়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ছিল ধৈর্য ধারণ করার ঃ

"ধর্মের ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। সুষ্ঠু ও সঠিক পথ গোমরাহী থেকে সুস্পষ্টরূপে আলাদা করে বাতলে দেওয়া হলো।"[৫]

www.nagorikpathagar.org

"আপনি কি লোকদের উপর জোর-জবরদস্তি করতে চান, যাতে তাদের সবাই ঈমানদার হবে।"[৬]

"আল্লাহ্ যাকে পথ দেখান সে-ই পথ পায়, কিন্তু আল্লাহ্ যাকে কুপথে যেতে দেন তার জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পথপ্রদর্শক পাবে না।"[৭]

কেউ হয়ত জিজ্ঞেস করতে পারেন, রসূলুল্লাহ্ (স) যদি মক্কা ও মদীনায় অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করে থাকেন, যদি তিনি সাহাবীদের কাছে সন্তোষজনক সন্ধির শর্তে রাযী হয়ে থাকেন, তাহলে কেন তিনি আরবের বাইরে যুদ্ধাভিযান চালিয়ে সিরিয়া এবং বাইজেন্টাইন আক্রমণ করেছিলেন ? এটা কি তলোয়ারের সাহায্যে ইসলাম প্রচার নয় ?

মুহাম্মদ (স)-এর সাথে বাইজেন্টীয়দের এবং তাদের আরব প্রজাদের যুদ্ধ কিভাবে সংঘটিত হয়েছিল তা যারা বুঝতে অক্ষম, তাদের কর্ণেল ফ্রেডারিক বেক রচিত 'ট্রান্স-জর্ডান ও তার উপজাতির ইতিহাস' বইখানা পড়ার অনুরোধ করি। কর্ণেল বেক মুসলমান ও অন্যদের বিশ্বাসযোগ্য তথ্য অবলম্বনে বইখানি রচনা করেন। কর্ণেল বেকের মতে, ঘটনাক্রমে ফারাওয়া-ইবনে উমর-আল-যোধামী নামে একজন মুসলমান বর্তমান জর্দান এলাকায় ৬২৭–৬২৮ (হিজরী ৬) সালে প্রথম শহীদ হন। ফারাওয়া ছিলেন আম্মানে[৮] নিযুক্ত বাইজেন্টীয় শাসনকর্তা। তিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ (স)-এর নিকট উপঢৌকন[৯] পাঠিয়েছিলেন। বাইজেন্টীয়রা একথা জানার পর তাকে ইসলাম ত্যাগ করার অনুরোধ করে। কিন্তু ফারাওয়া তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা তখন ফারাওয়াকে কারারুদ্ধ করে এবং পরে প্যালেস্টাইনের উফ্রা[১০] নামক স্থানে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করে।

সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান জানানোর উদ্দেশ্যে এবং বাইজেন্টীয়দের গতিবিধি সম্পর্কে ভালভাবে ওয়াকিবহাল হওয়ার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স) ৬২৯ খৃস্টাব্দের জুলাই মাসে পনের জনের এক ক্ষুদ্র সেনাদলকে জর্ডান সীমান্তে প্রেরণ করেন। আল-ফারাক এবং তুফায়লার মধ্যবর্তী তাল্লাহ্[১১] নামক স্থানে তাদের আক্রমণ করা হয় এবং একজন ছাড়া আর সবাইকে হত্যা করা হয়। একই সাথে রসূলুল্লাহ্ (স) সিরিয়ার তখনকার ঘাসান বংশের শাসকের নিকট ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে আল-হারিস ইবনে উমায়েরকে দূত হিসেবে পাঠান। কিন্তু দূতকে আটক করে হত্যা করা হয়। আবার একই সময় রসূলুল্লাহ্ (স)-এর দূতগণ আরবের উত্তরাঞ্চল থেকে এ সংবাদ নিয়ে আসেন যে, বাইজেন্টীয়রা যুদ্ধের জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং উপজাতীয়দের সঙ্গে সম্রাট হিরাক্লিয়াসের উপস্থিতিতে তারা মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।[১২]

www.nagorikpathagar.org

এ সব উস্কানির মুখে রসূলুল্লাহ্ (স) হত্যাকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য, শত্রুর ব্যাপক যুদ্ধ প্রস্তুতি ও তাহাদের শক্তি সম্পর্কে আঁচ করার জন্য, সীমান্তে সৈন্য সমাবেশের কারণ অনুসন্ধান করার জন্য জর্ডান সীমান্তে এক যুদ্ধাভিযান চালান। ৬২৯ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যায়দ ইবনে হারিসের নেতৃত্বে রসূলুল্লাহ্ (স) তিন হাজার সৈন্যের এক বাহিনী মদীনার নিকটবর্তী জাওয়াফ নামক স্থানে একত্র করেন। এ স্থান থেকে তাদের সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করার কথা ছিল। সৈন্যরা বলকার উপকণ্ঠে পৌছালে বাইজেন্টীয় এবং হিরাক্লিয়াসের সাথে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ আরব যাযাবর দল তাদের বাধা দেয়। ফলে আল-ফারকের নিকটবর্তী মূতা নামক গ্রামে দুই পক্ষের মধ্যে এক ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

শত্রু বাহিনীর তুলনায় মুসলমানদের সৈন্যসংখ্যা অনেক কম হলেও এ যুদ্ধে মুসলমানরা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। সেনাপতি যায়দ যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করলে মুহাম্মদ (স)-এর আদেশ অনুসারে জাফর ইবনে আবূ তালিব সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর ডান হাতে পতাকা বহন করছিলেন। শত্রুরা তাঁর ডান হাত কেটে ফেললে তিনি বাম হাতে পতাকা ধারণ করেন। তাঁর বাম হাত কেটে ফেলা হলে তিনি হাতের উপরিভাগ দ্বারা পতাকা শরীরের সাথে চেপে রাখেন এবং মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তিনি পতাকার মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখেন। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর দেহে কমপক্ষে পঞ্চাশটি আঘাতের চিহ্ন ছিল। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট দেয়া হলে তিনি ঘোষণা করেন, "হাতের পরিবর্তে আল্লাহ্ যেন তাকে এক জোড়া পাখা দান করেন, যেন সে বেহেশতে ইচ্ছামত উড়ে বেড়াতে পারে।" এরপর থেকেই তাঁকে 'জাফর তাইয়ার' বা 'উড্ডয়নকারী জাফর' হিসেবে আখ্যায়িত করা হত।

জাফরের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহ্ সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর খালিদ ইবনে ওয়ালিদ সেনাপতি হন। ওয়ালিদ যুদ্ধ প্রত্যাহার করে মদীনায় ফিরে আসেন।

এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে বাইজেন্টীয়দের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। স্বধর্মে ফিরে না আসার জন্য ফারাওয়াকে হত্যা করে বাইজেন্টীয়রা যে যুদ্ধের উস্কানি দিয়েছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তারা যে কিরূপ অত্যাচারী এবং আচরণ ও চিন্তায় কতটুকু হিংসুক ছিল, তা তাদের কার্যকলাপ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। ক্ষমতার গর্ব ও শান্তিপূর্ণ প্রচারের ভয়ে ভীত হয়ে তারা যে বলপ্রয়োগ, বিশ্বাসঘাতকতা এবং নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করেছিল, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। বিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সামনে অস্ত্র ধারণ করা ছাড়া বিকল্প কোন পথ ছিল না।

www.nagorikpathagar.org

বেকের বিবরণীতে আমরা দক্ষিণ জর্ডানের মূতা নামক স্থানে বসবাসকারী 'আজিজাত' নামক এক খৃস্টান পরিবারের কথা জানতে পারি। মুসলিম বাহিনীর আগমন বার্তা পেয়ে এ পরিবারের দুই ভাই বাইরে গিয়ে তাদের স্বাগত জানায় এবং গ্রামের প্রবেশপথের গেটগুলো খুলে দেয়। তারা সৈন্যদের জন্য খাদ্য ও পানীয়ের ব্যবস্থাও করে। এদের মধ্যে এক ভাই মুসলমান হয়ে যায় এবং অপরভাই খৃস্টান থেকে যায়। তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ রসূলুল্লাহ্ (স) তাদের উত্তরাধিকারদের কাছ থেকে কোন ভূমিকর বা অন্য কোন রকম কর আদায় না করার আদেশ দেন। তাঁর আদেশ ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত মান্য করা হয়। ১৯১১ সালে আল-ফারকের অধিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে তুর্কী সরকার তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা শুরু করেন। 'আজিজাত' পরিবার বর্তমানে মাদিয়াতে বসবাস করছে এবং তথায় তারা প্রতাপশালী গোত্র হিসেবে পরিচিত।

কোন এক বিশেষ খৃস্টান পরিবার ও তার উত্তরাধিকারের কাছ থেকে কর আদায় না করার জন্য রসূলুল্লাহ্ (স) যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা শত শত বছর যাবত পালন করা অস্বাভাবিক সহনশীলতারই পরিচয় বহন করে। এ থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম প্রচারে বলপ্রয়োগ বা তলোয়ার ধারণ করার কোন স্থান নেই।

মক্কা বিজয়ের ঘটনার ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেও ধরা পড়ে যে, নিজের লোক তথা কুরায়শদের সাথে সংগ্রামে হযরত মুহাম্মদ (স) সঠিক পথই গ্রহণ করেছিলেন। উভয় পক্ষের মধ্যে মীমাংসায় উপনীত হওয়ার জন্য তলোয়ার ধারণ করা অপরিহার্য ছিল। এমন কি মুহাম্মদ (স)-কে নবী হিসেবে চিহ্নিত না করে আমরা যদি তাঁকে একজন সাধারণ সাহসী মানুষ হিসেবেও দেখি তবু দেখা যাবে যে, তাঁর মতামতের জন্য তাঁকে এবং তাঁর অনুচরবর্গকে তাঁদের গৃহ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল।

পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরায়শরা ঘোষণা করে ঃ "আমরা যদি তোমার সাথে চলতে থাকি, তাহলে আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হবে।"[১৩] বাস্তবিকই কুরায়শরা ধরে নিয়েছিল যে, তারা ধর্মীয় নেতা এবং কাবাঘরের যিম্মাদার। এর জন্য তারা আগত তীর্থযাত্রীদের তদারক করত এবং কাবার মূর্তিগুলোর পরিচর্যা করত। এ কাজের জন্যই তারা সমগ্র আরব উপদ্বীপের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার একমাত্র অধিকারী ছিল। কুরায়শরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের আধিপত্যের ভিত্তি দুর্বল এবং তা জাহিলিয়া যুগের প্রচলিত প্রথার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। আর রসূলুল্লাহ্ (স) সেই প্রথার বিরুদ্ধেই তাঁর নতুন ধর্ম প্রচার করেছেন। ওপরের আয়াত থেকেই বোঝা যায় যে, কুরায়শরা উক্ত প্রথার প্রতি কিরূপ অনুগত ছিল এবং তারা যদি মুহাম্মদ (স)-এর উপদেশ গ্রহণ করত, তাহলে

www.nagorikpathagar.org

তাদের বৈশিষ্ট্য লোপ পেত যা তাদের অনেকেই ধারণা করেছিল। তারা মুহাম্মদ (স) বা তাঁর বাণীকে মোটেই সহ্য করতে পারেনি। এ জন্য প্রথম থেকেই শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

হুদায়বিয়া সন্ধিচুক্তির পর খোজা এবং বকর গোত্র পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে কুরায়শরা বনূ-বকরদের পক্ষ সমর্থনে পিছপা হলো না। শিষ্টাচারবর্জিত হয়ে তারা সন্ধির শর্ত অমান্য করে আর একবার তলোয়ারের ওপর নির্ভরশীল হলো। রসূলুল্লাহ্ (স) এ চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করেন। তিনিও তখন তলোয়ারকে বিচারকরূপে গ্রহণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এটা ঘটেছিল বিশ বছর পর এবং এ যুদ্ধের ফলাফল ছিল মুসলমানদের পক্ষে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর সেনানায়কদের বাধাপ্রাপ্ত না হলে যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন এবং বিজয়ের দিনে কুরায়শদের প্রতি তাঁর ব্যবহার স্পষ্টভাবে প্রমাণ দেয় যে, ইসলাম প্রচারে তলোয়ারের কোন ভূমিকা ছিল না।

মক্কায় যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার কারণ ধর্মীয় বিদ্বেষ বা জোরপূর্বক অন্যকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা নয়। আল্লাহ্‌র এ শহরে পরে আর যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-কেও যুদ্ধ করার জন্য একদিন মাত্র এক ঘণ্টা সময় দেয়া হয়েছিল বলে তিনি জানান। এ যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় নির্যাতন বন্ধ করে স্বাধীনভাবে ও নির্ভয়ে ধর্মমত গ্রহণ ও তা পালন করার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা।

সেই মুতাবিক কুরায়শ সর্দার সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া রসূলুল্লাহ্ (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করে বলে যে, সে মক্কায় থাকবে, না ইসলাম গ্রহণ করবে তা চিন্তা করার জন্য বিজয়ের দিন থেকে তাকে যেন দু'মাসের সময় মঞ্জুর করা হয়। উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তোমাকে তাঁর চারগুণ বেশি সময় দেওয়া হলো।" সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া এবং তাঁর পিতা উমাইয়া ইবনে খালাফ মুসলমানদের মারাত্মক ক্ষতি, অসহায়দের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার চালাত এবং নবীর প্রতি বিদ্রূপকারীদের মধ্যে উভয়ই ছিল অন্যতম। উমাইয়া একবার একখানা শুকনো হাড় হাতে নিয়ে বিদ্রূপ করে মুহাম্মদ (স)-কে বলেছিল, "মুহাম্মদ দাবি করে কিনা এগুলো আবার জীবিত হবে।" তারপরই এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "মানুষ কি দেখতে পায় না যে আমি তাকে তৈরী করেছি একটি তুচ্ছ বিন্দু থেকে। তারপরেই না সে ঝগড়া-বিতর্ককারী সেজে বসেছে। আর আমার জন্য একটা উপমা ঠাওরাচ্ছে, আর নিজের জন্মের কথা ভুলেই গেছে! বলছে ঃ হাড়গুলো যখন গলে যাবে, তখন কে তা সজীব করে তুলবে ? আপনি বলে দিন ঃ "যিনি তা প্রথমবারে তৈরী করেছেন, তিনিই। আর তিনিই ত সব জিনিস তৈরী করতে পারদর্শী।"[১৪] ইসলামের বিরুদ্ধে এতসব দুষ্কর্ম করার পর এবং সম্পূর্ণ পরাজিত হওয়ার পরও রসূলুল্লাহ্ (স) ধর্মের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে

www.nagorikpathagar.org

সুফিয়ানকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তলোয়ারের সাহায্যে ধর্ম প্রচারকারীর কাছ থেকে কি এ ধরনের ব্যবহার প্রত্যাশা করা যায় ?"[১৫]

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যসংখ্যা অত্যন্ত বেশি হলেও মক্কার যুদ্ধে দশ-বারজনেরও কম সৈন্য নিহত হয় (মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল দশ হাজার)। এতে কি প্রমাণিত হয় না যে, বিজয়ের অনেক পূর্বেই জাহিলিয়া যুগের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছিল ? কুরায়শরা অধিকাংশ লোককে মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণে রাযী করাতে পারেনি। কারণ মুহাম্মদ (স)-এর বাণী তাদের অন্তরে স্থায়িভাবে স্থান করে নিয়েছিল। তা না হলে এত দ্রুতগতিতে এবং সত্যিকারের কোন যুদ্ধ ছাড়াই মক্কার লোকেরা কিভাবে আত্মসমর্পণ করেছিল? যারা এক সময় বলত,"আমরা যদি তোমার সাথে পথ চলতে থাকি তা হলে আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হবে,"[১৬] সেসব গোত্রের লোকেরাই একযোগে একদিন ও রাত্রির মধ্যে ইসলাম গ্রহণ করে।

এর থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির পরবর্তী দিনগুলো নিষ্ফলভাবে অতিবাহিত হয়নি ; কারণ শান্তির ছায়াতলে সত্য গ্রহণে ইচ্ছুক লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। কুরায়শ সর্দাররা যখন বুঝতে পারে যে, তাদের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গিয়েছে তখন তারা তাদের দেয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে এবং মুহাম্মদ (স)-এর বাণী মানুষের অন্তর জয় করে নিয়েছে। মক্কার অধিবাসীরা যদি তখনও জাহিলিয়া যুগের জীবন ব্যবস্থাকে আঁকড়ে থাকত, তাহলে বিজয়ের রাতে মুহাম্মদ (স)-এর চাচা আব্বাসের মধ্যস্থতায় আবূ সুফিয়ান কি মুহাম্মদ (স)-এর নিকট আত্মসমর্পণ করত ? আবূ সুফিয়ান কি দীর্ঘ এক পুরুষ ধরে ইসলাম বিরোধীদের নেতৃত্ব দেয়নি ? হুনায়নের যুদ্ধের পর হওয়াজিন ও আকীক গোত্ররা তখনও কি ইসলামের সৈন্যবাহিনীকে নাজেহাল, নবীকে প্রায় হত্যা করার চেষ্টা এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেও শত্রুতা করত না ? পুরুষানুক্রমে আরবরা প্রতিশোধ গ্রহণের পক্ষপাতী থাকা সত্ত্বেও আবূ সুফিয়ান ও অন্যান্য দলনেতা তাদের সাথে যুদ্ধে যোগ দেয়নি কেন ? এর কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বাহিনী মক্কায় প্রবেশ করার আগেই ইসলাম মক্কাবাসীর অন্তর জয় করেছিল এবং তারা মুহাম্মদ (স)-এর বাণী গ্রহণ করে নিয়েছিল।

কেউ কেউ মক্কা বিজয়কে সাময়িক ঘটনা এবং এর অধিবাসীকে ধর্মান্তরিতকরণ বলে আখ্যায়িত করলেও আসলে তা ছিল মক্কার অধিবাসীদের ইসলাম গ্রহণ ও প্রকাশ্যে তাদের বিশ্বাস ঘোষণার বিরুদ্ধে হস্ত উত্তোলনকারী শক্তিকে প্রতিহত করার ঘটনা। অবশ্য গোপনে ইতিমধ্যে অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

মক্কা বিজয়ের পর আমরা দেখতে পাই বিশাল আরবের বিভিন্ন এলাকা তথা ইয়েমেন, নজরান, কিন্দাহ, বাহরায়েন, উত্তর দিকের নজদ, তিহামা প্রভৃতি এলাকা

www.nagorikpathagar.org

থেকে প্রতিনিধিদল মদীনায় আগমন করে ও ইসলামের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে। বিশ্বাস ও যুক্তির কষ্টিপাথরে যাঁচাই করেই তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অবস্থানস্থল থেকে এসব পৌত্তলিকের নিকট পৌঁছাতে যেখানে মাসের পর মাস সময় লেগে যেত, সেখানে তাদের ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে তলোয়ারের দ্বারা কি কোন ভূমিকা অবলম্বন করা যায় ? আর তা ছাড়া, এ ধরনের আক্রমণ প্রতিরোধ করার মত তাদেরও যথেষ্ট শক্তি ও সামর্থ্য ছিল। ইসলামের শৈশবে তলোয়ারের একমাত্র ভূমিকা ছিল মুহাম্মদ (স) যখন মদীনায় ছিলেন ; তখন আরব, য়াহূদী, বাইজেন্টাইন প্রভৃতি শত্রুর হাত থেকে তাঁকে রক্ষা করা। এজন্য মুহাম্মদ (স)-এর বাণী ব্যাপ্তি লাভ করেছিল এবং মানুষের অন্তরে তা স্থান করে নিয়েছিল। মুহাম্মদ (স) তাঁর বাণী প্রচারের জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং সেজন্য তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন।

আল্লাহ্র এবং রসূলের প্রতি মুসলমানদের আনুগত্যের ফলেই তারা অমুসলিমদেরকে দুটো বিকল্প পন্থা অবলম্বন করার সুযোগ দিয়েছিল। তা হলো—হয় ইসলাম গ্রহণ আর না হয় জিযিয়া কর প্রদান। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, মুসলমানদেরও কর দিতে হত। সুতরাং অমুসলমানেরা তাদের নিরাপত্তা এবং মুসলমানদের সাথে সমান সুবিধা ভোগ করার জন্য তাদের যে কর দিত তার মধ্যে অযৌক্তিক কিছু ছিল না। বিজয়ী মুসলমানদের বিজিত দেশের সমর্থ নাগরিকেরা তাদের সম্পত্তির নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সামাজিক অধিকার ভোগ করার জন্য জিযিয়া কর প্রদান করত। তলোয়ারই যদি মুহাম্মদ (স)-এর বাণী প্রচারের উপায় হত, তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া গত্যন্তর থাকত না এবং এত কম দামে তারা তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা কিনতে পারত না। তাদের ধর্মের মূল্য যদি এতই কম হয়, তাহলে তাদের পক্ষে ইসলাম গ্রহণ করাই শ্রেয়।

এটা কি বিশ্বাসযোগ্য যে মানুষ তাদের ধর্ম, ঐতিহ্য এবং দেশপ্রেম মাত্র এক দিনারের পরিবর্তে বিক্রি করে দেবে ? (স্ত্রীলোক, শিশু, পঙ্গু, সন্ন্যাসী ও ধর্মযাজকরা কর প্রদান থেকে রেহাই পেত)। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তারা তাদের পূর্ব ধর্ম থেকে ইসলামকে অধিক আনন্দদায়ক মনে করেই তা করেছিল।

আর্শ্চযের বিষয়, যে দিনার বিজিত জাতির সকল প্রিয় বস্তুকে ইসলামের তরবারি থেকে রক্ষা করে, সেই দিনার সম্পর্কে ইসলাম খুব সামান্যই চিন্তা করত। অথচ কতিপয় মুসলিম কর্মচারী অন্য লোকের ইসলাম গ্রহণের চেয়ে দিনার সংগ্রহ করাকেই বেশি অগ্রাধিকার দেয়। এ ধরনের কর্মচারী জিযিয়া কর কমে যাওয়ার

www.nagorikpathagar.org

আশংকায় অন্য লোককে ইসলাম গ্রহণে নিরুৎসাহিত করত। ইসলামের গভর্নর ধর্মপরায়ণ খলীফা ওমর ইবনে আবদুল আযিযের নিকট লেখেন যে, মিসরের লোকেরা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করায় জিযিয়া করের আয় কমে যাচ্ছে। তাদের ওপর জিযিয়া কর বহাল রাখার জন্য তিনি খলীফার অনুমতি চান। উত্তরে ওমর বলেন, "এহেন মনোবৃত্তির জন্য আল্লাহ্ তোমাকে অভিশপ্ত করুন। আল্লাহ্ মুহাম্মদ (স)-কে কর আদায়কারী হিসেবে প্রেরণ করেন নি। তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন পয়গম্বর হিসেবে।"

ইসলামের প্রথম শতকে মুসলমানদের মনোভাব কেমন ছিল, এ ঘটনা থেকে তা আমরা জানতে পারি। সে সময় ধর্মীয় সহনশীলতা এবং বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিঃসন্দেহভাবে সর্বোচ্চ শিখরে পৌছেছিল। অসহনশীল পরিবেশের মধ্য থেকে গভর্নর মুসলমানদের খলীফার নিকট এ ধরনের একটা চিঠি লিখতে পারতেন না। রাষ্ট্রের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই তিনি এ ধরনের চিঠি লিখেছিলেন। এর মধ্যে তাঁর কোন কুমতলব ছিল না বা এর মধ্যে তিনি খারাপ কিছু দেখতে পান নি। পরিস্থিতি অন্য রকম হলে তিনি হয়ত জনতার রোষাগ্নি থেকে বাঁচতে পারতেন না, আর না হয় খলীফা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন। খলীফা গভর্নরকে শাস্তিস্বরূপ তাঁর পদ থেকে অপসারিত করেন নি। জিযিয়া কর আদায়ের জন্য তিনি যে অনুমতি চেয়েছিলেন, তিনি শুধু তাই সমর্থন করেন নি।

এমন কোন আচরণের নযীর আছে কি, যেখানে বিজয়ী জাতি বিজিত জাতির কাছ থেকে নামমাত্র একটা কর (যা বর্তমান কালের করের সাথে তুলনীয়) আদায়ের পরিবর্তে তাদের ধর্ম ও আইনের স্বাধীনতার পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়েছে এবং তাদের নিজেদের মতই সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার অধিকার দিয়েছে।

না, অস্ত্র মুহাম্মদ (স)-এর ধর্ম প্রচারের হাতিয়ার ছিল না। বরং তলোয়ার ছিল তাঁর ধর্মের রক্ষক। কারণ এ বাণীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ঃ "আল্লাহ্ যাকে খুশী পথ দেখান, আর সেই ত পথ পেল। আর যাকে তিনি গোমরাহ্ করেন, তার সাহায্যের জন্য পথপ্রদর্শনকারী হিসেবে কাউকে পাবে না।"[১৭]

খৃস্টানদের মধ্যে বাণী প্রচার

ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন যে, আরবের বিভিন্ন জাতিকে একত্রীভূত করার এবং আরব উপদ্বীপে বসবাসকারী খৃস্টানদের পরাজিত করার পর কতিপয় বর্বর বেদুইন গোত্র উত্তর ও পূর্ব দিকে লুঠ, ডাকাতি ও নানা প্রকার অত্যাচার শুরু করে দেয় এবং বাইজেন্টাইন ও পারস্য সভ্যতা ধ্বংস করে দিয়ে উত্তর, দক্ষিণ এবং পূর্ব এলাকার দুর্বৃত্তদের আক্রমণ থেকে যারা এসব প্রাচীন সভ্যতা

www.nagorikpathagar.org

রক্ষা করছিল, তাদের তাড়িয়ে দেয়। এসব লোক বিশ্বাস করে যে, আরবদের আবির্ভাব হুন ও পঞ্চম শতাব্দীতে রোম নগর লুণ্ঠনকারীদের মতই, যারা ক্ষুধার তাড়নায় ও লোভের বশবর্তী হয়ে এবং স্বীয় ঐতিহ্যে গর্বিত হয়ে পূর্বাঞ্চল থেকে আগমন করেছিল। অথবা তারা ছিল মোঙ্গল ও তাতারদের মত অসভ্য জাতি যারা জনগণকে তাদের সম্পত্তি থেকে উৎখাত করার জন্য বর্বর শক্তি প্রয়োগ করেছিল।

যে আরব জাতি ইসলামের মহান বাণীর ধারক, তাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ ইতিহাস ও সত্যের অপলাপ মাত্র। একথা সত্য যে, এ বাণীর ধারকগণ আরবের যাযাবর শ্রেণীভুক্ত ছিল, যারা এক সময় লুঠ ও খুন-খারাবি পছন্দ করত। কিন্তু ইসলাম গ্রহণ করে শরীয়তের জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার পর তাদের মন থেকে প্রাথমিক জীবনের গর্ব ও লোভ দূর হয়ে যায় এবং তাদের মন মহৎ চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়। সে জন্য মুসলিম যাযাবরেরা যে উত্তরাধিকার রেখে গেছে, তা ধ্বংসাত্মক নীতির দ্বারা পরিচালিত অপরাপর যাযাবর জাতির উত্তরাধিকার থেকে পৃথক।[১৮]

আরবরা ফ্রান্স থেকে শুরু করে চীন ও ভারত পর্যন্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করে এবং এসব দেশের জনগণ আরবীয় বেশভূষা ও রীতিনীতি গ্রহণ করে নেয়। ওয়াদার প্রতি তাদের নিষ্ঠা এবং আইন ও ন্যায়ের প্রতি তাদের আনুগত্য পৃথিবীতে অন্য জাতিসমূহের কাছে দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায় এবং তা ঐতিহাসিক ও সত্য সন্ধানীদের কাছে প্রশংসার বিষয় হয়ে ওঠে। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ এবং ইসলামের বাণী গ্রহণ করার পর বেদুইনরা একক বা গোষ্ঠীগতভাবে অন্য লোকের প্রতি মানবিক আচরণ করে এবং অন্যকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা থেকে বিরত থাকে। এতেই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। তুর্কী এবং সাধারণ লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করার পর ওয়াদা পালন, আইনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধৈর্যের পরিচয় দেয়। এসব তারা মুসলিম রীতি থেকেই গ্রহণ করে। তারা ইসলামের মূল আবেদনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সহনশীলতার পরিচয় দেয়। ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর মত কতিপয় আদর্শ বা ধর্মেও এ ধরনের ন্যায়বিচার, ধৈর্য, উন্মুক্ত চিন্তা ও আত্মত্যাগের সমন্বয় ঘটেছে। তা সে আদর্শ আরব বা তুর্কী কর্তৃক বিস্তার লাভ করুক বা না করুক।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী অনেক অনমনীয় হৃদয়কে নমনীয় করেছে এবং নিষ্ঠুর হিসেবে পরিচিত অনেক জাতির মধ্যে বিনয় ও নৈতিকতার বীজ প্রতিষ্ঠা করেছে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশকে সর্বোচ্চে স্থান দিয়ে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে গেছে। আরব ও অনারব নির্বিশেষে সবার উদ্দেশে আল্লাহ্ ঘোষণা করেন ঃ "যাদেরকে কিতাব দান করা হয়েছে, যারা নিরক্ষর তাদেরকেও আপনি বলুন—তোমরা মেনে

www.nagorikpathagar.org

নাও। যদি তারা অনুগত হয়, তবেই সরল পথ পাবে। আর যদি বিমুখ হয়, তবে শুধু পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে আপনার দায়িত্ব।"[১৯]

বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম ছিল খৃস্টধর্ম। আফ্রিকার তওরাস পর্বতমালা থেকে আটলাস পর্বতমালার বিস্তীর্ণ এলাকা যা বর্তমানে সিরিয়া, মিসর, ত্রিপলী, তিউনিসিয়া ও আলজিরিয়ার অন্তর্গত তার কতিপয় এলাকা আরবরা খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মুক্ত করে। এ সময় নতুন ধর্ম ইসলামের আগ্রহ ও উদ্দীপনা ছিল অত্যধিক।

বিজিত এলাকার খৃস্টানরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত ছিল এবং তারা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল আরব এবং অনেকে ছিল অনারব। কোন্ পন্থা অবলম্বন করে বিজয়ীরা বিজিতদের একত্রীভূত করেছিল ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার ভার আমরা বিজ্ঞ ও এ সম্পর্কে অসাধারণ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন ঐতিহাসিক স্যার থমাস আর্নল্ড-এর ওপর ছেড়ে দিতে পারি। 'দি প্রিচিং অব ইসলাম' পুস্তকে তিনি এ ধারণা ব্যক্ত করেছেন যে, মুসলমানদের তত্ত্বাবধানে খৃস্টানদের চার্চ আরও শক্তিশালী হয়েছে এবং তার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। মুসলিম শাসন তাদের ক্রমোন্নতির পথে কোন বাধার সৃষ্টি করেনি।

বস্তুত মুসলিম শাসনামলে খৃস্টান চার্চের কোন অবনতি হওয়া ত দূরের কথা, মুসলমানদের প্রজা হওয়ার পর নেস্টোরিয়ানদের ধর্মীয় কার্যকলাপ আরও জোরদার হয় এবং তারা নতুন বলে বলীয়ান হয়। খলীফাদের শাসনামলে দেশের অভ্যন্তরে তারা যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল, তাতে তারা দেশের বাইরে খৃস্টান মিশনারী পাঠাবার সুযোগ পায়। ভারত এবং চীনেও মিশনারী পাঠান হয় ... ... অন্য খৃস্টানরা যদি অনুরূপ কর্মতৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হয়ে থাকে, তাতে মুসলমানদের দোষ দেওয়া যায় না। মুসলিম সরকার সব কিছুই সহ্য করে এবং একে অপরকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখে।[২০]

বিভিন্ন খৃস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে কিরূপ অশুভ তৎপরতা চলত এবং পক্ষপাতহীন ও চরম ধৈর্যের সাথে অত্যাচারিতকে সাহায্য করার জন্য মুসলমানরা কিভাবে হস্তক্ষেপ করতে যে বাধ্য হয়েছিল, তারও বিবরণ স্যার থমাস আর্নল্ড দিয়েছেন।[২১]

ইসলামের প্রথম যুগে খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানরা যে ধৈর্য ও বদান্যতার পরিচয় দেয়, সে সম্পর্কেও স্যার আর্নল্ড বিশদ বর্ণনা দিয়ে গেছেন। যে সমস্ত দৃষ্টান্ত এবং ঘটনা তিনি প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত করেছেন, তাতে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে, তলোয়ার দ্বারা মুসলমানরা খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করেনি। বরং তলোয়ারের অভিযোগ মিথ্যা এবং অযৌক্তিক। খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণের কারণ ব্যাখ্যা করতে গেলে আমাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

স্যার আর্নল্ডের মতানুসারে, ইসলামের প্রথম যুগে খৃস্টানরা বিশেষ করে শহরে বসবাসকারী খৃস্টানরা তাদের জান, মাল ও ধর্মীয় বিশ্বাসের এত বেশি নিরাপত্তা ও স্বাধীনতা পেয়েছিল যে, এ সুযোগে তারা যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেছিল এবং বিপুল ধন-সম্পত্তির মালিক হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই খলীফার দরবারে প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিল। এ সম্পর্কে তিনি বহু প্রমাণ দেখিয়েছেন এবং বিশেষ করে সালমাওয়াহ্ ও ইবরাহীম নামে দুই খৃস্টান ভাইয়ের একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁরা দুভাই খলীফার দরবারে উযীরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এদের মধ্যে একজন ছিলেন মুসলমানদের ধন-ভাণ্ডারের উযীর। একবার ইবরাহীম অসুস্থ হয়ে পড়লে খলীফা আল-মুতাসিম তাঁর গৃহে গমন করেন। ইবরাহীম মারা গেলে খলীফা এতই শোকাভিভূত হয়ে পড়েন যে, তিনি তাঁর লাশ দরবারে নিয়ে আসার আদেশ দেন এবং সেখান থেকেই শোকমিছিল শুরু হয়। অন্য খৃস্টান উযীরদের মধ্যে নসর ইবনে হারুনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। বুয়াইদ শাসনকর্তা আদুদ আদদৌলার[২২] তিনি প্রধান উযীর ছিলেন। কথিত আছে যে, বুয়াইদ শাসনকর্তা বহু চার্চ এবং উপাসনালয় নির্মাণ করেন।

ধর্মীয় সহনশীলতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে স্যার আর্নল্ড আরও দেখিয়েছেন যে, উত্তর আরব, ইরাক এবং সিরিয়ায় গির্জা নির্মাণ করার জন্য খলীফাগণ নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁরা এসব নির্মাণের জন্য চাঁদাও দিয়েছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে নির্মিত এ সব গির্জার কোন কোনটি এখনও বিদ্যমান আছে। এর মধ্যে পুরান কায়রোতে অবস্থিত আবু সারাজাহ্ গির্জা এবং কায়রোর ফুস্তাত এলাকায় নির্মিত গির্জাগুলোর উল্লেখ করা যেতে পারে। উমাইয়া যুগের ইরাক ও পারস্যের গভর্নর খালিদ আল-কাস্রি তাঁর খৃস্টান মায়ের উপাসনার জন্য একটি গীর্জা নির্মাণ করেন। মুসলমানদের সহনশীলতার এর চেয়ে অতুলনীয় দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ? এ সময় ইসলামকে প্রতিনিয়ত খৃস্টানদের আক্রমণের মুকাবিলা করতে হচ্ছিল এবং খৃস্টান বাইজেন্টাইন ও মুসলমানদের মধ্যে একটানা যুদ্ধ চলছিল। এ সম্পর্কে যাঁরা আরও বিস্তারিত জানতে চান, তাঁরা স্যার আর্নল্ডের বই এবং মুসলমান ও অমুসলমানদের সম্পর্কের প্রশ্নে তিনি যে সূত্রগুলোর উল্লেখ করেছেন তা পড়ে দেখতে পারেন।

ইসলামী বিজয়ের প্রথম দিকে আরবীয় মুসলমান ও খৃস্টানরা পরস্পর ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ ছিল এবং তারা একে অন্যের প্রতি এত বেশি সহনশীল ছিল যে, আরব কৃষ্টি ও সভ্যতা রক্ষার জন্য ও মুসলমান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ন্যায়বিচার কায়েমের জন্য মুসলমানদের সাথে আরবের খৃস্টানরা একযোগে যুদ্ধ করেছিল। ইসলামের ইতিহাসে খৃস্টানদের অনেক সহযোগিতার ঘটনা আছে। ইরাক, সিরিয়া এবং মিসরে অনেক

www.nagorikpathagar.org

খৃস্টান তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও মুসলমানদের আরব সাম্রাজ্য গড়ে তোলার ব্যাপারে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

আল-জিস্‌র যুদ্ধে মুসান্নার সৈন্যদল যখন দুর্বল হয়ে ইউফ্রেতিস ও পারস্য বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তখন মুসলমানদের প্রধান সমর্থক বনূ-তায় গোত্রের খৃস্টানরা দুর্বার আক্রমণ চালিয়ে মুসলমান বাহিনীকে উদ্ধার করে। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য আল-মুসান্না জনগণের সাহায্য প্রার্থনা করলে বনূ-নুমায়ের গোত্রের খৃস্টানরা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসে। বুয়ারের যুদ্ধে আরববাসী খৃস্টানরা আরববাসী মুসলমানদের পাশে থেকে যুদ্ধ করে। এ যুদ্ধের সত্যিকার গৌরব বনূ-তাগলিব গোত্রের খৃস্টানদের প্রাপ্য ছিল। দু'পক্ষের মধ্যে সংঘটিত তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে একজন খৃস্টান পারস্য বাহিনীর সেনাপতিকে খুঁজে বের করে তার শিরশ্ছেদ করে। অন্যান্য জিনিসসহ নিহত কমাণ্ডারের ঘোড়া নিয়ে যখন সে মুসলমানদের মাঝখান দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল, তখন সে গর্বভরে ঘোষণা করেছিল যে, সে তাগলিব গোত্রের খৃস্টান। আর তার সাহায্যের জন্য মুসলমানরা বিশেষভাবে তার প্রশংসা করেছিল।[২৩]

তাগলিব গোত্রের লোকেরা খৃস্টানই থেকে যায়। এরাই একমাত্র উপজাতি, যারা জিযিয়া কর প্রদান করতে অস্বীকার করে এবং এর পরিবর্তে মুসলমানদের অনুকরণে সাদকা[২৪] দেওয়ার অনুমতি চায়। খলীফা উমর তাদের ইচ্ছা পূরণ করার আদেশ দেন। তিনি বলেন, "আরববাসীকে মনঃকষ্ট দিও না। বনূ তাগলিবদের কাছ থেকে সাদকা নিয়ে নাও।"

কি জন্য বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন স্থানে খৃস্টানরা তাদের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তা স্যার আর্নল্ড যুক্তি সহকারে এবং অত্যন্ত বিজ্ঞতার সাথে তাঁর পুস্তকে উল্লেখ করে গেছেন। এসব প্রমাণ যুগ যুগ ধরে মুসলমানদের ও প্রত্যেক জাতির গর্বের বস্তু হয়ে থাকবে। কারণ এর মধ্যে অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি মুসলমানদের সহনশীলতা, বদান্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বিধৃত। ঐতিহাসিকদের মতে, খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে নতুন ধর্ম ও তার প্রচারকদের প্রতি হতাশা, সংস্কারবিমুখতা, স্বধর্মীদের দুর্ব্যবহার বা ধর্মযাজকদের অবহেলা, পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ-লালসা এবং সবশেষে আল্লাহ্ কর্তৃক তাদের সৎপথে পরিচালনা সবই ক্রিয়াশীল ছিল। খৃস্টানদের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে অমুসলিম ঐতিহাসিকরা যখন এ ধারণা পোষণ করেন, তখন প্রমাণিত হয় যে, তলোয়ারের সাহায্যে ইসলাম প্রচার করা হয়নি।

অবশ্য ইসলামের ইতিহাসে খৃস্টানদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনীও আছে। এসব ঘটেছিল আব্বাসীয় খলীফা আল-মুতওয়াক্কিল, ফাতেমীয় খলীফা আল-হাকিম ও

www.nagorikpathagar.org

মামলুকদের সময়ে। আল-মুতওয়াক্কিল মুসলমানদের প্রতিও কঠোর ছিলেন। শিয়া ও মুতাজিলা সম্প্রদায়ের প্রতি তিনি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। আর আল-হাকিমের লক্ষ্য ছিল শিয়া ছাড়া অন্যান্য মুসলমানের ওপর অত্যাচার করা। গোঁড়ামির জন্য খৃস্টানরা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সমস্ত খলীফার আমলে মুসলমানদের অবস্থাটাও স্মরণ রাখতে হবে। যা হোক, অত্যাচারটা ছিল ব্যতিক্রম—নিয়ম নয়। এক হাজার বছরের বেশি মুসলিম শাসনে যদি দু'-একটা বিচ্ছিন্ন অত্যাচারের ঘটনা ঘটেও থাকে, তবে তা মুসলমানদের সহনশীলতা ও ন্যায়পরায়ণতার ইতিহাসকে ম্লান করে দিতে পারে না।

সুদূর অতীতে খৃস্টানদের প্রতি অত্যাচারের যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে তার অধিকাংশই ঘটেছে তাদের ধন-সম্পত্তি ও প্রতিপত্তির ওপর ঈর্ষাবশত অথবা এ ভেবে যে, তারা তাদের ধন-সম্পত্তির ও প্রতিপত্তির অপব্যবহার করছে বা আশংকার কারণ সৃষ্টি করেছে। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে খৃস্টানরা মুসলমানদের রাষ্ট্রে বসবাস করে ষড়যন্ত্র ও গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করেছে অথবা স্বধর্মীদের প্রতি অত্যাচার চালিয়েছে। এজন্যই অনেক শাসক তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছেন এবং কতিপয় খারাপ ধরনের লোককে শাস্তি দেওয়ার জন্য জনসাধারণকে লেলিয়ে দিয়েছেন। মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক ও আন্দালুসিয়ার সুদীর্ঘ ইতিহাসে খৃস্টান উৎপীড়নের যে কয়েকটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা আছে, তা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ধর্মীয় কারণের চেয়ে রাজনৈতিক কারণেই এসব ঘটেছে। যে জিনিসটা মুসলমানদের একটা বিরাট গর্বের উৎস তা হল, তারা তাদের শাসনের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কখনও ঐ ধরনের স্বৈরাচারী ও নিষ্ঠুর আইনের আশ্রয় গ্রহণ করেনি, যে ধরনের আইন আমরা ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইসাবেলার স্পেনে, লুইস চতুর্দশের ফ্রান্সে এবং ইংল্যাণ্ডে দেখতে পাই। লুইস চতুর্দশের নিষ্ঠুরতার লক্ষ্য ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদ এবং ইংল্যাণ্ডে উৎপীড়ন চলেছিল য়াহূদীদের বিরুদ্ধে। য়াহূদীদের চার শতাব্দী ধরে ইংল্যাণ্ডে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি।

স্যার আর্নল্ডের মতে, প্রাচ্যের ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে খৃস্টান চার্চ ও ধর্মের অবস্থিতি অন্য ধর্মের প্রতি ইসলামের সহনশীলতারই স্পষ্ট প্রমাণ।

বিরূপ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের কাছে ইসলাম তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হয়নি। বরং অনেক দেশে এ তলোয়ার য়াহূদী, মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের রক্ষা করেছে। মুসলমানদের নবী যেখানে খৃস্টানদের সাথে মৈত্রী স্থাপন করেছেন, তাদের ধন-সম্পত্তি ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়েছেন, তাদের ধর্মযাজকদের নিরাপত্তা বিধান করেছেন, সেখানে মুসলমানরা কিভাবে তাদের সাথে ভিন্ন ধরনের ব্যবহার করবে? পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আপনি দেখতে পারেন—যারা ঈমান এনেছে

www.nagorikpathagar.org

তাদের সাথে সব চাইতে বেশি শত্রুতা পোষণ করছে য়াহূদী আর মুশরিকরা আর মুমিনদের সাথে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তাদেরকেই খুব কাছে পাবেন, যারা বলছে ঃ আমরা ত নাসারা (খৃস্টান)। কারণ তাদের মধ্যে বিদ্বান ও সাধু লোক রয়েছে। আর তারা মোটেই অহঙ্কার করে না।"২৫

ক্রুসেডারদের ইসলাম গ্রহণ

প্রথমে আরব এবং পরে তুর্কীদের আহ্বানে ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী খৃস্টান রাষ্ট্রগুলো স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ঘটনা হল ক্রুসেডারদের বৃহদাংশের ইসলাম গ্রহণ। বিভিন্ন জাতি ও বংশের সমন্বয়ে গঠিত ক্রুসেডাররা ঘৃণায় বিষাক্ত মন ও রক্তে রঞ্জিত হাত নিয়ে প্রাচ্যে আগমন করেছিল এবং তাদের মতবাদ যারা না মানত, তাদের এবং অপরাপর খৃস্টান গোত্রের লোকদেরও শিরশ্ছেদ করতে করতে তারা সম্মুখের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু বেশিদিন যেতে না যেতেই এ নিষ্ঠুর ক্রুসেডাররা তাদের চরম শত্রুর ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে, তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হয়ে যায় এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি লোপ পায়। যাদের তারা ঘৃণা করত, তাদের কাছে তারা সহনশীলতা ও ক্ষমা করা শিখতে শুরু করে। পশ্চিম থেকে নববলে বলীয়ান হয়ে এসেও তারা তাদের স্বধর্মীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ অপেক্ষা মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ আচরণ দেখে বিমুগ্ধ হয়ে পড়ে। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, যারা মুসলমানদের দেশ আক্রমণ করে তাদের গলা কাটার জন্য তথা ইসলাম ধ্বংস করার জন্য আগমন করেছিল, সেই ক্রুসেডের নেতারাই ইসলাম গ্রহণ করতে শুরু করে। সহনশীলতার এটা একটা অনন্য অবদান।

প্রথম ক্রুসেড সমরে যিনি সর্বপ্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন তিনি ছিলেন লোম্বার্ড গ্রুপের জার্মান নেতা রিনড। তাঁর সাথে সাথে লোম্বার্ড গ্রুপের লোকেরাও ইসলাম গ্রহণ করে। দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধে অনেকে মুসলমান হয়। স্যার আর্নল্ড সেন্ট ডেনিসের মতবাদ-সমর্থক একজন খৃস্টান সাধুর কথা বলেছেন। তিনি তাঁর বহু সমর্থক নিয়ে দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি এক সময় রাজা সপ্তম লুই-এর ব্যক্তিগত পুরোহিত ছিলেন। সাধু নিজেই নিম্নোক্ত হৃদয়বিদারক ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন ঃ

"এশিয়া মাইনর থেকে স্থলপথে জেরুজালেম যাওয়ার কালে ফ্রাইজিয়া গিরিবর্তে ক্রুসেডাররা তুর্কীদের হাতে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হয় (১০৪৮ খৃঃ) এবং বহু কষ্টে তারা আত্তালিয়া সমুদ্রবন্দরে উপস্থিত হয়। এখানে গ্রীক বণিকদের যারা চড়া দাম দিতে পেরেছিল কেবল তারাই অ্যান্টিয়কে পৌছাতে পারে। অসুস্থ, আহত এবং অধিকাংশ লোককে তারা বিশ্বাসঘাতক-মিত্র গ্রীকদের দয়ার ওপর ছেড়ে দেয়।

www.nagorikpathagar.org

গ্রীকেরা লুই-এর কাছ থেকে এ শর্তে পাঁচ শ মার্ক গ্রহণ করে যে, তারা যাত্রীদের নিরাপদে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে এবং অসুস্থ ও আহত লোককে চিকিৎসা করার পর সুস্থ হলে পরবর্তী পর্যায়ে তাদের দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। কিন্তু সৈন্যরা চলে যাওয়ার সাথে সাথেই গ্রীকরা ক্রুসেডারদের অসহায় অবস্থার কথা তুর্কীদেরকে জানিয়ে দেয়।

অসহায় ক্রুসেডারদের শিবিরে যখন দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং শত্রুর তীর ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করে, তখন গ্রীকরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। অন্য কোন উপায় না দেখে এদের মধ্যে চার-পাঁচ হাজার লোক পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয় এবং তুর্কীরা তাদের কেটে টুকরা টুকরা করে ফেলে। তারপর তারা তাদের বিজয়কে সফল করার জন্য তাদের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হয়। যারা বেঁচেছিল, তাদের দুর্গতি দেখে মুসলমানদের দয়া না হলে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হত। মুসলমানরা রোগীদের শুশ্রূষা করে এবং ক্ষুধার্তকে খাওয়াবার ব্যবস্থা করে। তাদের কাছ থেকে বলপূর্বক চাতুরী করে যে সব ফরাসী মুদ্রা গ্রীকরা যোগাড় করেছিল, মুসলমানদের অনেকে কিনে নিয়ে তা তাদের মধ্যে অকৃপণভাবে দান করে। ভিন্নধর্মী মুসলমান ও স্বধর্মী গ্রীক খৃস্টানদের ব্যবহারের মধ্যে পার্থক্য ছিল আকাশ-পাতাল। গ্রীকরা তাদের বলপূর্বক খাটিয়েছিল, নির্মমভাবে প্রহার করেছিল এবং তাদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছিল। এ বৈষম্যের জন্য অনেকেই পরে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করে।"

প্রধান এই ঘটনাপঞ্জী লেখক বলেন ঃ "তারা তাদের নিষ্ঠুর স্বধর্মীদের ত্যাগ করে মহানুভব ভিন্ন-ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় গ্রহণ করে। আমরা শুনেছি যে, তিন হাজারেরও বেশি ক্রুসেডার তুর্কীদের সাথে যোগদান করে। ওহ ! মহানুভবতা সব রকমের বিশ্বাসঘাতকতা থেকে কত বেশি কার্যকর। তারা রুটি দিয়ে তাদের বিশ্বাস কেড়ে নেয়। একথা সত্য যে, তাদের সেবা ছিল সন্তোষজনক এবং তারা কাউকে তাদের ধর্ম ত্যাগের জন্য বাধ্য করেনি।"[২৬]

এটা হল একজন খৃস্টান সাধুর দেওয়া সাক্ষ্য। স্যার আর্নল্ডের মতে, খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানই ছিল মুখ্য এবং মুসলমানদের গুণাবলী সম্পর্কে ক্রুসেডাররা যত বেশি অবহিত হচ্ছিল ততই তাদের ধর্মমতে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছিল। বরং এটাই ক্রুসেডারদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলেছিল। ক্রুসেডারদের প্রাথমিক ঘটনাপঞ্জী লেখকদের বিবরণ থেকেও জানা যায় যে, পবিত্র ভূমিতে ফ্রাঙ্কদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রীতিনীতি ও জীবনধারার মধ্যে অসংখ্য বাধ্যবাধকতা ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমানদের প্রাচ্য রীতিনীতি ছিল এ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ প্রভাবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ইসলামের প্রতি খৃস্টান নাইটদের সহনশীল

www.nagorikpathagar.org

মনোভাব—যে মনোভাবের বিরুদ্ধে যাজকরা জোরালো প্রতিবাদ তুলেছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিরিয়ার আমীর উসামা-বিন-মুনকিদ চুক্তির মধ্যবর্তী সময়ে জেরুজালেম সফরে এলে আল-আকসা মসজিদের দখলদার নাইট টেম্পলার তাঁকে নামায আদায় করার জন্য উক্ত মসজিদ-সংলগ্ন একটা ছোট কামরা ছেড়ে দেন। এ নাইটরা মুসলমানদের ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্য নতুনভাবে আগত ক্রুসেডারদেরও নিন্দা করত।"[২৭]

স্যার আর্নল্ড স্বীকার করেন যে, দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই মুহাম্মদ (স)-এর বাণী ক্রুসেডারদের অনেককেই মুগ্ধ করে এবং একটা ঘটনা গবেষকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[২৮]

ক্রুসেডারগণ কর্তৃক সালাহ্‌উদ্দীনের সাহস ও গুণের প্রশংসা এমনই কার্যকরী হয়েছিল যে, তাদের অনেক নেতা ও অনুচর নিজেদের ধর্ম ও আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে। হিত্তিন যুদ্ধে (১১৮৭) জয়লাভ করার পূর্বেই ইংরেজ নেতা ইসলাম গ্রহণ করেন। কোন কোন খৃস্টান ঐতিহাসিক স্বীকার করেছেন যে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার রাতেই জেরুজালেমের রাজপরিবারের ছ'জন যুবরাজকে গ্রেফতার করা হয়, কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল অথচ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে কেউ তাদেরকে বাধ্য করেনি। স্বেচ্ছায় তারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এ ঘটনা চরম পর্যায়ে পৌঁছায় যখন ত্রিপলীর যুবরাজ সালাহ্‌উদ্দীনের সাথে সমঝোতায় আসেন এবং নিজ প্রজাবৃন্দের প্রতি ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান।

মুসলমান কর্তৃক আখড়া দখলের ফলে জেরুজালেমের পতন ঘটলে ক্রুসেডারগণ তৃতীয়বারের মত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে গিয়ে ভীষণ দুরবস্থায় পতিত হয় এবং তাদের মধ্যে ভীষণ খাদ্য সমস্যা দেখা দেয়। ফলে তাদের অনেকে পালিয়ে গিয়ে মুসলমানদের পক্ষে যোগদান করে। এদের মধ্যে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, অনেকে নিজের শিবিরে ফিরে যায়, আবার অনেকে খৃস্টান থেকেই মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ করে। ক্রুসেডারদের সমসাময়িক স্যার জন ম্যানডেভিল বলেন যে, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা বা দুর্গতির জন্য তখন কতিপয় খৃস্টান তাদের ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হয়। অজ্ঞতা এবং দুর্গতি ছাড়া মুসলমানদের ধর্মের গুণাবলীর ব্যাখ্যা স্যার জনের মত একজন গোঁড়া ক্রুসেডারের কাছ থেকে কেউ আশা করে না। আমাদের বক্তব্য হল—গরীব ও ক্ষতিগ্রস্ত লোক, যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল বলে ম্যানডেভিল উল্লেখ করেছেন, তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছিল ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েই। তাদের ওপর অত্যাচার বা উৎপীড়ন করা হয়েছিল বলেই যে তারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, একথা ঠিক নয়। বাস্তবে দেখা যায়, ইসলামের বিজয় তথা পবিত্র স্থানসমূহ পুনর্দখলের সমসাময়িক কালে এবং সিরিয়ায় ফ্রাঙ্কদের রাষ্ট্রীয় পতনের

www.nagorikpathagar.org

অনেক পরেও কতিপয় খৃস্টান ঐতিহাসিক ক্রুসেডারদের কবল থেকে মুক্ত স্থানীয় খৃস্টানদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাঁরা তাদের আনন্দে শরীক হয়েছেন। স্যার আর্নল্ড বলেন যে, এসব খৃস্টান ইসলামের শাসন ব্যবস্থা মেনে নিয়ে ভবিষ্যতের আশায় ইসলামের সাথে সমঝোতায় পৌছেছিল। মুসলমান শাসকরাও অন্যান্য ধর্মের লোকদের প্রতি তাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত সহনশীলতা ও উন্মুক্ত মনের পরিচয় দিতে কার্পণ্য করেন নি।

আমরা আগে যা উল্লেখ করেছি, তাতে প্রমাণ হয় যে, ইসলামী রাষ্ট্রের সবচেয়ে অনিশ্চিত সময়ে ক্রুসেড ও তাতারদের আক্রমণের কালে ইসলামের বড় শক্ররা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানেই ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এবারে আমরা উমাইয়া আমলের খোরাসানের একজন উর্ধতন যাজকের সাক্ষ্য উল্লেখ করে এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি টানবো। খৃস্টান যাজক তৃতীয় ইউসাব আর একজন যাজকের নিকট লিখিত এক বিবরণীতে বলেছিলেন ঃ

"হে পুত্র-বঞ্চিত পিতা, তোমার পুত্রগণ কোথায় যারা তলোয়ার, অগ্নি বা অত্যাচার ছাড়াই একদা ভালবাসা দিয়ে প্রায় সবকিছু জয় করেছিল, মেরীর (পারস্যের) সেই ব্যক্তিরা কোথায় ? তারা সব বোকার মত সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিশ্বাসহীনতার নরকের দিকে যাত্রা করেছে—তারা চিরস্থায়ী ধ্বংসের পথেই যাত্রা করেছে। মাত্র দু'জন নামমাত্র যাজক বিশ্বাসহীনতার অগ্নিকুণ্ড থেকে রক্ষা পেয়েছে। হায় হায়! হাজার হাজার খৃস্টানের মধ্যে কেউই সত্য ধর্মের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়ে রক্তে তাদের হাত রঞ্জিত করছে না। কিরমান এবং সমগ্র পারস্যের সে সব পবিত্র স্থানগুলো কোথায় ? পৃথিবীর রাজাদের নির্দেশ বা প্রাদেশিক গভর্নরদের নির্দেশে শয়তান কি তাদের ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়নি ? একজন নিকৃষ্ট শয়তানের ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাস—যাকে অন্য অপদেবতারাও কোন সম্মান করে না, আপনার দেশেও যার নারকীয় প্রবঞ্চনার কোন ক্ষমতা নেই সেই শয়তানের ইঙ্গিতেই আপনার পারস্যের সব গীর্জার পতন ঘটেছে এবং আরবরা, যাদেরকে আল্লাহ্ বর্তমান বিশ্বের সাম্রাজ্য দান করেছেন, সেই আরবরা আপনাদের মধ্যেই রয়েছে এবং আপনি ভাল করেই জানেন যে, তারা খৃস্ট ধর্মকে আক্রমণ করে না বরং উল্টো তারা আমাদের ধর্মকে শ্রদ্ধা করে, আমাদের ধর্মযাজক এবং সাধুগণকে সম্মান করে এবং গীর্জায় সাহায্য করে। তাহলে আপনার লোকজন মেরীর ধর্ম ত্যাগ করে আরবদের ধর্ম গ্রহণ করল কেন ? অথচ আরবরা ধর্ম ত্যাগ করার জন্য তাদের ওপর কোন জোর-জুলুম করেনি বরং এটাকে রক্ষা করতে এবং পবিত্র রাখতে প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি ...।"[২৯]

www.nagorikpathagar.org

যুক্তি দ্বারা ইসলাম যে খৃস্টানদের হৃদয় জয় করেছিল, এর চেয়ে জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত আর কি হতে পারে ? আপনাদের সামনে প্রমাণ উপস্থাপিত করার জন্য আমরা ইসলামের প্রথম এবং সপ্তম শতাব্দী থেকে দৃষ্টান্ত দিয়েছি। পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য থেকে, যুদ্ধবাজ এবং শান্তিবাদীদের থেকে দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। কত জাতি এসেছে গেছে, অতীত হয়েছে কত শতাব্দী এবং পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে পারিপার্শ্বিক অবস্থাও, কিন্তু অপরিবর্তিত রয়েছে এ সত্য, যা মুহাম্মদ (স)-এর বাণী এবং কুরআনের নীতির সাথে সংযুক্ত এবং তা আবির্ভাবের পর থেকে আজও অপরিবর্তিতই রয়ে গেছে। আল্লাহ্ বলেন ঃ "ধর্মের জন্য কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়, সুপথ প্রকাশ্যভাবে কুপথ থেকে পৃথক হয়েছে।"[৩০]

সুতরাং প্রাচ্যের ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু ও সাম্যবাদী জাতির উত্তরাধিকারী হিসেবে আমাদের মুসলমান ও খৃস্টান—উভয়েরই আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিত, বিশ্বাস ও মতামতের স্বাধীনতাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করা এবং বিশ্বের ঐসব লোকের সামনে একটা উদাহরণ সৃষ্টি করা যারা মতামত প্রকাশের সুযোগ দেয় না বা অন্যের মতামত সহ্য করে না। আমাদের পূর্বপুরুষরা মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করেছেন। সেই সহনশীলতা উত্তরাধিকারসূত্রে আমাদের গ্রহণ করতে হবে এবং সেই পতাকা সমুন্নত রাখতে হবে।

ইউরোপে ইসলাম প্রচার

পূর্বে ও পশ্চিম ইউরোপে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী প্রচারের একটা স্মরণীয় ইতিহাস আছে এবং তাতে মুসলমানদের গর্বিত হওয়ার যথেষ্ট কারণও রয়েছে।[৩১] অপরপক্ষে, দুর্ভাগ্যবশত এমন সব ঘটনাও আছে যেখানে খৃস্টানরা তাদের ধর্মকে শক্তিশালী করবার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করেছে এবং তা করতে গিয়ে তারা অনেক কঠোর নীতি ও অপকর্মের আশ্রয় নিয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স এবং ইতালীতে আরব ও বার্বারগণ ইসলামের পতাকা উত্তোলন করেছিল এবং পূর্ব ইউরোপে ইসলাম প্রচার করেছিল অতুলনীয় শক্তি ও সাহসের অধিকারী তুর্কী ও তাতারগণ। তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও মুহাম্মদ (স)-এর বাণী প্রচার করার ব্যাপারে তারা যে অপূর্ব ধর্মীয় সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিল, তা গর্ব ও প্রশংসার দাবি রাখে। অপরদিকে ভাল-মন্দ নির্বিশেষে ইউরোপীয় জাতিসমূহ মুহাম্মদ (স)-এর বাণীকে বাধা দিতে গিয়ে দীর্ঘ একশ বছর ধরে চরম অত্যাচার চালাতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।[৩২]

যেটা ব্যাখ্যা করা সবচেয়ে দুরূহ তা হল, যে জঘন্য নিষ্ঠুরতা তারা পশ্চিম ইউরোপের স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালী এবং পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহে মুসলিম সভ্যতা

www.nagorikpathagar.org

ও ধর্মের প্রচার রোধ করার জন্য চালিয়েছিল, তা থেকে খৃস্টান ও য়াহূদীরাও বাদ পড়েনি। ধর্মীয় কোন ব্যাপারে বা খৃস্টান মতবাদ সম্পর্কে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে তারা চরম নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিত।

ইউরোপের জাতিসমূহ এক গোত্র, এক স্বভাব ও এক এলাকার নয়। প্রাচ্যদেশীয় জাতিসমূহের মত তাদের মধ্যেও জাতিগত, ভাষাগত ও স্বভাবগত পার্থক্য রয়েছে। তাহলে এক ধর্মের ওপর অন্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে গিয়ে হত্যা, শঠতা, অত্যাচার ও হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের ব্যাপারে এতটা ঐক্য তারা দেখাল কি করে ?

তুর্কী, তাতার এবং বার্বার মরুবাসী—যাদের পেশা ছিল যুদ্ধ করা—তারা কি করে ইসলাম প্রচারের ব্যাপারে কেবল যুক্তি ও দৃষ্টান্তের আশ্রয় নিয়েছিল ? ইউরোপে এক জাতি অন্য জাতির ওপরে বা অন্য ধর্মাবলম্বীদের ওপরে যে অমানুষিক উৎপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছিল, মুসলমানদের দীর্ঘ এক হাজার বছরের ইতিহাসে তার কোন নজির মেলে না।

শান্তি ও দয়ার শ্রেষ্ঠ দূত প্রভু যীশু নিজেই হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের শিকারে পরিণত হন। তাঁর বাণী যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করেছিল। সুতরাং খৃস্টানদের এ ধরনের অস্ত্রের ব্যবহারের জন্য যীশুখৃস্ট কিংবা তাঁর প্রচারিত নীতিকে নিন্দা করা চলে না, ধর্মকে দায়ী করা যায় না।

ইসলাম যুদ্ধ অনুমোদন করেছে। মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর প্রচার এবং ইসলামের বিজয়ে হিমালয়, পিরেনিজ, আটলাস বা বলকান পর্বতমালা বাধা সৃষ্টি করতে পারেনি। তবু কেন মুসলমানরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি সর্বোচ্চ সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছিল ? কেন তারা অন্যান্য জাতি ও গোত্রের প্রতি দিয়েছিল এত উদার মনোভাবের পরিচয় ?

খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে এ পার্থক্যের কারণ হয়ত বা তাদের ধর্মীয় নির্দেশাবলী।

খৃস্টানদের পাদরী সম্প্রদায়ের একটা সংস্থা আছে। অন্য কথায় তাদের মধ্যে এমন একটা যাজকীয় ব্যবস্থা চালু আছে, যাতে যাজক শ্রেণীর নেতারা অন্য সাধারণ লোকদের চেয়ে উঁচু শ্রেণী বলে গণ্য। তাছাড়া পার্থিব ব্যাপারে খৃস্টধর্ম ইসলামের ন্যায় এত সুস্পষ্ট নয়। ফলে মানবীয় ব্যাপারে তাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ দেখা দেয়। ইসলামে পুরোহিততন্ত্র বা যাজক নেতৃত্ব নিষিদ্ধ। ইসলাম বিবেক ছাড়া আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের আর কোন মাধ্যম অনুমোদন করে না। এদিকে পার্থিব ব্যাপারে ইসলামের নিষেধ ও অনুমোদনগুলো খুবই স্পষ্ট। খৃস্টানদের মধ্যে যুগে যুগে আমরা যে ধর্মীয় গোঁড়ামি লক্ষ্য করে আসছি, তার কারণ সম্ভবত উপরোক্ত ধর্মীয় সংস্থার আধিপত্য।

www.nagorikpathagar.org

একইভাবে, কোন্‌টা নিষিদ্ধ এবং কোন্‌টা করণীয় তা মুসলমানদের ওপর অবতীর্ণ কিতাব তথা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। সাধারণ এবং উপযুক্ত—এই উভয় প্রকারের লোকই জানে যে, ধর্মের ব্যাপারে জবরদস্তি আল্লাহ্ নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা আরও জানে যে, আল্লাহ্ তাঁর রসূলকে বলেছেন, "আপনার পালনকর্তা যদি ইচ্ছা করতেন, তবে দুনিয়ার বুকে যত মানুষ রয়েছে, তাদের সবাই ঈমান আনত। আপনি কি লোকদের ওপর জোর-জবরদস্তি করতে চান—যাতে তাদের সবাই ঈমানদার হবে ?"৩৩ যে ধর্ম তার অনুসারিগণকে অন্য ধর্মের প্রতি ঘৃণা করতে নিষেধ করে দিয়েছে, সেই ধর্মে উৎপীড়ন বা নির্যাতনের কোন স্থান থাকতে পারে না। আল্লাহ্ বলেন, "আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে যাদের ওরা ডাকছে, তাদের তোমরা মন্দ বলো না। কেননা তাহলে তারা অজ্ঞানতাবশত আল্লাহ্‌কে অতিরিক্ত মন্দ বলে ফেলবে। এমনি করে প্রত্যেকটি জাতির কাজকর্ম সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি। পরে অবশ্য তাদের নিজেদের পালনকর্তার দরবারেই ফিরতে হবে। তখনই তিনি বলবেন, যে সব কাজ-কর্ম তারা করেছে।"৩৪

ইসলাম ধর্মের সরলতাই মুসলমানদের ধৈর্যশীলতার একটা বড় কারণ। কেননা এ ধর্মের মূল ভিত্তিই হল ঃ "আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ (স) তাঁর প্রেরিত পুরুষ।" 'আল্লাহ্' এবং 'মুহাম্মদ'—এ দুটো শব্দই মুসলমানদের একত্র রাখার একমাত্র শক্তি।৩৫ এ সহজ, সরল ও সোজা বিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হয় বলেই এবং আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে যা কিছু আছে তার ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দেয় বলেই মুসলমানরা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন মত পোষণকারীদের প্রতি এত ধৈর্য ও মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারে।

মুসলমান ও খৃস্টানদের ধর্মীয় আইনের মধ্যে যে পার্থক্য বিদ্যমান তার জন্য এ কারণগুলোই দায়ী। যে পার্থক্যের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা ব্যাখ্যা করার জন্য দীর্ঘ ইতিহাস ঘাঁটবো না। কারণ যাঁরা সত্যের পিপাসু তাঁরা সহজেই এটা বুঝতে পারবেন। তবু, আমরা যদি কতিপয় প্রমাণ বিশ্লেষণ করি, তবে তা আমাদেরই উপকারে আসবে।

মুসলমানরা স্পেনে প্রবেশ করার কালে টলেডোর ষষ্ঠ পরিষদ এক আদেশ জারি করেছিল যে, সিংহাসনে আরোহণ করার সময় রাজাদের এ মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, তাদের রাজ্যে যে লোক ক্যাথলিক মতবাদে বিশ্বাস করবে না, তাকে সহ্য করা হবে না এবং আইন অনুযায়ী তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। অন্যান্য শাস্তি ছাড়াও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধান এ আইনে ছিল। বডিসিন (Baudissin) বলেন ঃ পুরোহিতগণ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অপরিসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বিশপ এবং সর্বোচ্চ ধর্মযাজকগণ জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

এ পরিষদ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত, রাজার নির্বাচন অনুমোদন করত এবং তাঁদের আদেশ রাজা অমান্য করলে তারা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারত। খৃস্টান পুরোহিতরা তাদের ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে য়াহূদীদের ওপর অত্যাচার করত। স্পেনের লোকসংখ্যার এক বিরাট অংশ ছিল য়াহূদী।[৩৬]

হেলফেরিচের (Helfferich) মতে ঃ

যারা খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হতে অস্বীকৃতি জানাত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ জারি করা হত। সেজন্য সাধারণ লোকেরা আক্রমণকারী আরবদেরকে নিষ্ঠুর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষাকারী হিসেবে গ্রহণ করে। যেসব ক্রীতদাস খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল, তারাও আরবদের আগমনে খুশী হয় এবং যাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছিল তারা দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করে অভিজাত সম্প্রদায় এবং সাধারণ লোক এই নয়া স্বাধীন ধর্ম সম্পর্কে গভীর উৎসাহ দেখায়।[৩৭]

আর স্যার থমাস আর্নল্ড বলেন ঃ

ধর্মান্তরিত স্পেনীয়রা মুসলমান হওয়ার পর নতুন ধর্মের প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী হয়ে ওঠে। অভিজাত সম্প্রদায়ের বল্গাহীন আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রার চেয়ে তারা ছেলেমেয়েসহ মুসলমানদের দলে যোগদান করে।[৩৮]

আরবদের বিজয়ের দিনগুলোতে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করার বা অত্যাচার উৎপীড়ন করে কাউকে ধর্ম ত্যাগে বাধ্য করার কোন ঘটনা দেখা যায় না। ইউরোপের পশ্চিমাংশ এত তাড়াতাড়ি মুসলমানদের অধীনে আসার প্রাথমিক কারণ সম্ভবত তাদের ধর্মীয় মহানুভবতা ও ধৈর্য। মুসলমান গভর্নরগণও একই রকম প্রশংসনীয় ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে খৃস্টানদেরকে তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তারা খৃস্টানদের সাথে খোলাখুলিভাবে মিশতেন এবং তাদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপন করেছিলেন। এ কারণে অনেক খৃস্টান মুসলমানদের আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে, অনেকে আরবী নাম গ্রহণ করে এবং অনেকে তাদের মুসলমান ভাইদের মত খাতনা করা শুরু করে। আরব শাসনাধীনে এ সমস্ত খৃস্টানকে 'মুজারিব' বা 'আরবীয় বলা হত। আরবীয় খৃস্টানরা কুরআনের ভাষার এত বেশি প্রশংসা করত যে, তারা কুরআন তিলাওয়াত করতে শুরু করে এবং এতে মুগ্ধ হয়ে পড়ে। তদুপরি ইসলামের বাণী গীর্জা-প্রধানদের কানেও পৌঁছায়। স্পেনের অভ্যন্তরে ও বাইরে তাদের চিন্তাধারার ওপরে ইসলামী আদর্শের প্রতিফলনও পরিলক্ষিত হয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, মুসলমানদের দৃষ্টান্তমূলক আচরণে ও ইসলামের বাণীর প্রাণশক্তির সম্পর্ক থেকে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খৃস্টানরা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। পরাজিত মুসলমানরা যখন ইউরোপ থেকে বিতাড়িত হয় এবং তাদের ওপর বর্বর অত্যাচার চালানো হয় তখনও মুসলমানদের উত্তম আচরণ

www.nagorikpathagar.org

ও বিজ্ঞজনোচিত প্রচার খৃস্টানদের মনকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করে। গ্রানাডার পতনের সাত বছর পর ১৪৯৯ খৃস্টাব্দে স্টার্লিং ম্যাক্সওয়েলের বর্ণনা থেকে একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনার কথা অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেছেন, তলোয়ার ও আগুনের ভয়ে যারা পলায়ন করেছিল, তাদের সাথে নব দীক্ষিত মুসলমানরাও পলায়ন করে।

বিস্তারিত বিশ্লেষণের স্থান এটা নয়। এখানে আমি শুধু ইউরোপে আরব শাসনের উদারতার কথাটা বলার প্রয়াস পেয়েছি। ইসলামের ছায়াতলে ধর্মীয় স্বাধীনতা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার এবং সভ্যতার যে বিকাশ ঘটেছিল তা খৃস্টানরাও স্বীকার করে। ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে এ সত্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তার একজন পণ্ডিতের বর্ণনায়, যিনি 'পয়শিয়ার' (Poitiars)[৯] যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, এ যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয়ের কারণ হল ঃ ইউরোপে তখনও সভ্যতা পৌঁছায়নি—ইউরোপের সভ্যতা পৌঁছেছিল আরও আট শতাব্দী পরে।

ফ্রাঙ্কদের বর্বর সেনাদল অষ্টম শতাব্দীতে আরবদের পরাজিত করে এবং এতে ইউরোপের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেকটা ব্যাহত হয়। বিশ্বাসঘাতক ও হিংসুক শক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আর একবার জয়লাভ করে জ্ঞান ও সভ্যতার বিকাশ পশ্চাতে ঠেলে দেয়। রোমান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার জন্যে গঠিত বিচারালয় ও রাষ্ট্রীয় তলোয়ার যখন সভ্যতার দূতদের হত্যা করেছিল বা পশ্চিমের সাগরে নিক্ষেপ করছিল, সমগ্র মানুষকে তাদের জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করছিল এবং গ্রানাডার পতনের পর যখন দু'লক্ষেরও অধিক (যাদের অধিকাংশই ছিল স্থানীয় লোক) মুসলমানকে হত্যা, বিতাড়ন, নির্বাসন দিয়ে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছিল, তখন তুর্কীদের নেতৃত্বে আর এক বিজয়ী মুসলিম সেনাদল পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ জয় করছিল। এসব দেশের খৃস্টানরা মুসলমানদের অধীনে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার ভোগ করছিল।

যে বাইজেন্টিয়াম আট শতাব্দী ধরে মুসলমান-বিরোধীদের কেন্দ্রস্থল ছিল এবং যেখান থেকে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ চালান হত, সেই বাইজেন্টিয়ামের পতন ঘটলেও তথাকার অধিবাসীদের ধর্মীয় অধিকার বিলোপ করা হয়নি। বিজয়ী মুসলমানরা তাদের বিশ্বাস ও ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ করেনি, তাদের ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেনি বা তাদের অতীত কার্যকলাপের জবাবদিহি করার জন্যেও ডাকা হয়নি।

এ সম্পর্কে ফ্রাঞ্জিস, ফিনলে, বেজিবাস, ডি. অহসন প্রমুখ খৃস্টান ঐতিহাসিকের যে বক্তব্য আর্নল্ড সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন, তার উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

"কনস্ট্যান্টিনোপল দখল করে সেখানে আইন-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর দ্বিতীয় মুহাম্মদ সর্বপ্রথম যে কাজটি করেছিলেন, তা হল ঃ গ্রীক গীর্জার রক্ষক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করে খৃস্টানদের আনুগত্য অর্জন। খৃস্টানদের ওপর অত্যাচার করা

www.nagorikpathagar.org

তিনি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। নব নির্বাচিত পেট্রিয়ার্কের (প্রধান ধর্মযাজক) পক্ষে এক আদেশ জারি করে বলা হয় যে, তিনি ও তাঁর উত্তরাধিকারীরা পূর্ববর্তী শাসনামলে যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতেন, তার সবগুলোই বহাল রইল। তুর্কীদের বিজয়ের পর প্রথম যাজক জেন্না ডিওস সুলতানের হস্ত থেকে যাজকীয় দণ্ড গ্রহণ করেন। এটা ছিল তাঁর ক্ষমতার প্রতীক। এ ছাড়া তিনি সুলতানের কাছ থেকে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও একটা জাঁকজকমপূর্ণ অশ্বও উপহার পেয়েছিলেন। সাঙ্গ-পাঙ্গসহ তিনি এ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে নগর প্রদক্ষিণ করতেন। ধর্মীয় প্রধান হিসেবে তিনি খৃস্টান সম্রাটদের কাছ থেকে যে সম্মান পেতেন সুলতান তাঁকে শুধু সেই সম্মানই দিলেন না, তাঁর ওপর অনেক সামাজিক দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। গ্রীকদের মধ্যকার যাবতীয় বিবাদের বিচার হত পেট্রিয়ার্কের আদালতে। এ আদালত দোষী ব্যক্তিকে জেল দিতে ও জরিমানা করতে পারত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারত। মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীদের ওপরে এসব রায় কার্যকর করার নির্দেশ জারি করা হল। আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় ব্যাপারসহ (তুর্কীরা এতে বাইজেন্টাইন সরকারের মত হস্তক্ষেপ করেনি) ইচ্ছামত ধর্মসভা আহ্বান করার ক্ষমতা পেট্রিয়ার্কের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছাড়াই তিনি ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে পূর্ণ কর্তৃত্বের অধিকারী ছিলেন। দুর্দশা কবলিত তাঁর নিজস্ব জনগণের উন্নতি বিধানের জন্য একজন রাজকর্মচারী হিসেবে তিনি অনেক কিছু করতে পারতেন এবং এমন কি অত্যাচারী গভর্নরদের কার্যকলাপ সুলতানের গোচরীভূত করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের গ্রীক বিশপগণকেও অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখা হত এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাঁদের এত বেশি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে, আধুনিক কাল পর্যন্ত তারা তাদের নিজ এলাকায় জনসাধারণের ওপর যেন তুর্কীদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন বলেই মনে হত ...।[৪০]

পূর্ব ইউরোপেও খৃস্টানদের প্রতি মুসলমানদের আচরণ ছিল অনুরূপ। তুর্কীদের হাতে কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের চল্লিশ বছর পর স্পেনের অধিবাসীদের হাতে গ্রানাডার পতন ঘটে। পশ্চিমের খৃস্টানরা যদি মুসলমানদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে পারত। প্রভু যীশু তাদের ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া প্রদর্শনের আহ্বান জানালেও তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ধৈর্য ও মহানুভবতার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাদের চোখের সামনে মুসলমানরা যে উচ্চ আদর্শ স্থাপন করেছিল, তা থেকে তারা কিছুই গ্রহণ করতে পারেনি কেন ? আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, তাদের নিষ্ঠুর আচরণের পশ্চাতে অনেক কারণ আছে। এসব কারণের কিছু কিছু আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি এবং বাকিগুলো অন্যান্য প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার মতে, এ নিষ্ঠুরতা খৃস্ট ধর্মে মজ্জাগত নয়। কারণ যীশুর মত মহাপুরুষের আবির্ভাব ছিল জনগণের প্রতি আশীর্বাদস্বরূপ।

www.nagorikpathagar.org

প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক ঘটনাই প্রমাণ করে যে, ইউরোপীয়দের স্বভাবই হল ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা, অত্যাচার করা ও রক্তপাত ঘটানো। এটা মোটেও আশ্চর্যের নয় যে, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের সেই অতীত স্বভাবেরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। এর মধ্যে শুধু এটাই ব্যতিক্রম যে, মধ্যযুগে ছিল ধর্মীয় লড়াই আর বর্তমান যুগে তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে আদর্শের লড়াই।

পরিশেষে আমি বলতে চাই, প্রাচ্যের মুসলিম ও খৃস্টান, যারা বিপদে-আপদে সব সময় আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয় ও যারা সব সময় আল্লাহ্‌র দয়া কামনা করে, তারা কি তাদের মহান ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করে আদর্শিক, অর্থনৈতিক ও জাতিগত বিভেদ মুছে ফেলতে পারে না এবং পারে না কি তারা পশ্চিমা স্বভাবের চরম আবেগ দূর করে আল্লাহ্ যে জন্য তাদের এ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সেই মানব ভ্রাতৃত্বের জন্য সদিচ্ছা নিয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে ?

বিশ্বস্রষ্টার নিকট কায়মনোবাক্যে আমরা প্রার্থনা করি, তিনি যেন অতি সত্বর এ ধরনের চূড়ান্ত ফল লাভের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে দেন। "নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মানব জাতির ওপরে মেহেরবান, দয়াময়।"[৪১]

www.nagorikpathagar.org

সপ্তম অধ্যায়

বিশ্ব-অশান্তির কারণ

উপনিবেশবাদ

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করেছি এবং এ সমস্যার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উল্লেখ করেছি। এ সংক্ষিপ্ত আলোচনার উদ্দেশ্য হল, মুসলমান ও অমুসলমান পাঠকের মনে মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর অনুশাসনগুলো সম্পর্কে ফলপ্রসূভাবে আলোচনা করার একটা আগ্রহ সৃষ্টি করা। আমার মনে হয়, এ আলোচনার মাধ্যমে তাঁরা মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর মৌলিক ও নৈতিক নীতিগুলোর মধ্য থেকে একটা সূত্র খুঁজে পাবেন যা বর্তমান সভ্যতাকে তার খারাপ দিকগুলো থেকে মুক্তি দিতে পারে এবং পারে পৃথিবী থেকে ঐ সব হাঙ্গামা দূর করতে যা এক শতাব্দীর চতুর্থাংশের মধ্যে মানব জাতির ওপর দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে।

গত বিশ্বযুদ্ধের বিস্তৃতির অশুভ পরিণতি হিসেবে আজকের পৃথিবী তিনটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে দুটো একে অপরের বিরোধিতা করছে এবং তৃতীয়টা নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাই বলে তারা দুটো বিবদমান শক্তির আক্রমণ থেকে মুক্ত নয়।

এ তিনটি শিবিরের অভিযোগগুলো কি ? বিবদমান শিবিরের উভয়েই এমন সব দাবি করছে যা কেউ মেনে নিতে পারছে না অথচ আলোচনা করার মত এসব দাবির প্রয়োজনীয় ভিত্তিও নেই। প্রত্যেকেই দাবি করছে যে, তারা সঠিক এবং তারা সভ্যতাকে রক্ষা করতে চায় অথচ তাদের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে এবং অযথা আক্রমণ চালান হচ্ছে। এ দাবি সত্য না মিথ্যা তা প্রমাণের ভার আমরা দাবিদারদের কাছে ছেড়ে দিতে পারি।

আর তৃতীয় শিবিরটা হচ্ছে নিরপেক্ষদের নিয়ে গঠিত। এদের অধিকাংশের মর্যাদা ইতিমধ্যেই নস্যাৎ করে ফেলা হয়েছে এবং বাকিগুলো অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে রাত জেগে পাহারা দিচ্ছে এ আশঙ্কায় যে, যে কোন মুহূর্তে তারা আক্রান্ত হতে পারে।

গত দু'শতাব্দী ধরে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভেদের কারণগুলোর প্রতি আমরা যদি সাধারণভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তাহলে দেখব, কারণগুলো আস্তে আস্তে প্রকট হয়েছে এবং গত বিশ্বযুদ্ধের সময় তা প্রকটতর আকার ধারণ করে পাঁচটা মহাদেশের ওপর

www.nagorikpathagar.org

প্রভাব বিস্তার করেছিল। এত অন্যায় বাড়াবাড়ির প্ররোচণা কোথা থেকে এল এবং যুদ্ধবাজদের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল ? উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন, প্রাণপণ চেষ্টা করেও তা তারা অর্জন করতে পারেনি।

নিজ দেশের সীমানা বাড়ানো, অন্যের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা বা দুর্বল জাতির সম্পদ কেড়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে কি এসব উদ্দেশ্যের সংজ্ঞা নির্ধারণ করা যায় ?

এসব কি শ্রেণী-সংঘাত থেকে উদ্ভূত ? নাকি অর্থনৈতিক সুবিধা আদায়ের জন্যে?

এসব কি উগ্র স্বদেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদের প্রকাশ বা প্রশ্রয় যার পরিণতি হল অন্যের অধিকার অস্বীকার করা—তা সে প্রতিবেশীই হোক বা পৃথিবীর দূরবর্তী প্রান্তের অধিবাসীই হোক ?

অথবা এসব কি বস্তুবাদী স্বৈরাচার এবং অমিতব্যয়ের প্রতি মোহ, যার উদ্দেশ্য হল সম্পদ জমা করা বা তাড়াতাড়ি লাভ করা—যার জন্যে একই জাতির মধ্যে শ্রেণী–বৈষম্য দেখা দেয় এবং একের বিরুদ্ধে অন্যরা মারমুখী হয়ে ওঠে এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্ররোচনা যোগায় ? নাকি এসব হচ্ছে বস্তুবাদের আক্রমণের মুখে আধ্যাত্মিক শক্তির পরাজয়ের কুফল, যার ফলে নৈতিক চরিত্র ও ধর্মীয় বিশ্বাসে বিশৃঙ্খল অবস্থা, সত্য আইনের প্রতি অনীহা, মানবীয় গুণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের অবক্ষয় ও চুক্তির ওয়াদার প্রতি ক্রমবর্ধমান অবজ্ঞার সৃষ্টি ? এবং যার ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনার সৃষ্টি এবং নিরাপত্তার পরিবর্তে ভয়ের সূত্রপাত ছাড়াও ক্রমাগত যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং আকস্মিক ধ্বংসের এত আশংকা ?

এ সবের জন্য ছোট বড় আরও কোন কারণ আছে নাকি, যে কারণগুলো এর জন্য দায়ী ?

অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ ও ঘটনাসমূহের হয়ত সাময়িক ফল থাকতে পারে। কিন্তু যে সব কারণের কথা আমি উল্লেখ করেছি তা যদি কেউ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে দেখেন, তাহলে তিনি অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, বিশ্বে দুর্নীতি, ক্লেশ এবং যুদ্ধের পশ্চাতে এসব কারণই বিদ্যমান।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণী কি এসব দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং দূরীকরণ করার সম্ভাব্য পথ বাতলে দিতে পারে ? এটাই আমরা এখানে খুঁজে দেখার চেষ্টা করব।

বিশ্বে দুর্নীতির উদ্দেশ্যের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাকে এক কথায় উপনিবেশবাদ বলা যেতে পারে। উপনিবেশবাদের আবির্ভাব এবং তা বিস্তারের পূর্বে দুর্নীতি ও তার অশুভ শক্তির প্রভাব এতটা ব্যাপক ছিল না এবং তখন যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী বিস্তার লাভ করেনি। পাঁচটি মহাদেশে উপনিবেশবাদ ছড়িয়ে পড়লে বস্তুগত সংঘাত দেখা দেয় এবং যুদ্ধও আন্তর্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে।

www.nagorikpathagar.org

উপনিবেশবাদ প্রসারের সাথে সাথে বহু দেশ উপনিবেশ স্থাপন করার কাজে লিপ্ত হয় এবং সব জাতিই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, ধন ও প্রতিপত্তি অর্জনের একমাত্র উপায় হচ্ছে উপনিবেশবাদ। তারা একে অন্যকে ঈর্ষা ও ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। আধিপত্যবাদের মোহের ফলে অনেক দেশ তাদের শিকারে পরিণত হলেও এ কাজ থেকে তারা কেন নিবৃত্ত হল না। উপনিবেশবাদের সমর্থক প্রাথমিক নাইটগণ, স্পেন, পর্তুগীজ এবং ফ্রান্স উপনিবেশবাদের শিকারেই পরিণত হয়। ফ্রান্সিসকো স্যাভেরিও নিত্তি তাঁর 'দি র‍্যাক অব ইউরোপ' (The wreck of Europe) পুস্তকে বলেন যে, ইতালীরা একটা বালুচর কেনার জন্য ১৪ বিলিয়ন 'লিয়ার' ব্যয় করেছিল।[১] লিবিয়া, ইথিওপিয়া এবং অন্যান্য দেশে ফ্যাসিস্ট ইতালীকে কত অর্থ ব্যয় করতে হয়েছিল ? উপনিবেশবাদ জিইয়ে রাখার জন্য ইতালী তার সমস্ত অর্থ ও রক্ত ব্যয় করে নিজের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে সে শুধু ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই অর্জন করেনি।

যে সব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সভ্যতাকে পঙ্গু করে দিয়েছে, তা যদি চিরতরে বন্ধ হয়, তাহলে সবগুলো জাতিই বুঝতে পারবে যে, সৎ শ্রম ও সুন্দর জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তে তারা যে উপনিবেশবাদের জন্য পরস্পরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল তা 'আলেয়া' ছাড়া আর কিছুই নয়। পাথরের দিকে কোন কিছু নিক্ষেপ করলে তা যেমন ফিরে এসে নিক্ষেপকারীকেই আঘাত করে, উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে।

গত দু'শতাব্দীতে যে সব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে তার প্রায় প্রত্যেকটিরই কারণ হল উপনিবেশবাদ এবং তাদের সবার ওপর এর ছাপ অঙ্কিত হয়ে আছে। যুদ্ধের কারণসমূহ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এর পশ্চাতে যে কোন রূপেই হোক উপনিবেশবাদ ছিল ক্রিয়াশীল। অন্য কথায় সেসব যুদ্ধের পিছনে কার্যকর ছিল হয় কোন দুর্বল জাতির ঐতিহ্য হরণ আর না হয় সেসব মূল্যবান বস্তু অপহরণ, যা আধুনিক মানুষের আরব্ধ বস্তু যেমন পেট্রোল, সোনা, কয়লা, তুলা, খনিজ সম্পদ বা পৃথিবীর অন্য কোন সম্পদ।

আধুনিক ইউরোপীয় উপনিবেশবাদ বিজয়ী এবং বিজিত, উপনিবেশ স্থাপনকারী ও ঔপনিবেশিক—সবার জন্য খারাপ। বিজয়ী জাতি ক্রমশ আরামপ্রিয় ও অপরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যারা তাদের ঈর্ষা করে বা প্রতিশোধ নিতে চায় তাদের সাথে ঝগড়ার সূত্রপাত হয় এবং এভাবে তাদের পূর্বেকার শক্তিশালী অস্তিত্ব লোপ পায়। অতীতে যেসব জাতির ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে, তার জের এখনও তাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অপরপক্ষে, শোষণের জন্য উপনিবেশ রক্ষা করতে

www.nagorikpathagar.org

গিয়ে তাদের অধিবাসীদের জীবন যাত্রার মান কমে যায় এবং শোষণের বস্তু ভোগ করার সামর্থ্য সীমিত হয়ে যায়। তদুপরি, তাদের উদ্ভাবনী শক্তি, আগ্রহ এবং উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিশ্বের মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা লোপ পায়। এভাবে তারা মানব জাতির জন্য একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

এভাবে লোভী এবং ঈর্ষান্বিত জাতি কর্তৃক সৃষ্ট যুদ্ধ এবং রণকৌশল সভ্যতার পতন এমন কি ধ্বংসকে পর্যন্ত ত্বরান্বিত করে।

নেপোলিয়ানের যুদ্ধসমূহ কি ফ্রান্স ছাড়াও বিশ্বের জন্য অনিষ্টকর ছিল না ? দুর্বলকে পদানত করে তাদের ধন-সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার আকাঙ্ক্ষা কি ঘৃণা ও ঈর্ষাজনিত নয় ? রাশিয়া, তুরস্ক ও অস্ট্রিয়া ঠিক একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করেছে। দুর্বলকে ধ্বংস করে নিজেকে ধনী করার জন্যই কি এসব যুদ্ধ পরিচালিত হয়নি ? বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৯০৫) রুশ-জাপান যুদ্ধ দুই প্রতিদ্বন্দ্বী জাতির সম্প্রসারণবাদী নীতির জন্যই সংঘটিত হয়েছিল। কারণ দুই দেশের মধ্যে দূরত্বের যে ব্যবধান রয়েছে, তাতে যুদ্ধ বাধার কথা নয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কারণ সম্পর্কে যে যাই বলুক না কেন, পরাজিত জাতিসমূহের ঘৃণা এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রের কাঁচামাল ও ধন-সম্পত্তি দখল এবং স্বীয় দেশের সীমানা বাড়ানোই ছিল এ যুদ্ধের মৌলিক কারণ। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বড় বড় জাতির কাছে উপনিবেশবাদের কুফলগুলো ধরা পড়তে থাকে। তাই তারা এর বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ম্যাণ্ডেট প্রথা এবং কাঁচামালের ওপর অবাধ অধিকারের নীতি চালু করার চেষ্টা করে।

উপনিবেশবাদের কুফল ততদিন পর্যন্ত চলতেই থাকবে, যতদিন পর্যন্ত মানুষ পরীক্ষা ও ত্যাগের মাধ্যমে সবল ও দুর্বল উভয়ের কাছে গ্রহণীয় একটা সমাধান খুঁজে না পায়। অতীতে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যুদ্ধ সীমিত ছিল। কিন্তু উপনিবেশবাদ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লে যুদ্ধও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং এমন কতকগুলো সাধারণ নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন যা বিশ্ব সমস্যার সমাধান করতে পারে। বর্তমান সভ্যতার মুক্তির জন্য উপনিবেশবাদের বিলোপসাধন অপরিহার্য। ইতিমধ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গ আটলান্টিক প্যাক্টের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের একটা প্রয়াস পেয়েছে। অন্যরাও অনুরূপ ঘোষণার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে চেষ্টা করছে। কারণ তারা উপলব্ধি করেছে যে, উপনিবেশবাদ বিজয়ী এবং বিজিত—উভয়ের জন্যেই খারাপ।

যতদিন পর্যন্ত 'শক্তি' জাতিসমূহের শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হবে ততদিন পর্যন্ত দুরবস্থা চলতেই থাকবে। মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর অন্যতম প্রধান গুণ হল উপনিবেশবাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন এবং পার্থিব উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শক্তি

www.nagorikpathagar.org

প্রয়োগ নিষিদ্ধ করা। রাজ্য বিস্তার, কাঁচামাল সংগ্রহ, বাজার সৃষ্টি এবং মানুষকে সভ্য করার জন্য ইসলাম যুদ্ধের অনুমতি দেয় না। এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ওপর, এক রাজা অপর রাজার ওপর বা এক জাতি অপর জাতির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করুক—এটাও ইসলাম অনুমোদন করে না। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তোমরা যারা ঈমান এনেছ শোন! যখন তোমরা আল্লাহ্‌র রাহে সফরে বের হও, তখন প্রত্যেকটি কাজ জেনে-শুনে ঠিকমত করবে। যে ব্যক্তি তোমাদের কাছে আনুগত্য প্রকাশ করবে, সালাম দেবে তাকে এমন কথা বলো না ঃ 'তুমি মুসলমান নও।' সে ত পার্থিব সুযোগ সুবিধার আশা রাখে। কারণ আল্লাহ্‌র কাছে গনীমতের মাল বিপুল পরিমাণে মওজুদ রয়েছে।"[২] আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ওপর ইসলামের বক্তব্য দিবালোকের মতই পরিষ্কার। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে সব মানুষই চিরুণীর দাঁতের মত সমান। আল্লাহ্‌র নবী বলেন যে, কর্তব্যবোধ ও শান্তিপ্রিয়তা ছাড়া ইসলামের জাতিগত, শ্রেণীগত ও বর্ণগত আধিপত্য নেই। আমি একথা বারবার উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ্‌র বাণীর অগ্রাধিকার ও সকলের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান ছাড়া ইসলাম অন্য কোন ব্যাপারে বিবাদ স্বীকার করে না।

অনেকে হয়ত বলতে পারেন ইসলাম যা প্রচার করে তার সাথে মুসলমানদের ইতিহাসের কোন মিল নেই। আমরা প্রচার করি আল্লাহ্‌র কিতাব ও তাঁর ধর্ম। ইউরোপীয়দের মত কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্র শাসকের কার্যকলাপের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি না। বর্তমান রাষ্ট্রসমূহের মত মুসলমানরাও তাদের কাজের জন্য শাস্তি ভোগ করেছে।

যে কোন ধরনের উপনিবেশবাদকে ইসলাম যে প্রত্যাখ্যান করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বর্তমান শতাব্দীতে এবং অতীতেও মানুষের ওপর উপনিবেশবাদের প্রভাবের ফলে ইসলামের মহান ও উন্নত আদর্শ আজ সকলের কাছে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। উপনিবেশবাদ সম্প্রসারণের ফলে তার কুফলগুলোও সারা বিশ্বে প্লেগের মত ছড়িয়ে পড়েছে এবং পৃথিবীকে একটার পর একটা বিশ্বযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ্‌ যেন মানুষকে সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তখনই তারা যেন উপলব্ধি করতে সক্ষম হন ইসলামের সেই বক্তব্যের সারবত্তা যে, উপনিবেশবাদ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপায় নয়। ইসলামের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত যা কোন জাতি, শ্রেণী বা কোন সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডিকে স্বীকার করে না। জ্ঞানী বা অজ্ঞ, উন্নত বা অনুন্নত—এর ভিত্তিতে ইসলাম মানুষের অধিকার পরিমাপ করে না। ইসলাম মানুষকে পরস্পরের ভাই হিসেবেই গণ্য করে। কারণ তারা সবাই আদমের বংশধর এবং আদম মাটির তৈরী।

www.nagorikpathagar.org

শ্রেণী-সংগ্রাম

শ্রেণী-সংগ্রাম ইউরোপীয় সভ্যতার উপজাত ফল।[৩] ব্যাধি প্রসারিত হয়েছে এবং দুর্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বব্যাপী।

এ পৃথিবীতে মানুষ শুরু থেকেই বিভিন্ন সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছে ; গোত্র, শহর বা রাষ্ট্রের আওতায় গরীব, ধনী, শাসক, শাসিত, দুর্বল, সবল, রোগী, স্বাস্থ্যবান নির্বিশেষে সবাই সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে পাশাপাশি বসবাস করে আসছে। মানুষের স্বভাবগত গুণই হল একে অন্যকে সাহায্য ও সহযোগিতা করা।

আদিম সমাজে মানুষ মৌচাকের মত দলবদ্ধভাবে বসবাস করত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নিয়মাবলীর উদ্ভাবন করত। ব্যক্তিগতভাবে কেউ সেই নিয়ম পছন্দ না করলেও সামাজিক প্রথা বা আইন হিসেবে স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা মেনে নিত। এ ধরনের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে গোলযোগের কারণ হয়ে দাঁড়াত। অন্য দল কর্তৃক আক্রমণ বা অন্তর্কলহ থেকে এসব বিশৃঙ্খলা ঘটত। কখনো কখনো ব্যক্তি বা দলের বিপথে গমন বা তাদের স্বৈরাচার বা বাড়াবাড়িমূলক কার্যাবলী এসব বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়াত। এসব বিশৃঙ্খলা আস্তে আস্তে থেমে যেত এবং স্বভাবগত গুণের জন্যে আবার তাদের মধ্যে সহযোগিতা গড়ে উঠত।

বিশৃঙ্খলা যে শ্রেণী-সংগ্রামের উপাদান—এ সম্পর্কে প্রাচীন যুগের মানুষ বর্তমান যুগের মত সচেতন ছিল না। আজকাল যেমন ধনী-দরিদ্র, মালিক-মজুরে অহরহ তিক্ত সংঘর্ষ লেগেই আছে, আগে তা ছিল না। মানবেতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা চরম আদর্শের সন্ধান পাই। যেমন, ইসলাম-পূর্ব পারস্যে মাজদাকবাদীরা (Mazdakites) সম্পূর্ণ সাম্যের কথা প্রচার করত। রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাসেও আমরা সুবিধাভোগী এবং জনসাধারণ বা অন্য কথায় দাস ও মুক্ত মানুষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা দেখতে পাই। ইসলামের প্রাথমিক যুগেও আমরা দেখতে পাই রসূলুল্লাহ্ (স)-এর সাহাবী আবূ যর (রা) সম্পদের প্রাচুর্য ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সিরিয়া ত্যাগ করেছিলেন।

আমরা খারেজীদের কথাও জানি, যারা সামাজিক অরাজকতা দূর করার জন্য তলোয়ার ব্যবহার করেছিল এবং এদের মধ্যে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ঘোষণা করেছিলঃ "আল্লাহ্র শাসন ছাড়া আর কোন শাসন নেই।" তারা সরকারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করে বলত যে, সরকার স্বভাবতই দুর্নীতিপরায়ণ। ভাল কাজ করা এবং মন্দ কাজ করা থেকে বিরত রাখার জন্য বিবেকই যথেষ্ট। শাসকের শাসন করার অধিকার তারা প্রত্যাখ্যান করেছিল। তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী ছিল, তারা উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হওয়ার অধিকার অস্বীকার করেছিল। কোন বিশেষ পরিবার বা গোত্র নির্বিশেষে রাষ্ট্রপ্রধানকে নির্বাচিত হতে হবে—কোন দাসেরও শাসন করার সমান অধিকার

www.nagorikpathagar.org

আছে। রাষ্ট্রপ্রধান পার্থিব সম্পদ উপার্জন করা থেকে বিরত থাকবেন এবং জনগণকেও তা করতে বলবেন—যে পর্যন্ত জীবন ধারণের উপায়সমূহ সকলের মধ্যে সমভাবে বণ্টিত না হয়। অবশ্য তাঁরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের কথা বলেন নি।

যা হোক, এসব আদর্শকে ব্যতিক্রম বলা যেতে পারে। খুব কম লোকই এ আদর্শ গ্রহণ করেছে এবং কোন সময়ই তা বিস্তৃত বা ভণ্ডামির দিক দিয়ে বর্তমান সমাজ বা সাম্যবাদের পর্যায়ে পৌছায়নি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম কখনও সম্পদ সমভাবে বন্টনের কথা বলেনি এবং শ্রমিক-মালিক সংর্ঘষের মত শ্রেণী-সংগ্রাম সমর্থন করেনি। বর্তমান কালের মত পূর্বে শ্রেণীতে শ্রেণীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ছিল না। সমাজবাদ ও সাম্যবাদ বর্তমানে শ্রমিক শ্রেণীকে যেভাবে সংঘবদ্ধ করেছে তা নিঃসন্দেহে নতুন এবং তা হল ধনতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ফল।[৪]

সহজাত সরলতায় কাজ-কর্মের মধ্য দিয়ে মুসলমানরা একে অপরকে বুঝত। ধনী প্রতিবেশী গরীব প্রতিবেশীর বন্ধু ছিল—সন্তানদের সাথেও তার পরিচয় ছিল ব্যক্তিগত। প্রত্যেকেই ভ্রাতৃত্বের কিংবা রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল বা একে অপরকে এবং আত্মরক্ষার জন্যেই তারা ছিল পরস্পর সংঘবদ্ধ। গোত্র বা গ্রামের প্রধান যত বেশি শক্তিশালী হোক কিংবা তাঁর জীবন যত বেশিই আরামপ্রদ হোক—তিনি ধনী ও দরিদ্রের নেতা ছিলেন এবং সকলের প্রতি তাঁর একত্ববোধ ছিল। তিনি তাঁর ধন-সম্পদ স্বার্থপরের মত ব্যবহার করতেন না বা বাগাড়ম্বর ও প্রাচুর্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন না। তিনি বদান্যতায় গর্ব অনুভব করতেন এবং মুক্ত হস্তে ধন-সম্পদ বিলিয়ে দিতেন। আরাম-আয়েশ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর ছেলেমেয়েরা গ্রামের বা গোত্রের অন্যান্য ছেলেমেয়ের মত একই ধরনের পোশাক পরিধান করত।

ধনীর ধন-সম্পদ বা আরামপূর্ণ জীবন অন্যের মনে কোন ঈর্ষার সৃষ্টি করত না। তাছাড়া, সীমাহীন সৌভাগ্য কারও ছিল না এবং সবাই পরিমিত জীবন যাপন করত।

আধুনিক জগতে বাষ্প ও বিদ্যুৎ আবিষ্কারের সাথে সাথে অনেকের ভাগ্য খুলে যায় এবং ধনীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হল, যোগাযোগ ব্যবস্থার অগ্রগতি হল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যও হল প্রসারিত। এভাবে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান আরও বেড়ে গেল। জমিদার ব্যবসায়ী ও পরিবহন ব্যবস্থার অধিকারীদের প্রতি বিশ্বও মুখ তুলে তাকাল এবং এভাবেই নতুন মানবিক সম্পর্কহীন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা তার আনুষঙ্গিক সকল কুফল শিকড় গেড়ে বসল। পরিণামে চিন্তায় ও কাজে মানুষের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে গেল এবং তারা একে অন্যের শত্রুতে পরিণত হল।

এটা অবশ্যম্ভাবী যে, বঞ্চিতরা যন্ত্রপাতি ও তার মালিকদের দাসে পরিণত হওয়ায় তারা মুক্তির পথ আবিষ্কারে তৎপর হবে। তারা দেখল যে, সংখ্যা বেশি হলেও

www.nagorikpathagar.org

তুলনামূলকভাবে তাদের ক্ষমতা নেই। তারা গভীর অনুতাপের সাথে এ-ও লক্ষ্য করল যে, প্রচলিত আইনসমূহ এবং সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন বাহ্যিকভাবে সহানুভূতিপূর্ণ হলেও আসলে সেগুলো নিপীড়নমূলক। এসব আইন এবং পুলিশ বাহিনী ধনীদের স্বার্থেই ব্যবহৃত হয়। এভাবেই কতিপয় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠের ওপর কর্তৃত্ব করে চলল। বঞ্চিত জনতা তখন এগিয়ে এলো কতিপয় স্বপ্নাচারী ও ব্যর্থকাম নেতা ও দলের নেতৃত্বে বিপ্লব সংঘটিত করতে। এভাবেই সূচনা হল বিশ্ব-অশান্তির অন্যতম মৌলিক কারণের।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই উচ্ছৃঙ্খল বিপ্লব ও রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা শুরু হয়! রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে এর শিকার হল কোটির অধিক আদম সন্তান এবং তার দাবানল চালু রইল কয়েক বছর ধরে। ইউরোপ ও আমেরিকার বাকি এলাকাও এ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা থেকে মুক্ত থাকল না। সাম্যবাদের নামে সেই আদর্শ এখনও গরীবদের ধনীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উস্কানি দিচ্ছে, কৃষক-শ্রমিককে লেলিয়ে দিচ্ছে মালিকের বিরুদ্ধে এবং এভাবে পৃথিবীর সর্বত্রই প্রস্তুত করে চলেছে ভয়াবহ বিস্ফোরণের ক্ষেত্র।

সরকার এবং জনগণ উদ্ভূত এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে। কেউ সম্পদশালী শ্রেণীর বিলোপ করেছে। যেমন রাশিয়া ; কেউ শ্রমিক ও সাম্যবাদের মুখপাত্রদের খতম করেছে, যেমন স্পেন ; আবার কেউ বা ভারসাম্য ঠিক রাখতে গিয়ে বলপ্রয়োগ ও অত্যাচারের মাধ্যমে ব্যক্তি স্বাধীনতার বিলোপসাধন করেছে, যেমন ইতালী ও জার্মানী। এসব স্থানে স্বৈরাচারী নেতৃত্ব জনগণের হাত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে।

এত অল্প সময়ে এবং অল্প কথায় ধনতন্ত্র ও তার সুফল সম্পর্কে একটা বিস্তৃত তথ্য পরিবেশন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপ ও আমেরিকা সামাজিক সমস্যাবলী সমাধানের যে ব্যবস্থার কথা বলছে এবং তাদের সেই স্বার্থপর ও সুদখোরী ব্যবস্থা যে তাদের কত বড় ক্ষতি করছে সে সম্পর্কেও একটা ফিরিস্তি দেওয়া সময়াভাবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, জটিল শ্রেণী-সংগ্রামের প্রশ্ন এবং তার কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আমি পাঠকদের নিজস্ব জ্ঞানের ওপর নির্ভর করছি।

মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে যে সব নির্দেশ আছে, তার মধ্যে আধুনিক যুগের সমস্যাবলীর কোন সমাধান পাওয়া যায় কি না, তা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

সমাজের প্রথম সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য এবং এটাই শ্রেণী-সংঘাতের প্রাথমিক কারণ। কিভাবে ইসলাম দারিদ্র্যের সমাধান করতে চেয়েছে, তা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হব যে, ইসলামের একটা নিজস্ব নমনীয় ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করে সার্বিক কল্যাণে শ্রেণীহীন সমাজ কায়েম করা সম্ভব। এ ব্যাপারে দুটো পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

প্রথমত, বঞ্চিতদের সমগ্র জাতীয় আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এখানে আমি 'সমগ্র' কথাটা এজন্য বলছি যে, প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তির সম্পদের ওপরই 'দরিদ্র-কর' (poor-tax) দেওয়ার কথা রয়েছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে রমযানের শেষে ঈদের ফিতরার[৫] কথা বলা যেতে পারে। যে মুসলমানদের ঘরে একদিনের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জিনিস থাকে, তাকে এ 'কর' দিতে হয়। অন্য কথায়, দরিদ্রতর ব্যক্তিকে সাহায্য করার জন্য দরিদ্র ব্যক্তির ওপর 'কর' বসানো হয়েছে।

দারিদ্র্য এবং অন্যান্য সামাজিক ব্যাধি দূরীকরণার্থে সব শ্রেণীর লোকের সম্পদের ওপর আইনসম্মতভাবে বিভিন্ন রকম কর ধার্য করা হয়েছে। করলব্ধ অর্থ যে কেবল গরীবেরই প্রাপ্য—সে সম্পর্কেও কুরআনে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। এ অর্থ অন্য কোন কাজে রাষ্ট্রপ্রধান ব্যয় করতে পারেন না। যারা দান লাভের দাবিদার, তাদের সম্পর্কে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "সদকাসমূহ গরীব, মিসকীন ও সদকা আদায়ের কাজে নিযুক্ত কর্মচারী আর যাদের সন্তুষ্ট করা আবশ্যক, গোলামকে মুক্ত করা, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের দায়মুক্ত করা, আল্লাহ্‌র রাহে জিহাদের কাজে আর বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্য—এ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান। আসলে আল্লাহ্ তা'আলাই ত মহাজ্ঞানী, মহান কুশলী।"[৬]

কোন্ কোন্ সম্পত্তি 'গরীব-কর' (Poor-Tax)-এর আওতায় পড়ে এবং করের পরিমাণ কত হবে, সে সম্পর্কে কুরআনে বিস্তারিত কোন আলোচনা নেই।[৭] তবে সুন্নাহ্ (হাদীস) থেকে এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। গরীবের জন্য নির্ধারিত তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক ও বিতরণকারী কর্মচারীদের প্রতি রসূলুল্লাহ্ (স) যে পত্র দিয়েছিলেন, তা থেকেই এ স্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

কুরআন শুধু নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে আর রসূলুল্লাহ্ (স) তা কার্যকর করেছেন। প্রয়োজন অনুসারে 'দরিদ্র-কর' বণ্টন করার ভার কুরআন রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর ন্যস্ত করেছে। বর্তমান কালে রাষ্ট্রপ্রধান যদি মনে করেন যে, ক্রীতদাস মুক্তির জন্য বা যাদের সন্তুষ্ট করা আবশ্যক, তাদের জন্য বা বিদেশ ভ্রমণকারীদের জন্য খুব অল্প অর্থের প্রয়োজন, তাহলে তিনি দরিদ্রদের জন্য বা কোন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পে অর্থের পরিমাণ বাড়াতে পারেন। আল্লাহ্‌র রাহে এ কাজ করলে বহু লোক উপকৃত হবে। দেশের অধিবাসীদের সার্বিক কল্যাণে এ ধরনের কাজ করার নির্দেশ সব যুগেই দেয়া হয়েছে।

যাদের সামর্থ্য আছে তাদের ওপর দরিদ্রের হক বা অধিকার আরোপ করেই শরীয়ত ক্ষান্ত হয়নি। দারিদ্র্য দূরীকরণের দ্বিতীয় পন্থা হিসেবে শরীয়ত সামাজিক ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্বও চাপিয়েছে। এ ভারসাম্য রক্ষার দায়িত্ব রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর

www.nagorikpathagar.org

এবং দরিদ্রকরের অর্থ দিয়েই তিনি তা রক্ষা করবেন। এ অর্থে যদি না কুলায় তা হলে তিনি জনকল্যাণের স্বার্থে বিত্তবানদের ওপর আরও কর আরোপ করতে পারেন। কারণ সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা তাঁর কর্তব্য। এ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলেই তা কেবল আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও ধর্মের বিধানরূপে গণ্য হবে। এ ধরনের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয়, পূর্বে যার দৃষ্টান্ত নেই এবং মুসলিম আইনেও কিছু উল্লেখ নেই, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান আলোচনার পর ইজতিহাদ[৮] বা স্বাধীন বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে তা করতে পারেন।

হযরত আবূ বকর (রা) এবং হযরত ওমর (রা) কর্তৃক গৃহীত দুটো 'ইজতিহাদ' সম্পর্কে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

আবূ বকর (রা) রাষ্ট্রীয় আয় তাঁর কার্যরত কর্মচারী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, সৈন্য ও অন্যান্যের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দিতেন এবং এ ব্যাপারে কাউকে কোন অগ্রাধিকার দিতেন না। তাঁকে একবার জিজ্ঞেস করা হয় ঃ "আপনি লোকদের মধ্যে অর্থ সমানভাবে ভাগ করে দিচ্ছেন, কিন্তু তার মধ্যে অনেকে আছেন যারা দক্ষতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠতার জন্য অধিক পাওয়ার দাবিদার।" উত্তরে তিনি বলেন ঃ "আপনি যে দক্ষতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও জ্যেষ্ঠতার কথা বলেছেন, সে সম্পর্কে আমাকে কিছুই বলা হয়নি, এর পুরস্কার আল্লাহ্ দেবেন। এ সমতা হলো ভরণ-পোষণের জন্য এবং এ ব্যাপারে অগ্রাধিকারের চেয়ে সাম্যই ভাল।"

হযরত আবূ বকর (রা)-এর পর খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর সময় সিরিয়া ও ইরাক জয় করা হয়। ওমর (রা) কর্মচারীদের বিভিন্ন রকম মাইনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করেন ঃ 'যারা নবী করীম (স)-এর সাথে এবং যারা নবী করীম (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তাদের আমি সমানভাবে বেতন দেব না।" এ নীতির ওপরই তিনি সৈন্যবাহিনীর 'দিওয়ান' বা ব্যুরো সংগঠন করেন। ভরণ-পোষণের ব্যাপারে সাম্যের পরিবর্তে অগ্রাধিকারের নীতি গ্রহণ করার জন্য ওমর (রা)-এর নিজস্ব যুক্তি ছিল এবং 'মালে-গনিমত' বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পর্কে কুরআনের আয়াত সম্পর্কেও তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা ছিল। জনকল্যাণের জন্য শুধুমাত্র 'খুমস্'[৯] (Khums) রেখে বাকি ধন-সম্পত্তি বিজয়ীরা ভাগ করে নিতে চাইলে ওমর (রা) বলেন, "এ দেশের জমি ও 'উলুজ'[১০] (uluj) তোমরা যদি ভাগ করে বংশানুক্রমে ভোগ করতে থাক, তাহলে পরবর্তী মুসলমানদের কি উপায় হবে ? এটা উচিত আইন নয়।" রসূলুল্লাহ্ (স)-এর একজন সম্মানিত সাহাবী আবদুর রহমান ইবনে আউফ তখন জিজ্ঞেস করেন, "তাহলে যথাযথ পদ্ধতি কি হতে পারে? এ দেশ এবং তার 'উলুজ', আল্লাহ্ মুসলমানদের দান করেছেন।" উত্তরে ওমর (রা) বলেন ঃ "আপনি যা বলেছেন তা ঠিক। কিন্তু আমি বিষয়টিকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছিনে। আল্লাহ্‌র

www.nagorikpathagar.org

কসম, এরপর আর এত বড় বিজয় হবে না, যেখানে এত অধিক লাভবান হওয়া যাবে বরং এর পরবর্তী বিজয়সমূহ মুসলমানদের জন্য বোঝাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তখন যদি সিরিয়া ও ইরাকের 'উলূজ'সহ সমস্ত সম্পত্তি আমরা ভাগাভাগি করে নিই তাহলে[১১] বাইজেন্টীয় সীমান্ত ফাঁড়িসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের কি ব্যবস্থা হবে ? সিরিয়া ও ইরাকের এ শহর ও অন্য শহরের অধিবাসীদের ভবিষ্যৎ বংশধর ও বিধবাদের কি উপায় হবে ?" তবু সাহাবীরা ওমর (রা)-কে চাপ দিতে থাকেন এবং বলেন ঃ "যারা যুদ্ধ করেনি বা যুদ্ধ দেখেনি আপনি তাদের ও তাদের সন্তান-সন্ততিকে দেওয়ার কথা ভাবছেন অথচ এসব আমরা তলোয়ারের সাহায্যে জয় করেছি এবং আল্লাহ্ আমাদের দান করেছেন ?" এ কথার উত্তরে ওমর (রা) আর কিছু না বলে শুধু মন্তব্য করেন, "এটা আমার মত।"

হযরত ওমর (রা)-কে তখন এ ব্যাপারে অন্যের পরামর্শ নেওয়ার অনুরোধ জানান হয়। তখন তিনি প্রবীণ মুহাজিরদের সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করলেন। কিন্তু কোন একক সিদ্ধান্তে তাঁরা উপনীত হতে পারলেন না। আবদুর রহ্মান ইবনে-আউফ পুনরায় পরামর্শ দিলেন যে, তাদের অধিকার তাদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হোক। উসমান, আলী, তালহা ও ইবনে ওমরের মত ওমর (রা)-এর মতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। হযরত ওমর তখন আনসারদের মধ্য থেকে দশজন, আউস গোত্র থেকে পাঁচজন এবং খায্রাজ গোত্র থেকে পাঁচজন বয়োজ্যেষ্ঠ এবং জ্ঞানী ব্যক্তিকে ডাকলেন। তিনি তাঁদের উদ্দেশ করে বললেন, "আমি আপনাদের এজন্য কষ্ট দিলাম যে, আপনারা আমার ওপর যে কাজের ভার দিয়েছেন, তারই কিছুটা ভার আপনারা গ্রহণ করুন। আমি আপনাদের মতই একজন। আজ আপনারা যথার্থ সিদ্ধান্ত দেবেন। আপনারা ইচ্ছা করলে আমার মতের সাথে একমত হতে পারেন, আবার নাও হতে পারেন। আমি যা ইচ্ছা করি আপনারাও তাই ইচ্ছা করবেন, এটা আমি আশা করিনে। আল্লাহ্র পবিত্র কিতাব আপনাদের কাছে আছে, যেখানে আপনারা সত্যকে খুঁজে পাবেন। আল্লাহ্র কসম, আমি যা ইচ্ছা করি, তা-ই বলেছি এবং আমার ইচ্ছা যথার্থ।"

আনসাররা তখন বললেন, "হে আমিরুল মুমিনীন, আপনি বলুন, আমরা শুনি।" তিনি তখন বিবাদের বিষয়টা সম্পর্কে তাদের খোলাখুলিভাবে জানালে তাঁরা তাঁর মতকেই সমর্থন করলেন। তারপর জমির মালিকদের অধিকারেই জমি রাখার সিদ্ধান্ত হলো এবং সেই ভূমির ওপর খারাজ বা ভূমি-কর ধার্য করা হল। বিরুদ্ধবাদীরা তখন সম্মান প্রদর্শনহেতু চুপ করে রইল।[১২]

রসূলুল্লাহ্ (স)-এর অনুগামী ও উত্তরাধিকারীদের আচরণের এটা একটা দৃষ্টান্ত। একটা বড় রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে বিবাদটিরও ফয়সালা হয়ে যায় এবং ওমর

www.nagorikpathagar.org

(রা) আগাগোড়াই এ অভিমত পোষণ করে আসছিলেন। এরপর থেকে হযরত উমর (রা) জনকল্যাণের জন্য প্রয়োজনীয় এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন, যা ইসলামে অধিকাংশ জ্ঞানবৃদ্ধ ও বিদ্বান লোক তথা আহল-আল-সূরা সমর্থন করতেন।

জনকল্যাণের পথে ইসলামী শরীয়ত কোন সময় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ শরীয়ত জনকল্যাণ ও ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্যে অন্য পথে পরিচালিত করেনি।

দারিদ্র্য মোচনে এবং সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম জরুরী কর্তব্য। এ ব্যাপারে ইমাম ও আহলে-আল-সূরার দায়িত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট।

জনকল্যাণের ভিত্তিতে সামাজিক ন্যায়বিচারের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করতে রসূলুল্লাহ্ (স) এবং তাঁর অনুসারিগণ কখনও ইতস্তত করেন নি। কারণ তাঁর বাণীর মধ্যে সমর্থকদের জন্য ব্যক্তিগত, গোষ্ঠীগত বা জাতিগত স্বার্থের কোন স্থান নেই। এ বাণী স্বীকার করে যে, সার্বিক কল্যাণ একটা অবিভাজ্য বস্তু এবং এর মধ্যে কোন শ্রেণী বা গোত্রের একক কোন অধিকার থাকতে পারে না। কারণ তারা সবাই আল্লাহ্র বান্দা এবং সকলে সমান। সংক্ষেপে, জনকল্যাণের স্থান শ্রেণী-কল্যাণের ঊর্ধে।

একথা স্বীকার্য যে, প্রত্যেকে যখন জনকল্যাণের প্রতিনিধিত্বের দাবিদার হয় তখন মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে জনকল্যাণের যে স্বরূপ চিহ্নিত হয়েছে, তাঁর ওপর সার্বিক সমর্থন দেওয়া হলেও তা বিরোধ এড়ানোর জন্যে যথেষ্ট নয়। 'ন্যায়বিচারক' শব্দের অর্থ সবার কাছে এক হতে পারে না। সুতরাং এর একটা নির্দিষ্ট মান থাকা দরকার। অবাধ ও স্বাধীন জনকল্যাণ এবং অপরীক্ষিত মতামতের ওপর নির্ভরশীল ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি ন্যায়সঙ্গত বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। দায়িত্বহীন ইচ্ছাকে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী সমর্থন করে না।

ইসলামী শরীয়তের বিধান মূলত আল্লাহ্র ওপর বিশ্বাসের ভিত্তিতেই প্রণীত। কার মনে কি গোপন উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে, কার দৃষ্টিতে কি প্রবঞ্চনার ইঙ্গিত আছে এবং কে সঠিক পথে আছে—সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা যায় না এবং এজন্যই আল্লাহ্র দয়া কামনা করা হয়। বিশ্বাসীরা তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। সেজন্য তাদের কাছে জনকল্যাণ এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং তাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই জনকল্যাণ কর্মে আগ্রহশীল। এ কাজ ইসলামী আইন কর্তৃক অনুমোদিত। আত্মার নির্মলতা ও পবিত্রতা রক্ষা করেই বিশ্বাসীরা নিয়মানুবর্তিতা ভোগ করতে পারে। ভ্রাতৃত্বের মাপকাঠিতে জনকল্যাণকে বিচার করা হয় এবং বিশ্বাসের পূর্ণতার জন্য ইসলামী ভ্রাতৃত্ব অন্যতম পূর্বশর্ত। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন, "তোমরা কেউই সত্যিকারের বিশ্বাসী নও, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা নিজেদের জন্য যা চাও তা তোমার ভাইয়ের জন্যও কামনা না কর। তোমরা সবাই আদমের বংশধর আর আদম মাটির

www.nagorikpathagar.org

তৈরী।" এ জন্য বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কোন বৈষম্যমূলক আচরণের স্থান নেই এবং বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত রয়েছে জনকল্যাণের নিশ্চয়তা।

সেজন্য জনকল্যাণকে সুযোগের ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। কারণ আল্লাহ্ ইহজগৎ ও পরজগৎ সম্পর্কে সম্যকভাবে অবগত এবং প্রত্যেকটি কাজের জন্য তাঁর কাছে হিসাব দিতে হবে। যেসব জাতি এ জগতে অনর্থক অর্থ খরচ করে এবং সীমা লংঘন করে, তাদের আল্লাহ্ শাস্তি দেবেন এবং শেষ বিচারের দিন মানুষের কাজের জন্য যথার্থভাবে তিনি পুরস্কৃত করবেন। ন্যায়বিচার, সাম্য ও যথার্থতার ওপর নির্ভরশীল এবং ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের ভিত্তিতেই সব কাজ পরিমাপযোগ্য। যে কাজে ভ্রাতৃত্ব ও সমতাকে স্বীকার করা হয় না, তা ন্যায়বিচার হতে পারে না।

এভাবেই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান "ওজন করবে সঠিক দাঁড়িপাল্লায়"[১৩] আল্লাহ্র এ নির্দেশ অনুযায়ী এবং বিশেষ ঘটনায় গৃহীত ওমর (রা)-এর নীতি অনুসারে সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এর মধ্যেই জনকল্যাণের নির্দেশ নিহিত রয়েছে এবং তা আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে সামাজিক ভারসাম্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা তার বাড়াবাড়ির কোন স্থান নেই।

বলা যেতে পারে যে, জনকল্যাণের কষ্টকর ব্যাপারে যতদিন পর্যন্ত আল্লাহ্র প্রতি ভয় ও আনুগত্য থাকবে, ততদিনই এ ব্যবস্থা চলতে পারে। কিন্তু যখন মানুষের এ বিশ্বাস থাকবে না এবং বিবেক কলুষিত হয়ে পড়বে তখন কি করা যাবে ? যে ট্রাজেডি ঘটে গেছে, তার মধ্যেই এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে। এ ট্রাজেডী সমগ্র পৃথিবীকে উলোট-পালট করে দিয়েছে, ইউরোপীয় সভ্যতার ওপর দুর্যোগ নেমে এসেছে এবং একই সাথে মুসলিম ও প্রাচ্য দেশসমূহও এর কবল থেকে রেহাই পায়নি।

দুর্নীতির ব্যাপকতা ও এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে ইসলামী শরীয়ত অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছে। সঠিক পথে মানুষকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঠোরভাবে ভর্ৎসনা ও বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা শরীয়তে আছে। অত্যাচারীকে সাহায্য করার জন্য সংগ্রাম এবং সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রয়োজনবোধে বলপ্রয়োগের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপ্রধানকে দেয়া হয়েছে। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর মৃত্যুর পর কতিপয় আরববাসী ধর্মদ্রোহিতা করে এবং তাদের প্রতি আরোপিত গরীবের হক আদায় করতে অস্বীকার করে অর্থাৎ যাকাত বা 'দরিদ্র কর' দিতে অস্বীকার করে। এ সময় আবূ বকর (রা) ঘোষণা করেন, "আল্লাহ্ আমার সাক্ষী, রসূলুল্লাহ্ (স)-কে তারা যা প্রদান করত, তা যদি আমার সময় প্রদান না করে, হতে পারে তা উট বাঁধার একটা দড়ি—তাহলে আমি এর জন্য তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" বস্তুত গরীবের ভাগ্যকে মানুষের হাতের কাছে ছেড়ে না দিয়ে তিনি তাঁর জন্য সত্যি সত্যি অস্ত্র ধরেছিলেন।

www.nagorikpathagar.org

কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামী শরীয়ত সাদ্‌কা আদায় ও বিতরণের ব্যবস্থা করে সমাজের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটানোর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ফলে সমাজকে রাষ্ট্রপ্রধান বা জাতির বিবেকের কাছে নির্ভরশীল হতে হয় না। তদুপরি সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য প্রয়োজনবোধে কর আরোপ করার ক্ষমতা শরীয়ত রাষ্ট্রপ্রধানকে দিয়েছে এবং কুরআনে নির্দেশিত সমাজের প্রত্যেকটি ব্যাপারে অপরিহার্য দায়িত্ব তাঁর ওপর ন্যস্ত করেছে। সাহায্য পাওয়ার দাবিদারদের যে তালিকা পবিত্র কুরআনে দেয়া হয়েছে, কিয়াসের মাধ্যমে যে কেউ তাতে আরও দাবিদারের নাম সংযোগ করতে পারে। কিয়াস হলো মুসলিম আইনের চতুর্থ সূত্র। উদাহরণস্বরূপ, দুস্থ রোগীর চিকিৎসা, অসমর্থ মাতার সন্তানের ভরণ-পোষণ, গৃহদান এবং কাজের উপযুক্ত বেকার লোকের খাদ্য ও কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব।

সংক্ষেপে বলা যায়, সাদকা হল দারিদ্র্য ঠেকাবার একটা অস্ত্র এবং সামাজিক ব্যাধি দূর করার ব্যবস্থাপত্র। জ্ঞানী, অভিজ্ঞ ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি এবং বিচারের সাথে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে রাষ্ট্রপ্রধান আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হতে পারেন বা আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারেন। জনকল্যাণের জন্য কাজ করাই তাঁর কর্তব্য এবং শ্রেণীতে শ্রেণীতে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কোন সংঘর্ষ দেখা দিলে বা তাদের মধ্যে ঘৃণা বা বিদ্বেষের সৃষ্টি হলে তিনি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারেন।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী মানুষের বিবেকের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে এবং সৎ লোকের জন্য পুরস্কার হিসেবে বেহেশতের কথা বলা হয়েছে। গরীব-দুঃখীদের সাহায্য করার কথা বা তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করার কথা পবিত্র কুরআনে এবং মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর বহু স্থানেই বলা হয়েছে। কুরআনের আয়াত এবং হাদীসসমূহ বর্ণনা করার স্থান এটা নয়। এখানে আল্লাহ্‌র নির্দেশ উল্লেখ করাই যথেষ্টঃ "আমার বান্দাদের মধ্যে যারা ঈমানদার তাদের বলুন, তারা যেন নামায কায়েম রাখে। আর আমি যে রুজী দান করি তা থেকে যেন তারা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, সেই দিনটি আসার আগেই, যেদিন আর বেচাকেনা অথবা বন্ধুত্ব থাকবে না।"[১৪]

মুসলমানদের নীতিশাস্ত্র সামাজিক সহযোগিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা দানশীলতাকে কাজের ও জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করে। "আল্লাহ্ ন্যায়বিচার কায়েম করতে ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা কায়েম করতে আর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দেরকে সাহায্য সহযোগিতা দানের জন্য আদেশ দিচ্ছেন।"[১৫] প্রত্যেকটি মানুষকে যদি ঠিকমত গড়ে তোলা যায়, তাহলে সে সমাজ সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

সামাজিক ব্যাধি দূর করতে ও মানুষের মধ্যে সংঘাত প্রতিহত করে সম্প্রীতি গড়ে তুলতে এ প্রস্তুতি সবচেয়ে ফলপ্রসূ পদ্ধতি বলে গণ্য।

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণে উপরিউক্ত পন্থাগুলো আমরা যদি শ্রেণী-সংগ্রাম রোধের নিশ্চিত উপাদান বলে ধরে নিই, তাহলে এ প্রেক্ষিতে উক্ত পন্থাগুলোর ইতিবাচক উপাদানগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় বলে ধরে নিতে পারি। আমরা দেখেছি যে, পরামর্শ সভা কর্তৃক নির্দেশিত এবং রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক পরিচালিত ইসলামী রাষ্ট্র বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর মত কাজ করে এবং তা সামাজিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান। আমরা আরও দেখেছি যে, এ ধরনের রাষ্ট্র বঞ্চিত শ্রেণীর জীবন যাপনের মানোন্নয়নের জন্য কাজ করে। একই সাথে অপব্যয় রোধ করার জন্য মুহাম্মদ (স)-এর বাণী দয়া, বিশ্বাস ও ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে মিথ্যা গর্ব ও আরাম-আয়েশ হ্রাস করে সমাজকে এমন পর্যায়ে আনার প্রয়াস পায়, যেখানে বিদ্বেষ বা অপকর্ম করার অবকাশ নেই। যারা অপব্যয় করে ও বিলাসপূর্ণ জীবন যাপন করে তাদের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করে অত্যন্ত ভয়াবহ সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে, তাদের গন্তব্যস্থল দোযখ এবং তারা আল্লাহ্‌র শাস্তি ভোগ করবে। পরকালে সুখের পথ তাদের জন্য রুদ্ধ। যে সমাজ অপব্যয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক করে না এবং লাম্পট্য প্রতিহত করে না, সেই সমাজ ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হবে বলে বাণীতে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তোমরা সবাই সেই ফিতনা ফাসাদকে ভয় কর—যা নাকি তোমাদের মধ্যে যারা জালিম, শুধু তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না ... ...।"[১৬]

"খাও দাও খুশীমত। কিন্তু অপচয় করো না। কারণ আল্লাহ্ পাক অপব্যয়কারীকে মোটেই ভালবাসেন না।"[১৭]

"আমি কত অসংখ্য জনপদ নির্মূল করে দিয়েছি—যারা রুজী-রোজগারের কারণে বড়াই করত। সুতরাং এই ত হচ্ছে তাদের বাড়িঘর। তারপরে আর তা আবাদ হয়নি—মাত্র গুটিকতক ছাড়া। আসলে আমিই ত সবকিছুর সর্বশেষ উত্তরাধিকারী।"[১৮]

সমাজ ধ্বংসের মূল কারণ হলো একটা জাতির প্রাচুর্য এবং আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আর যখন কোনও জনপদ বিনাশ করতে চাই তখন সেখানকার সম্পদশালী লোকদের কাছে আমার আদেশ পাঠাই আর তারা বেদম অপকর্মে মশগুল হয়ে পড়ে। এবং এভাবেই আমার বিধান কার্যকরী হয়ে থাকে। আর আমিও তাদের সমূলে নিপাত করে ফেলি।"[১৯]

জীবন ও সম্পত্তি পরিমিত পরিমাণে উপভোগ করার জন্য ইসলাম অনুমতি দিয়েছে কিন্তু আরাম-আয়েশের প্রতি অসম্মতি জানিয়ে পুরুষকে রেশম ও স্বর্ণালঙ্কার

www.nagorikpathagar.org

পরতে নিষেধ করেছে। অবশ্য স্ত্রীলোকদের স্বর্ণালঙ্কার (রেশম, সোনা, মুক্তা ইত্যাদি) পরার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে যেন বাড়াবাড়ি না হয় তার জন্য স্বামীদের ওপর সীমা নির্ধারণের ভার দেয়া হয়েছে। প্ররোচনামূলক পোশাক পরিধান করে নারীদের প্রকাশ্য স্থানে চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

অপব্যয়, আরাম-আয়েশ ও গর্ব প্রদর্শনের ওপর শরীয়তের আরও কতকগুলো বিধি-নিষেধ রয়েছে। ফলে মানুষের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ধনীরা তাদের ধন-সম্পদ ভাগাভাগি করে না দেয়া পর্যন্ত বেহেশতে যাওয়ার তাদের কোন রাস্তা নেই। কৃচ্ছ্রতা সাধনই তখন ধর্মপরায়ণতার প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। রসূলুল্লাহ্ (স)-এর যথেষ্ট কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ কৃচ্ছ্রসাধক। ইবনে মাসূদ[২০] বলেন ঃ

"একবার আমি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর ঘরে প্রবেশ করে দেখি—তিনি একটা মাদুরের ওপর শুয়ে আছেন এবং তাঁর পিঠে মাদুরের দাগ পড়ে গেছে। আমি তাকে বললাম, 'হে আল্লাহ্র রসূল, আমরা যদি আপনার শোয়ার জন্য একটা কার্পেটের ব্যবস্থা করি এবং আপনাকে পিঠে দাগ পড়া থেকে রক্ষা করি, তাহলে আপনি কি বলবেন ?' উত্তরে রসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ আমার এই দুনিয়াদারির কি প্রয়োজন ? এখানে আমি একজন মুসাফিরের মত, যে বৃক্ষছায়ায় বিশ্রাম গ্রহণ করে এবং আবার তার গন্তব্যস্থলের দিকে যাত্রা করে।"

জায়াদ ইবনে আসলামের [২১] উদ্ধৃতি দিয়ে ইবনে হিশাম[২২] বলেন ঃ

"রসূলুল্লাহ্ (স) যখন আত্তাব ইবনে-আসিদকে মক্কার গভর্নর নিযুক্ত করেন, তখন তিনি তাঁকে দৈনিক এক দিরহাম করে ভাতা মঞ্জুর করেন। ইবনে আসিদ জনগণকে উদ্দেশ করে বলেন ঃ "ভাইসব, আল্লাহ্ সেই পেটকে অনাহারে মেরে ফেলেন, যে পেট এক দিরহাম পাওয়ার জন্য লালায়িত। আল্লাহ্র নবী (স) প্রতিদিন এক দিরহাম করে আমার ভাতা মঞ্জুর করেছেন। আমার আর কোন দিরহামের প্রয়োজন নেই।"

বর্ণিত আছে যে, একবার মুহাম্মদ (স) তাঁর কন্যা ফাতিমার গৃহে আসেন। ফাতিমা তখন একটা সোনার হার হাতে নিয়ে অন্য একটা মহিলাকে তা দেখাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন এটা তাঁর স্বামী অর্থাৎ আলী তাঁকে উপহার দিয়েছেন। রসূলুল্লাহ্ (স) এ অবস্থায় ফাতিমাকে দেখে বলেন ঃ "হে ফাতিমা, লোকে যদি বলে যে রসূলুল্লাহ্র মেয়ে একটা আগুনের শিকল প্রদর্শন করাচ্ছে, তাহলে কি তুমি খুশী হবে ?" একথা বলে তিনি বিষণ্ন মনে ফিরে যান। ফাতিমা তখন হারটি বিক্রি করে দেন এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে একটা গোলাম মুক্ত করে দেন। রসূলুল্লাহ্ (স) যখন একথা জানতে পারেন তখন বলেন ঃ "সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি ফাতিমাকে আগুনের হাত থেকে রক্ষা করেছেন।"

www.nagorikpathagar.org

রসূলুল্লাহ্ (স) আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে বলতেন, "হে আল্লাহ্, তুমি মুহাম্মদের পরিবারকে সেইটুকু দিও, যা তাদের প্রয়োজন" অর্থাৎ প্রয়োজনের অতিরিক্ত যেন তাদের কিছু না থাকে।

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর বাণী এভাবে দারিদ্র্য ও বিলাসিতা, ঘৃণা ও ঈর্ষা প্রতিহত করেছে এবং এর ফলে শ্রেণী-সংগ্রাম অসম্ভবে পরিণত হয়েছে। এ বাণী ঐশ্বর্য ও বংশ গৌরবে গর্বিত হওয়াকে ঘৃণার চোখে দেখেছে এবং ধর্মপরায়ণতা ও সন্তুষ্টির গুণকে উর্ধে স্থান দিয়েছে। মানুষের অনেক জাগতিক ইচ্ছাকে এ বাণী আধ্যাত্মিক ঐশ্বর্য দ্বারা পূরণ করেছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, হযরত ফাতিমা (রা) সোনার হার বিক্রি করে এবং সেই অর্থ দ্বারা একটা গোলাম মুক্ত.করে যে (মানসিক) শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন, সোনার হার রেখে বা পরিধান করে তিনি সেই আনন্দ পেতেন না। খসরু ও সিজার বিজেতা ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হযরত ওমর (রা)-এর কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। অত্যন্ত সীমিত সম্পদের অধিকারী হয়ে তিনি আত্মতুষ্টি লাভ করেছিলেন। কিন্তু পরাক্রমশালী খসরু ও সিজার ঐশ্বর্যপূর্ণ ও বিলাসী জীবন যাপন করলেও তাদের প্রাসাদে শান্তি ছিল না।

সাদকা ও গরীবদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মত স্থিরীকৃত পদ্ধতি ছাড়াও স্বার্থত্যাগ ও বিবেকের মাধ্যমে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী সামাজিক সমস্যা সমাধানে অধিক সাফল্য লাভ করেছিল। আইন ও বিবেকের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এ বাণী উভয়ের কার্যকারিতার সফল প্রয়োগ সম্ভব করে তুলেছিল। সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার যে আহ্বান ইসলাম জানিয়েছে, তার উপকারিতা যুগ যুগ ধরে অব্যাহত থাকবে।

বর্ণগত ও জাতিগত বিরোধ

বিশ্ব-অশান্তির আর একটা কারণ জাতিগত ও বর্ণগত বিরোধ। এ সম্পর্কে এখন আলোচনা করা যেতে পারে। এ বিরোধের ফলে বৈষম্য, ক্ষমতা ও যশের জন্য বিবেকহীন প্রচেষ্টা এবং অন্যের অধিকার খর্ব করার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হলো অস্ত্রসজ্জা ও যুদ্ধ।

অতীতে মানুষ গোত্রীয় আনুগত্য নিয়ে একে অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে, শাসক হিসেবে একে অন্যকে ঈর্ষা করতে এবং আল্লাহ্ ও আল্লাহ্‌র পথ সম্পর্কে তাদের ধারণার বিভিন্নতা ছিল। কিন্তু আধুনিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার মত জাতীয় আবাসভূমি স্থাপনের বাতিক বা বর্ণগত অহঙ্কার কখনও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ হয়ে দাঁড়াত না। আরব, তুর্কী, বার্বার ও অন্যান্য মুসলিম জাতির ইতিহাস গোত্রীয় সংঘর্ষের ঘটনায় ভরপুর থাকলেও তাদের মধ্যে বংশগত সংঘর্ষের ঘটনা দেখা যায় না। ইউরোপেও ঠিক একই অবস্থা ছিল। সেখানেও জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও ভাষা

www.nagorikpathagar.org

নির্বিশেষে সকলেই একই রাজার প্রতি আনুগত্য পোষণ করত। প্রায়ই দেখা গেছে রাজপরিবার ছিল বিদেশ থেকে আগত বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত। একই পতাকার নিচে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকদের একতার মূলে ছিল আইনের কার্যকারিতা—তারা সকলেই একে অন্যের সুখ-দুঃখের অংশীদার ছিল। প্রায় দেখা গেছে, এই সংখ্যালঘু জনগণ তাদের সাথে বংশ ও ভাষাগত দিক থেকে ঘনিষ্ঠ এবং তাদের ভিন্ন নেতার চেয়ে তারা এক পতাকার প্রতি বিশেষভাবে আগ্রহ ও আনুগত্য প্রদর্শন করত।

আমাদের শতাব্দীতে জানামতে প্রায় রাষ্ট্রেই একই ধরনের অবস্থা ছিল। যেমন হাফস বার্গসদের অধীনে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান রাষ্ট্র। আমরা দেখেছি, আরব জনসাধারণ আরব শাসনকর্তাদের চেয়ে তুর্কীদের প্রতি বেশি বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রগুলোতেও আমরা একই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই। যেমন– আব্বাসীয়, হোলি রোমান এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য। একই পরিস্থিতিতে অস্ট্রিয়ার অধীন স্লাভগণ রাশিয়ার চেয়ে অস্ট্রিয়ার শাসনকর্তার প্রতি বেশি অনুগত ছিল।

রাজার একচ্ছত্র শাসনাধীনে তারা সবাই সমান ছিল। যারা মেধা ও গুণের সর্বোচ্চ পদে সমাসীন হত তারা নিজের বংশ বা জাতির চেয়ে সম্রাটের প্রতি বেশি অনুগত থাকত। সেইজন্য দেখা যায়, আব্বাসীয় যুগে হাশিমীদের অধীনে পারস্যের বার্মেকীরা[২৩] এবং তাহীরীরা[২৪] ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। উসমানীয় তুর্কীদের আমলে আলবেনিয়ার উচ্চভূমি থেকে আগত 'কোপরুলুরা'ও (Koprulu)[২৫] ক্ষমতার উচ্চাসনে আরোহণ করেছিল। দেখা যায়, আনুপাতিক হারে ক্রীতদাসদের মধ্য থেকেই বেশি সংখ্যক লোক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। মিসর থেকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যে কয়েকজন মামলুক[২৬] দাস বংশীয় ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন। দিল্লী ও কায়রোর বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভে এবং আটলান্টিক থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যে তাঁরা অমর হয়ে আছেন।

বংশ বা তাদের জন্মের কথা তাদের জিজ্ঞেস করা হয়নি বরং তাদের কার্যাবলী, চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতারই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যেসব মামলুক ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন আর্মেনিয়ান, রাশিয়ান, সিসিলিয়ান, জর্জিয়ান, সিরকাসিয়ান, তাতার, তুর্কী, ফরাসী, সুদানীজ এবং ইথিওপিয়ান। আমরা যদি তাঁদের বংশ পরিচয় অনুসন্ধান করি, তাহলে দেখতে পাব, সেখানে নানা বর্ণের মানুষ রয়েছে।

বর্তমানে যে অর্থে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ চালু, তা স্থিতিশীলতা রক্ষা করতে শুধু ব্যর্থ হয়নি, বরং পৃথিবীর অশান্তি আরও বাড়িয়েছে এবং নতুন করে আরও

www.nagorikpathagar.org

ব্যাপক ও জটিলতর বিপদের সৃষ্টি করেছে। ভৌগোলিক দিক থেকে জাতি তার পিতৃভূমির সীমানা নির্ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে—এক জাতি অপর জাতির সীমানা লংঘন করেছে এবং সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। প্রকৃতি খুব কম ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট জাতির জন্য নির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। সমগ্র ইউরোপে একমাত্র বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের সীমানা চতুর্দিকে পানি দ্বারা চিহ্নিত। তারপরও উত্তরাঞ্চলের আলস্টার প্রদেশ নিয়ে আয়ারল্যাণ্ড ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। প্রকৃতি যেখানে আকস্মিকভাবে কোন দুর্লংঘ্য মহাসমুদ্র বা দুর্গম গিরিশ্রেণী দ্বারা দু'দেশের সীমানা নির্ধারণ করে দেয়নি, যেমন ভারত ও চীন দেশের মধ্যে হিমালয় পর্বত, সেখানে সীমানা নিয়ে গোলযোগ দেখা দিয়েছে অনিবার্যভাবেই।

প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ইউরোপ নিজের রক্ত ঝরিয়ে চলছে এবং তার কারণ হলো, সংখ্যালঘুদের মুক্তি ও সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত যুদ্ধ। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফ্রান্স ও জার্মানদের যুদ্ধ, জার্মান ও অস্ট্রিয়ানদের যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ান, জার্মান ও স্লাভদের যুদ্ধ, অস্ট্রিয়ান ও ইতালীয়দের যুদ্ধ, বলকান রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ, উসমানীয় রাষ্ট্র ও ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের যুদ্ধ, রাশিয়া এবং তার দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমের প্রতিবেশীর যুদ্ধ, চেক ও পোল রুমানিয়াদের যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। সুতরাং দেখা যায়, পিতৃভূমি এবং তার সীমানা নির্ধারণের জন্য অহরহ যুদ্ধ লেগেই আছে। এসব কমছে না বরং জাতিবাদ ও জাতীয়তাবাদের ধারণা ঘনীভূত হওয়ার সাথে সাথে সময়ের বিবর্তনে সংখ্যানুপাতে তা বেড়েই চলেছে।

ইউরোপীয়দের এ পারস্পরিক শত্রুতার সমস্যা এবং সীমানা, জাতি ও সংখ্যালঘু সংক্রান্ত সংঘর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্য থেকে প্রাচ্যেও প্রসার লাভ করে। পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক মন্ত্রে প্রাচ্য যখন দীক্ষিত হয়, তখন তারা পিতৃভূমি ও জাতীয়তাবাদের পাশ্চাত্য ধারণা গ্রহণ করে। সাম্প্রতিককালে আলেকজান্দ্রিয়া প্রদেশ নিয়ে সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে এবং 'শাতিল আরব' তীরবর্তী এলাকা ও অন্যান্য সীমানা নিয়ে ইরাক ও ইরানের মধ্যে যে গোলযোগ তা বলকান সমস্যারই অনুরূপ। ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার জন্য মুসলমানরা আগে কুলগত বা জাতিগত প্রশ্নে ঝগড়া-বিবাদ করেনি। পাশ্চাত্যের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের হঠকারিতা অবলোকন করা সত্ত্বেও অধুনা তা প্রাচ্যের বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ধরনের বিরোধই আজকে আরবদের সাথে তুর্কীদের, কুর্দদের সাথে সিরকাসিয়ানদের, আজারবাইজানদের সাথে ইরানীদের, আফগানদের সাথে পাকিস্তানীদের (পাঠান প্রশ্নে), ভারতীয়দের সাথে পাকিস্তানীদের (কাশ্মীর প্রশ্নে), উজবেকদের সাথে চীন ও মঙ্গোলিয়ার সম্পর্কের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। এসব দেখে মনে হয়, সীমানা ও সংখ্যালঘু প্রশ্নে প্রাচ্যের প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই একে অপরের সাথে বিদ্বেষমূলক বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়বে, যা এতদিন কেবল পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক জাতীয়তাবাদ বস্তুত একটি অকল্যাণকর ধারণা। বর্ণবাদ তার চেয়েও খারাপ। মনে হচ্ছে, কোটি কোটি মানুষকে তাদের বর্তমান ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় আটকে না রাখা পর্যন্ত এ সমস্যার কোন সমাধান মিলবে না।

সম্প্রতি কিছু কিছু ইউরোপীয়ান তাদের বিশেষ কৌলীন্যের খুব বড়াই করতে আরম্ভ করেছে এবং তারা ভেজালমুক্ত রক্তের বৃহৎ জাতির সদস্য বলেও দাবি তুলছে। এটা নেহায়েতই একটা ফাঁকা ও ভুয়ো ধারণা। এ ধারণা পৃথিবীতে শুধু উত্তেজনাই বৃদ্ধি করছে।[২৭] রক্ত পরীক্ষা করে কারও পক্ষে বিভিন্ন জাতির পার্থক্য নির্ধারণ করা কি সম্ভব? এ ধরনের চরম আদর্শ, ভাষাভিত্তিক মতবাদ ও সংখ্যালঘুদের প্রতি অনিষ্টকর আচরণ এবং সীমান্ত বিরোধে এ মারাত্মক বিষ যে প্লেগের মতই মহামারী সৃষ্টি করে এবং মানুষের মধ্যে বিশ্বাস বা সমঝোতা প্রতিষ্ঠাকে সুদূর পরাহত করে তুলবে, তা বলাই বাহুল্য।

গ্রীস ও তুরস্ক বাধ্যতামূলকভাবে লোক বিনিময়ের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে[২৮] কিন্তু তাতে কোন পক্ষই লাভবান হয়নি। জনগণকে তাদের পৈতৃক আবাসভূমি থেকে উৎখাত করতে গিয়ে তারা যে কি তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, তা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যা হোক, লোক বিনিময়ের এ দৃষ্টান্ত—যা বিশেষ কারণে করা হয়েছিল—সাধারণ নিয়মে রূপান্তরিত করা যায় না। ধরে নেয়া যাক, এ নীতি অবলম্বন করে কোন এক যুগের মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীযুগে এ শান্তি অবশ্যই বিঘ্নিত হবে। কারণ আদান-প্রদান হলো জীবন-যাপনের সাধারণ নিয়ম। সময়ের বিবর্তনে স্বার্থের পরিবর্তন হবে, জাতির অভ্যুদয় ও বিলোপ ঘটবে, নতুনভাবে সংমিশ্রণ ও ব্যাপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে দেখা দেবে এবং তার ফলে পুনরায় শুরু হবে নিষ্ঠুর আচরণ ও বলপূর্বক বহিষ্কার।

লীগ অব নেশন্স সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এ চেষ্টা সফল হয়েছে কি? সুডেটেনল্যান্ড, লরেন, ডানজিগ, ট্রানস্যালভেনিয়া ও বাসারাবিয়ার সংখ্যালঘু সমস্যা কি গত বিশ্বযুদ্ধের একটা প্রধান কারণ ছিল না?

উগ্র জাতীয়তাবাদ বা চরম স্বদেশপ্রেম বিশ্ব-অশান্তির অন্যতম মূল কারণ। এর জন্যই স্থানীয় সংঘর্ষ ক্রমান্বয়ে আজ বিশ্ব সংঘর্ষের রূপ পরিগ্রহ করেছে। পৃথিবীর কোন এলাকাই আজ যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে মুক্ত নয়। যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতির সাথে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের উগ্র ধারণা ব্যাপ্তি লাভ করায় যুদ্ধও প্রসার লাভ করেছে।

আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা কৌলীন্যবাদ বলতে যা বোঝায়, মুহাম্মদ (স)-এর বাণী তার একটিও স্বীকার করে না। মুসলমানদের পিতৃভূমি কোন ভৌগোলিক

www.nagorikpathagar.org

সীমারেখা স্বীকার করে না—বিশ্বাসের প্রসারের সাথে সাথে তাদের পিতৃভূমিরও প্রসার ঘটে।[২৯] বাস্তবে এটা একটা আধ্যাত্মিক পিতৃভূমি, যেমন ধর্ম একটা আধ্যাত্মিক ব্যাপার। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আমার বান্দাগণের মধ্যে যারা ঈমানদার, তারা শোন! আমার দুনিয়া খুবই বিস্তৃত। সুতরাং তোমরা শুধু আমারই বন্দেগী কর।"[৩০] একজন মুসলমান অপর একজন মুসলমানের ভাই, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন,—নিজের প্রতিবেশী মুসলমান বা পৃথিবীর কোন দূর অংশের মুসলমানও হতে পারে। ইসলামী রাষ্ট্রের যে স্থানকেই মুসলমানরা বসবাসের জন্য মনোনীত করুক না কেন, সে তার পিতৃভূমিতেই বসবাস করতে শুরু করে। আর যদি সে এমন এক দেশে বসবাস করে, যে দেশের এক শ্রেণীর জনগণ মুসলমানদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন (দারুল-হরব) এবং যে দেশে তার অধিকার ও কর্তব্য খর্ব করা হয়, তা হলে সে দেশ ত্যাগ করার সাথে সাথে সে তার সকল অধিকার ও কর্তব্য ফিরে পাবে বা পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে দেশের জনগণ যদি মুসলমানদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তাহলেও সে তার অধিকার ও কর্তব্য ফিরে পাবে।

জাতিবাদ বা গোত্র, জাতি, বর্ণ, ভাষা বা সংস্কৃতির প্রতি গোঁড়া সমর্থন ইসলাম-পূর্ব যুগের মূর্তিপূজারই উপজাত ফল এবং এজন্য ইসলাম তা প্রত্যাখ্যান করে। রসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করেছেন ঃ "যে গোঁড়ামি প্রচার করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।" ইসলাম যে কোন ধরনের গোঁড়ামিই প্রত্যাখ্যান করেছে। সমগ্র আনুগত্য পাওয়ার মালিক হবেন আল্লাহ্ এবং আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বাইরে আর কোন সম্পর্ক গণ্য করা হয় না।

পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আমি তোমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়, গোষ্ঠী, গোত্র ও পরিবার হিসেবে বানিয়েছি—যেন তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার, জানতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দরবারে তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি বেশি সম্মানিত, মর্যাদাসম্পন্ন, যে নাকি তোমাদের মধ্যে সবচাইতে বেশি পরহিযগার।"[৩১]

"আপনি বলুন ঃ তোমাদের পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ, তোমাদের ভাইগণ, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের পরিবার-পরিজন ও বিষয়-সম্পদ—যা তোমরা কামাই করেছ আর যে ব্যবসায়ে অচলাবস্থা দেখা দেওয়ার মত আশংকা রয়েছে, আর যে সব ঘরবাড়ি তোমরা খুবই পছন্দ করে থাক, এসব যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল আর তাঁরই রাহে জিহাদের তুলনায় বেশি প্রিয় হয়ে থাকে তোমাদের কাছে—তাহলে অপেক্ষা কর, যতক্ষণ আল্লাহ্ তাঁর হুকুম না পাঠান। আসলে আল্লাহ্ অবাধ্য কওমকে সরল সত্য সনাতন পথের অনুগামী করেন না।"[৩২]

চিন্তার ঐক্য ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যের ওপর ইসলাম মানবীয় সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আধুনিক দর্শনের চেয়ে তা নিঃসন্দেহে মহৎ। কারণ আধুনিক দর্শনের ভিত্তি

www.nagorikpathagar.org

হলো জাতীয়তাবাদ ও জড়বাদী স্বার্থ। ইসলামী দর্শন মানবতাকে অনেক উর্ধে স্থান দিয়ে তাকে মনেপ্রাণে সম্মান করে, অথচ আধুনিক মতবাদ জড়বাদের ছায়ায় মানুষের পশুপ্রবৃত্তির ওপরই বেশি জোর দিয়েছে। দৈহিক প্রয়োজনের চেয়ে আধ্যাত্মিক প্রয়োজনের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপের বিষয় যে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সহানুভূতি প্রদর্শনের পক্ষে সহায়ক তা কে না জানে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পেট্রোল বা তুলা নিয়ে যেমন মানুষে মানুষে বিবাদ হয়, তেমনি বিশ্বাস ও মতাদর্শ নিয়েও তাদের মধ্যে বিবাদ হতে পারে। কিন্তু এ ধরনের বিবাদ থাকার অর্থ এ নয় যে, সংঘাত এড়িয়ে বিশ্বযুদ্ধের আশংকা হ্রাসের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে না। মানুষের মধ্যকার মতানৈক্য প্রথম দৃষ্টিতে যথার্থ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি নিয়ে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দৈহিক প্রয়োজনীয় বস্তু দরকারী সম্পদের ওপর অন্যের অন্যায় হস্তক্ষেপে মানুষের প্রতিক্রিয়া যত তাৎক্ষণিক এবং এ ব্যাপারে সে যতটা মরিয়া হয়ে উঠে, অন্য ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না। সেচের পানি নিয়ে বা ক্ষেতের সীমানা নিয়ে কোন বিবাদ দেখা দিলে কোন কৃষক হয়ত তার প্রতিবেশীকে হত্যাও করতে পারে। কিন্তু বিশ্বাসের ভিন্নতা নিয়ে সে তার প্রতিবেশীর সাথে ঝগড়া-বিবাদ করে না। বিশ্বাসের মতবিরোধ নিয়ে কেউ প্রতিবেশীকে হত্যা করেছে, এমন কথা আমি শুনিনি। যদি এ ধরনের কোন বিরাট ঘটনা ঘটে থাকে তবে তাকে ব্যতিক্রম বলা যায়।[৩৩]

যে কোন আদর্শভিত্তিক তৎপরতায় প্রথম পর্যায়ে প্রচণ্ড উৎপীড়ন হতে পারে। কিন্তু পরে তা সাধারণত যুক্তির বিজয় ও ধৈর্যের গুণে স্থিতিশীল হয়ে পড়ে। কারণ ক্রমাগত উস্কানি ছাড়া মানুষ আক্রমণ করতে পারে না। আর এ উস্কানির সাথে জড়িত থাকতে হয় নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুগত স্বার্থ। দেখা যায় কোন বিষয়ে গভীর আগ্রহ পরবর্তীতে নিষ্ঠুরতায় রূপান্তরিত হয়, বিশেষত মহৎ উদ্দেশ্যের সাথে যেখানে বস্তুগত লালসা সুপ্ত থাকে।

তবু মুহাম্মদ (স)-এর বাণী এ ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছে এবং বাণী প্রচারের জন্য তিনি তাঁর অনুসারীদের বলপ্রয়োগ নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনেও ঘোষিত হয়েছে ঃ "ধর্মের জন্য কোন জবরদস্তি নেই। নিশ্চয়, সুপথ কুপথ থেকে আলাদা হয়েছে।"[৩৪] বিশ্বাস ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করা ছাড়া ইসলাম বলপ্রয়োগ অনুমোদন করে না।

সুতরাং, উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, জাতীয়তাবাদ ও কৌলীন্যবাদের দরুন এবং কোন জাতির, শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর বস্তুগত দাবির জন্য যে বিশ্ব-অশান্তির সৃষ্টি হয়, তার সমাধান মানব সম্পর্কের ওপর ভিত্তিশীল মুহাম্মদ (স)-এর বাণীর

www.nagorikpathagar.org

মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ বাণী অবতীর্ণ ধর্মের মতই এতদ্‌সংক্রান্ত সংগ্রামে পরিপূর্ণ বিজয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

এ আদর্শের মধ্যে মানব জাতি তাদের সঠিক পথের নির্দেশ পেতে পারে। গত বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত বিশ্বসংস্থা যদি অনুসন্ধান করে, তবে এর মধ্যেই মহত্তম সুদূরপ্রসারী ভ্রাতৃত্ববোধের দর্শন আবিষ্কার করতে সক্ষম হবে, যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে একদা ওমর ইবনে আল-খাত্তাব বলেছিলেন, "আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাস সলিম যদি আজ বেঁচে থাকত, তবে আমি তাকেই আমার উত্তরাধিকারী করে যেতাম।"[৩৫] এ আদর্শ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ্ (স) অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় বলেছেন ঃ "সত্যিই আমি প্রত্যেকটি ধার্মিক লোকের ভাই, যদি সে আবিসিনিয়ার ক্রীতদাসও হয় এবং আমি প্রত্যেকটি দুর্বৃত্তের বিরোধী, যদি সে অভিজাত কুরায়শও হয়।"

আধ্যাত্মিক শক্তির পরাজয়

বিশ্ব-অশান্তির আর একটা কারণ হলো জড়বাদী জীবনের আকস্মিক বিস্তৃতির সাথে পাল্লা দিয়ে ভারসাম্য সৃষ্টিতে আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যর্থতা।

প্রথম দিকে মানুষ বস্তুর ওপর অত্যন্ত সীমিত নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করত। বাষ্প ও বিদ্যুৎ আবিষ্কার, পরমাণুর ব্যবহার, বস্তুর মৌল ও যৌগিক উপাদানের পরিবর্তন সাধন ইত্যাদি আবিষ্কার করার পর মানুষের মধ্যে প্রকৃতিকে জয় করার ইচ্ছা প্রবল হয়। এর আগে মানুষের এ ইচ্ছা এত প্রবল ছিল না। রাসায়নিক বস্তু ও গতিবিদ্যা ব্যবহারে মানুষ যখন পারদর্শী হয়ে উঠে, তখন সে দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে। প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এর থেকে উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্য লাভের ফলে মানুষের দৃষ্টি সে দিকেই আকৃষ্ট হয়ে যায়। জীবনের অন্যান্য দিকে দৃষ্টিপাত করার সময় বা ইচ্ছা তার আর থাকে না।

বিগত কয়েক যুগের মধ্যে পৃথিবীর অনেক প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং সেই সাথে মানুষের চিন্তাধারাও হয়েছে বিপরীতমুখী। গুহাবাসীরা যেমন বর্তমান গগনচুম্বী অট্টালিকাসমূহ প্রত্যাখ্যান করবে, তেমনি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের যদি কবর থেকে তুলে আনা যায়, তাহলে তারাও বর্তমান সভ্যতাকে বর্জন করবে। জীবন-যাত্রার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য এখন বদলে গেছে এবং মানুষ স্থিতিশীলতা ও শান্ত পরিবেশ বর্জন করে গতির পেছনে দৌড়াচ্ছে এবং তা উপভোগ করছে ঠিক যেভাবে তাদের পূর্ব-পুরুষরা গোলমাল ও গতি বর্জন করেছিল।

জীবন যাত্রার পদ্ধতি আকস্মিকভাবে বদলে গেছে এবং এ পদ্ধতিতে এখনও স্থিতিশীলতা আসেনি। জীবন এখনও ক্রমাগত পরিবর্তনশীল। আমার পিতা ও আমার মধ্যকার ব্যবধান মাত্র এক পুরুষের। কিন্তু আমার পিতা ও পিতামহের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল, আমাদের মধ্যে সেই পার্থক্য অনেক বেশি।

www.nagorikpathagar.org

যে দ্রুততার সাথে পার্থিব পরিবর্তন ঘটছে, তার যে শেষ কোথায় তা বলা মুশকিল। মানুষ নতুন বস্তুবাদের ধাঁধায় পড়ে আধ্যাত্মিক জীবনের কথা হয় ভুলেই যাচ্ছে আর না হয় তা লালন করতে সক্ষম হচ্ছে না। আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য রক্ষা করতে যে পরিমাণ একাগ্রতার প্রয়োজন, তা সে এখন হারিয়ে ফেলছে। পক্ষান্তরে বস্তুর বিস্ফোরণের সাথে তুলনীয়, নতুন আদর্শ ও ভাবধারার সাথেও সে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। হাজার বছরের সাধনার মধ্য দিয়ে মানুষ যে আধ্যাত্মিক জীবন অর্জন করেছিল, তা গত এক শতাব্দীতে গড়েওঠা বস্তুবাদের পিছনে পড়ে আছে। জীবন যতই গতিশীল হচ্ছে, ততই মানুষ মনে করছে যে জীবনের এ ব্যাপক আধ্যাত্মিকতার ভারেই তারা পিছিয়ে পড়ছে অথবা আধ্যাত্মিকতা এখন আর তাদের সাথে তাল মিলিয়ে অগ্রসর হতে পারছে না। এ ধারণার দরুনই মানুষ অধুনা আধ্যাত্মিকতাকে পরিহার করে চলছে।

বিভিন্ন দেশের মানুষের জীবন-যাত্রায় আজ বিরাট ব্যবধান সূচিত হয়েছে অথচ পূর্বে তারা একই আধ্যাত্মিক ভাবধারা ও একই ঐতিহ্যের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। ব্যক্তিগত আচরণ ও জীবন-যাত্রার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের অভিন্ন। বর্তমান পৃথিবীর অনেক জায়গায় একই বংশের এমন কি একই পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের মধ্যে বস্তুগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক পার্থক্য কয়েক শতাব্দী পূর্বে উত্তর ইউরোপের একজন লোকের সাথে মধ্য এশিয়ার একজন লোকের পার্থক্যের চেয়েও বেশি। আজকে মিসরের উচ্চ ভূমির একজন কৃষক কায়রোতে এসে তার গ্রামের সাথে কায়রোর যে পার্থক্য দেখতে পাবে, ১৪শ শতাব্দীতে ইবনে বতুতা তাঁর বিশ্বপরিক্রমায় যেসব মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে এ ধরনের পার্থক্য ছিল কিনা আমার সন্দেহ হয়। এক জাতির মধ্যে আজকাল বিভিন্ন সম্প্রদায় রয়েছে। বস্তুবাদী অনুসন্ধিৎসার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাদের চিন্তা, প্রথা ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা। এদের মধ্যে একদল আছে যারা বস্তুবাদের জাঁকজমকপূর্ণ চলন্ত গাড়িতে চড়ে আছে, কেউ বা আছে ঝুলন্ত অবস্থায়, কেউ বা এর পেছনে দৌড়াচ্ছে, কেউ বা এর দিকে বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে তাকিয়ে আছে এবং কেউ বা হয়ত পরাজয় স্বীকার করে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

বস্তুবাদী সভ্যতার সভ্য দেশগুলোর ঐক্য বাহ্যিক। তাদের আধ্যাত্মিক বন্ধন যত শক্তিশালী হতে পারত, তার থেকে এ বন্ধন অনেক দুর্বল। পক্ষান্তরে অনুন্নত বলে কথিত দেশগুলো থেকে বলতে গেলে তারা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন।

প্রত্যেক জাতিই একটা সম্পর্কহীন শ্রেণীর উদ্ভব প্রত্যক্ষ করেছে। আজকের জগতে মানুষ এমন এক পর্যায়ে উপনীত যেখানে মানুষ মানুষকে অস্বীকার করছে, বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ও একে অপরকে করছে অস্বীকার। মানুষের চিন্তাধারা জটিল হয়ে গেছে, মানবিক আইন হয়ে পড়েছে কলুষিত, পার্থিব জীবনে রূপও গেছে বদলে,

www.nagorikpathagar.org

ভাবধারাও হয়েছে অসংখ্য। আজ একের থেকে অন্যের জীবন যাত্রা প্রণালীর ব্যবধান শুধু দুস্তর নয়, মানুষের জীবনের লক্ষ্যও হয়েছে বিভিন্নমুখী। এ ক্রান্তিকাল যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সকলের পক্ষে বা একটা বড় দলের পক্ষেও গ্রহণযোগ্য জীবন ধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করা বা কোটি কোটি মানুষ একদিন যে আধ্যাত্মিক বন্ধনে আবদ্ধ ছিল, সেই বন্ধনে আবার ফিরে আসা তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়ে পড়বে।

কথা উঠতে পারে যে, গতির ওপর নির্ভরশীল বস্তুবাদী জীবন পদ্ধতিও কোন একক ধারণা হিসেবে সকলের কাছে গ্রহণীয় একটা আদর্শভিত্তিক পদ্ধতি হতে পারে, যেমন কোটি কোটি চীনা লোক ও ভারতীয় তাদের প্রাচীন আইন ও ধর্মকে গ্রহণ করে নিয়েছে। অস্বীকার করি না যে, এ ধারণা হয়ত সুদূর কোন ভবিষ্যতে কার্যকর হতেও পারে। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, পৃথিবীকে এখনও বহু পরিবর্তনের ভয়াবহতা ও অস্থিতিশীলতার সম্মুখীন হতে হবে। মানুষ যেমন তার পরিধানের কাপড় পরিধান করতে পারে না, তেমনি সে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া আধ্যাত্মিকতা ও মানসিকতা পরিহার করতে পারে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ফলে মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শের বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যাবে এবং এর ফলশ্রুতি হিসেবে মানুষের জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।

সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্য হলো আমাদের উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া অধ্যাত্মবাদের সাথে যতদূর সম্ভব হঠাৎ করে গড়েওঠা এ নব্য বস্তুবাদের সমন্বয় সাধন করা। এ ধরনের সমন্বয় সাধিত না হলে পৃথিবীতে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকবে আর তার ফলশ্রুতি হিসেবে জাতিতে জাতিতে ও শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভয়াবহ সংঘর্ষ বাঁধবে। যান্ত্রিক সভ্যতার ফল ভোগ করতে হলে বা তার অবদান সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে হলে নতুন বস্তুবাদী জীবনের সাথে তাল মিলিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। বস্তুবাদী সভ্যতায় অফুরন্ত সম্ভার রয়েছে এবং যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ অনেক রকমের বাধা-বিপত্তি জয় করছে। মানুষ উৎপাদন বাড়িয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি করেছে, দুরারোগ্য ব্যাধি জয় করেছে এবং অজন্মা রোধ করতেও সমর্থ হয়েছে। ভোগ-বিলাসের অসংখ্য উৎস আজ মানুষের আয়ত্তে। পৃথিবীকে সে আজ নবসাজে সজ্জিত করেছে এবং তার ভূষণ বড়ই মনোমুগ্ধকর। এক শতাব্দীর মধ্যে মানুষ যে উন্নতি সাধন করেছে তা পূর্বের বহু শতাব্দীর উন্নতির চেয়ে বেশি। আবার এ এক শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে অর্জিত আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার প্রায় সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতেও বসেছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ "যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেছে, আল্লাহ্‌ পাক তাদের দিশেহারা করে দিয়েছেন।"[৩৬]

www.nagorikpathagar.org

অধ্যাত্মবাদ মাত্র কয়েক যুগের মধ্যে জড়বাদের কাছে মারাত্মকভাবে পরাজিত হয়েছে। বস্তুবাদকে সহায়তা করেছে বোবা যন্ত্র, যা মানুষের ওপরও আধিপত্য বিস্তার করতে চাইছে। আর মানুষ ন্যায়নীতি, ধর্ম ও আইন বিসর্জন দিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে। মানুষের অধ্যাত্মবাদ এখানে কোন কাজেই আসছে না। অধ্যাত্মবাদের মূল্য সম্পর্কে মানুষ আজ প্রশ্ন উত্থাপন করছে আর এর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। মৃতের প্রতি জীবিত ব্যক্তির মত অনেকে সহানুভূতি দেখাচ্ছে। আবার অনেকে পরাজিতের দুর্ভাগ্যে বিজয়ীর আনন্দের মত উল্লাস প্রকাশ করছে। অবশ্য অনেকে এখনও অধ্যাত্মবাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আছেন। কিন্তু তারা নিজেদের নিয়ে এমনই ব্যস্ত যে, সভ্যতার মিছিলে তাঁরা পড়ে রয়েছেন অনেক পেছনে অথচ সামনে মিছিল বিজয়ীর গৌরব ও দীপ্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

কারও প্রতি কোন রকম কটাক্ষ না করে বলা যায়, আমরা এমন একটা পন্থা অবলম্বন করেছি যা আমাদের উপভোগের বস্তুকে সভ্যতাসহ আমাদের ধ্বংস করার অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। আধ্যাত্মিক শক্তিকে সমর্থন দেয়ার বদলে আমরা সমর্থন দিচ্ছি বস্তুবাদের প্রতি আর এরই জন্য আমাদের নতুন নতুন আবিষ্কার ও নতুন নতুন মতবাদ সংযোজন করতে হচ্ছে। এসব ভয়াবহ মতবাদের পক্ষে আমরা যতই ওকালতি করছি এবং তা বাস্তবায়নের জন্য যতই চেষ্টা করছি, ততই আমরা ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

নারী-স্বাধীনতার নামে আমরা গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করেছি, পিতৃভূমির স্বাধীনতার নামে আমরা জাতিকে কেটে টুকরা টুকরা করেছি। শ্রমিকের স্বাধীনতার জন্যে আমরা পুঁজিবাদের মূলোৎপাটন করার নামে সমাজের সকল শ্রেণীর ওপর অত্যাচার করে চলেছি, আর এ স্বাধীনতার অপচয় ঠেকাতে গিয়ে আমরা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বাধীনতা ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা হারাতে বসেছি। বর্তমানে যন্ত্রের বিজয়ের যুগে সমাজের জ্ঞানী-গুণী, বুদ্ধিমান ও দার্শনিক লোকেরা মানব সমাজের ওপর যত বেশি প্রভাব হারিয়েছেন, অতীতে এরকম আর কখনো হয়নি।

তবু ধর্ম ও হাজার হাজার পরীক্ষিত ঐতিহ্যগত আইন ও ন্যায়নীতির বিলোপ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। ধর্ম, ঐতিহ্যগত আইন ও ন্যায়-নীতি যদি বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক জীবনকে দাঁড় করিয়ে রাখার মত যদি অন্য কিছু তার স্থলাভিষিক্ত না হয়, তাহলে প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও আধুনিক যন্ত্রদানবের বিস্ফোরণ কি দিয়ে ঠেকানো যাবে, যে যন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে মানব-কল্যাণের দিকে চালিত করতে মানুষ ব্যর্থ হয়েছে? কিন্তু যাই ঘটুক, যন্ত্রের শব্দে সুস্থ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের চিন্তাধারা লুপ্ত হতে দেয়া চলে না। পক্ষান্তরে আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষ থেকে মানুষকে আজ ধৈর্য ও শ্রম সহকারে বস্তুবাদী ধ্যান–ধারণার পাশাপাশি আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকেও

www.nagorikpathagar.org

এমনভাবে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে যাতে উভয়বিধ মূল্যবোধ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী না হয়ে পারিবারিক সহযোগীর মত ঐক্যবদ্ধ ও সক্রিয় থাকতে পারে।

সত্যি বলতে কি, এ দুই অবস্থার মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানিয়ে ইসলাম অত্যন্ত দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে। বলা হয়েছে ঃ "ইহকালে তোমরা এমনভাবে তৈরী হও যেন তোমরা এ পৃথিবীতে চিরকাল বেঁচে থাকবে এবং পরকালের জন্য তোমরা এমনভাবে তৈরী হও যেন আগামীকালই মারা যাবে। ইহকাল পরকালে পৌঁছাবার একটা উপায় মাত্র।"[৩৭] সুতরাং বস্তুবাদী জীবনকে—যা এক শতাব্দীতে বহু রূপ ধারণ করেছে—পরকালের কল্যাণময় অনন্ত জীবনে পৌঁছার একটা বাহন হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

অনেকে মনে করতে পারেন, আমি বস্তুবাদের সাথে আকস্মিকভাবে সংযুক্ত তার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অস্বীকার করছি এবং নয়া সভ্যতার প্রতি অনুকূল মনোভাবের নিন্দা করছি। নয়া সভ্যতার প্রতি অনুকূল মনোভাবকে আমি একেবারে অস্বীকার করিনি। কেউ কেউ হয়ত আশংকা প্রকাশ করতে পারেন যে, বোবা মেশিনের অগ্রগতির পূর্বেই মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ভিত্তি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল। মানুষ ভুলে গিয়েছিল যে, কোন বস্তুর গুণ নির্ভর করে কিভাবে তা ব্যবহৃত হবে এবং কে তা ব্যবহার করবে। যন্ত্রযুগের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সম্পর্কে এটুকু বলা যেতে পারে যে, শতাব্দীর এক-চতুর্থাংশের মানুষ দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করেছে। যে সভ্যতার বহিঃপ্রকাশ এ যুদ্ধে প্রতিফলিত হয়েছে সেই সভ্যতার মূল্য কি, এ প্রশ্ন স্বাভাবিক। এ পর্যায়ে ক্ষণকালের জন্য হলেও থমকে গিয়ে ধর্মের আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পর্কে গভীর চিন্তা ও পুনর্বিবেচনা করার অধিকার আমাদের আছে। বোবা যন্ত্রের স্বেচ্ছাচারের মুকাবিলায় মানবীয় গুণাবলীকে আমরা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারি এবং তা করতে হলে আমাদের ধর্মের ওপর নির্ভর করতে হবে। আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের জনকল্যাণের পথনির্দেশ করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ বলেন ঃ "তোমরাই আদর্শ উম্মত মানব জাতির জন্য সংগঠিত হয়েছ। তোমরা নেক কাজের আদেশ আর অন্যায় কাজে বাধা দিতে থাক।"[৩৮] এভাবেই ইসলাম সৎ কাজে উৎসাহ ও মন্দ কাজে বাধা দেয়ার মধ্যেই জীবনের উদ্দেশ্যকে পরিচালিত করেছে।

যন্ত্রের উৎপাদিত পণ্য বণ্টনের জন্য বাজার নিয়ে সংঘর্ষ, নতুন পণ্যের জন্য অন্যের বাজার জোরপূর্বক দখল করা, খনিজ দ্রব্য উত্তোলন করার জন্য মাটি খনন, যন্ত্র চালু রাখার জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অন্যের সাথে সংঘাত, মানুষকে যন্ত্রের দাসে পরিণত করা এবং সবশেষে সেই বিশ্বযুদ্ধের জন্যে উস্কানি যুদ্ধে মানুষ ও সভ্যতা ধ্বংসের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা—এর কোনটাই কি মানব জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে ? আমরা এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যা স্থায়ী হতে পারে না।

www.nagorikpathagar.org

নৈতিক অবনতি এবং ভাল কাজের প্রতি সমর্থন দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ আজ বাহ্যিক চাকচিক্যের প্রতি এত বেশি নযর দিতে শুরু করেছে যে, সেসব দিকে ফিরে তাকানোর সময় তাদের নেই।

এর জন্য প্রয়োজন ধর্মীয় নির্দেশ এবং প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্মের ঐক্য, যার থেকে মানুষ শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। মানুষের জীবনে আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত শক্তির প্রয়োগ সমভাবে হতে হবে এবং বস্তুগত শক্তিকে আধ্যাত্মিক শক্তির নির্দেশ মেনে নিয়ে জনকল্যাণের জন্য কাজ করতে হবে। এ ধরনের কর্তব্যই আল্লাহ্ মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "তিনি তোমাদের জন্য ত সেই জীবন ব্যবস্থাই নির্ধারিত করেছেন—যে জন্য নূহকে আদেশ দান করেছিলেন। আর যা কিছু ওহীযোগে আপনার কাছে পাঠিয়েছি, আর যা কিছু আমি ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, সেই দীনকেই কায়েম রাখবে। আর তাতে তোমরা কিছুমাত্র মতভেদ সৃষ্টি করো না।"[৩৯]

অধ্যাত্মবাদের গুণাবলী যথা—বুদ্ধি, পুরুষকার বিশ্বস্ততা, শৌর্য, ধর্মপরায়ণতা, দয়া এবং সন্তুষ্টিকে বর্তমান যুগের বস্তুবাদ বিলোপ করার হুমকি দিচ্ছে। আর সত্য সত্যই যদি এসব মানবীয় গুণ পরাভূত হয়, তাহলে তার স্থান দখল করে নেবে অজ্ঞতা, বিশ্বাসহীনতা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বার্থপরতা, প্রবঞ্চনা এবং নিষ্ঠুরতা—যার পরিণতি বিশ্ব-অশান্তি ছাড়া কিছুই হবে না। এতসব কারণেই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে এ জীবনীশক্তি ও তার পবিত্রতার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এবং পার্থিব ও পারলৌকিক প্রয়োজনের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করে শরীয়তকে করা হয়েছে ন্যায়বিচারের দাঁড়িপাল্লার তত্ত্বাবধায়ক এবং এ ন্যায়বিচারের ভিত্তিতেই বস্তুবাদী স্বেচ্ছাচার প্রতিহত করার জন্য এবং বিশ্ব-অশান্তির কারণগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য শরীয়ত দৈহিক প্রয়োজনের মুকাবিলায় আধ্যাত্মিক প্রয়োজনীয়তাকেও সমভাবে গুরুত্ব দিতে চায়। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে ঃ "আর এ মানুষ যাকে—তিনি সুষম করেছেন। তার পরে অনাচার থেকে বাঁচার আর পরহিযগার হওয়ার মত বুদ্ধি-বিবেচনা দান করেছেন। সেই ত নাজাত পেল, যে নিজেকে পাক-পবিত্র করল। আর যে ব্যক্তি তাতে ধুলো-মাটি লাগাল, সে ত ক্ষতিগ্রস্তই হলো।"[৪০]

দুর্নীতির ত্রিমুখী ক্ষমতা

পূর্বোল্লিখিত কারণগুলো ছাড়া বিশ্ব-অশান্তির আরও কারণ আছে। কম তাৎপর্যপূর্ণ হলেও সে সবের গুরুত্ব কম নয়। কেননা স্থায়ী শান্তি স্থাপন করতে এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হলে এগুলো পরিহার করা প্রয়োজন।

www.nagorikpathagar.org

বিশ্ব-অশান্তির বহু কারণের মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা ও ভণ্ডামি অন্যতম, যা মানুষের নৈতিক চরিত্রকে কলুষিত করে। মানব সমাজের জন্য এগুলো দুষ্ট ক্ষতের সমতুল্য। এগুলো শুধু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনকেই কলুষিত করে না, বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্পর্ক বিনষ্ট করার ব্যাপারেও এদের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে। এ জন্যেই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে বারবার তাগিদ দেয়া হয়েছে, যেন মানুষের কার্যকলাপ ও আচরণের মধ্যে এ ধরনের কোন কিছু পরিদৃষ্ট না হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধুনা এসব অবাঞ্ছিত আচরণ মানুষের মধ্যে এত বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, তাতে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বস্তুবাদ প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। আজকাল মানুষ এমন সব ঘৃণ্য কার্যকলাপের আশ্রয় নিচ্ছে, যেগুলো তাদের পূর্ব-পুরুষরা সম্মান হানিকর ও মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর বলে বর্জনীয় মনে করত। উত্তম আচরণ ও তীক্ষ্নবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিরা যে সম্মান পেতেন, আজকের দিনে মানুষ সেই সম্মান দিতে শুরু করেছে একজন বিশ্বাসঘাতককে এবং তার কাজের সফলতার মাপকাঠিতেই তাকে বিচার করছে। কিন্তু খারাপ না ভাল কোন্ পদ্ধতিতে সে সফলতা অর্জন করছে, তা কেউ তলিয়ে দেখছে না। যখন আত্মসম্মান ও চরিত্রের উৎকর্ষ মর্যাদা পায় না তখন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যেও সে বিশ্বাসঘাতকতাই মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে এবং তার মনে আন্তর্জাতিক বন্ধন যে সাংঘাতিকভাবে বিপদের সম্মুখীন হবে, তাতে বিস্মিত হবার কি আছে।

বিগত অর্ধ শতাব্দীর বিশ্বরাজনীতির ধারা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সেখানে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ কাজের অসংখ্য দৃষ্টান্ত এবং অতি নিন্দনীয় দুমুখো নীতির বেড়াজাল। অধুনা আকস্মিক আক্রমণ এবং চুক্তিভঙ্গ একটা সাধারণ নিয়ম। অথচ ইসলাম প্রসারের যুগে এমন কি জাহিলিয়া যুগেও আরবরা যুদ্ধের যে শিষ্টাচার প্রবর্তন করেছিল, তাতে এ ধরনের কাজ ব্যক্তির ও জাতির জন্য শুধু মর্যাদা হানিকর ও নিন্দনীয় বলে মনে করা হত না বরং সাধারণভাবে এসব কাজ অনুমোদনই করা হত না।

পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসঘাতককে বারবার তিরস্কার করে মানুষকে বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে এবং চুক্তির পবিত্রতাকে ধর্মের ওপর স্থান দেয়া হয়েছে। ঘোষণা করা হয়েছে ঃ "... তারা যদি দীনের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায়, তাহলে অবশ্যই তাদের তোমরা সাহায্য করবে। কিন্তু যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি রয়েছে তাদের মুকাবিলায় নয়।"[৪১] চুক্তির পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারে মুসলমানরা যে সততার পরিচয় দিয়েছে তা যুগ যুগ ধরে তাদের গর্বের বস্তু হয়ে থাকবে। পবিত্র কুরআনে বিশ্বাসঘাতকদের তিরস্কার করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে ঃ "আল্লাহ্‌র ওয়াদা তোমরা পুরা কর। যখন তোমরা কোনও ওয়াদা করবে, পাকাপোক্তভাবে কোনও শপথ করার পরে তোমরা তা ভাঙ্গবে না। কারণ, তোমরা

www.nagorikpathagar.org

যে তাঁকেই নিজেদের জামিনরূপে মেনে নিয়েছ। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ জানেন, তোমরা যা কিছু করে যাচ্ছ। তোমরা সেই স্ত্রীলোকটির মত হয়ো না, যে নাকি অনেক কষ্ট করে কিছু সুতা কাটল, কিন্তু পরে তা টুকরা করে ফেলল। তোমরা নিজেদের শপথকে একদলের ওপরে অন্য দল ভারী হওয়ার জন্যই ব্যবহার করছ। আসলে আল্লাহ্ তোমাদের এ দিয়ে পরীক্ষা করছেন।"[৪২]

যারা চুক্তি নিয়ে খেলা করে এবং তা হঠকারিতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে, তাদের সাথে সেই সুতা কাটা ও তা খুলে ফেলা স্ত্রীলোকটির উপমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চুক্তির শর্তগুলো মেনে চলার পরিবর্তে যদি বিশ্বাসঘাতকতা সেই স্থান দখল করে, তাহলে বিশ্ব-অশান্তি দেখা দেয়। আল্লাহ্র নবী (স) বলেছেন, "সত্যই পুনরুত্থানের দিনে প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজের মাত্রা অনুযায়ী একটা পতাকা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং একজন নেতার বিশ্বাসঘাতকতা-মূলক কাজের চেয়ে অন্য কোন বিশ্বাসঘাতকতামূলক কাজই বড় নয়।"

রসূলুল্লাহ্ (স) তাঁর নিজের জীবনে ব্যক্তিগত ও সম্প্রদায়গত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আনুগত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন। আল-মুতিম ইবনে আদি নামে এক কুরায়শ শত্রুর প্রতি মুহাম্মদ (স) আজীবন শ্রদ্ধা দেখিয়ে গেছেন। তায়েফ প্রত্যাখ্যাত হয়ে তিনি যখন ফিরে আসেন, তখন এ মুতিমই তাঁকে মক্কায় প্রবেশে সাহায্য ও তাঁকে রক্ষা করেছিল। বদর যুদ্ধে আল-মুতিম অন্যান্য শত্রুর সাথে মৃত্যুবরণ করে। যদিও সে একজন পৌত্তলিক ছিল এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে মারা গিয়েছিল তবুও মুহাম্মদ (স)-এর সভাকবি হাসান ইবনে সাবিত এক কবিতায় তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। কবিতাটি তিনি মুহাম্মদ (স)-এর উপস্থিতিতে আবৃত্তি করেছিলেন। রসূলুল্লাহ্ (স) কোন আপত্তি না করেই কবিতাটি শ্রবণ করেন। আনুগত্যকে তিনি যে কত মূল্য দিতেন, এটা তার একটা উদাহরণ। ধর্মীয় পার্থক্য বা যুদ্ধ তাঁর আনুগত্যকে এতটুকুও ম্লান করতে পারেনি।

বাহ্যত যুদ্ধ জয়ের জন্য বিশ্বাসঘাতকতা একটা উপায় হিসেবে প্রতীয়মান হতে পারে। কারণ মানুষ যুদ্ধকে ন্যায়সঙ্গত প্রতারণা বলেই ধরে নিয়েছে। যা হোক বিশ্বাসঘাতকতা, অতর্কিত আক্রমণ, চুক্তিভঙ্গ এবং যুদ্ধে প্রতারণার মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণা একটা কৌশল। প্রতিপক্ষ পূর্ব থেকেই ধরে নেয় যে, তাকে প্রতারিত করা হতে পারে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণা করে তা ভঙ্গ করার ক্ষেত্রও প্রস্তুত করা হতে পারে। বস্তুত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতারণা আইনসম্মত যুদ্ধের পর্যায়ে পড়ে। আপনি যদি শত্রুকে বিশ্বাস করাতে সক্ষম হন যে, গোটা সৈন্যবাহিনী নিয়ে আপনি শত্রুকে একদিক থেকে আক্রমণ করছেন এবং সত্য সত্যই তা না করে যদি আপনি কয়েকজন সৈন্যকে সেদিকে পাঠিয়ে বাকি সৈন্য নিয়ে অন্যদিক থেকে

www.nagorikpathagar.org

আক্রমণ করেন তাহলে তাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলা যায় না। এটা যুদ্ধের একটা কৌশল মাত্র এবং যতদিন মানুষ যুদ্ধকে পুরুষোচিত গুণ ও নৈতিক আচরণ হিসেবে গ্রহণ করবে ততদিন যুদ্ধের কালে এ ধরনের কার্যকলাপ নৈতিক আচরণের সাথে সুসমঞ্জস বলে বিবেচিত হবে না।

অপরদিকে, বিশ্বাসঘাতকতা দুর্বৃত্তদেরও ঘৃণ্য। আমি এক বেদুইন সরদারকে জানতাম—যে একজন অপরাধীকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাকে কর্তৃপক্ষের কাছে ধরিয়ে দেয় এবং নিজের কাজের যথার্থতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলে, "অন্যাকে প্রতারণা করার অর্থ নিজেকে সাহায্য করা।" উক্ত প্রতারিত লোকটার গোত্রের সাথে বেদুইন সরদারের গোত্রের আজীবন শত্রুতা থাকলেও বেদুইন সরদারের এ কাজের প্রতি তার নিজের লোকেরাই ঘৃণা পোষণ করত। বেদুইন সরদার যে বক্তব্যের দোহাই দিয়ে এ ঘৃণ্য কাজটি করেছিলেন, সেই বক্তব্যটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিপজ্জনক। বিশ্বের বড় বড় জাতির সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ধরনের বক্তব্য আরো ভীতিপ্রদ হয়ে দেখা দিতে পারে।

অধুনা নিরীহ নির্দোষ জনগণ অহরহ বিশ্বাসঘাতকতা, অতর্কিতে আক্রমণ, চুক্তি ও মানবীয় গুণের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন প্রভৃতি নির্দয় কার্যকলাপের শিকারে পরিণত হচ্ছে। একথা সত্য যে, প্রাচীন কালের মতই আধুনিক জাতিসমূহের মধ্যে একটা উত্তেজনা ও অনিশ্চয়তার কারণ হচ্ছে এ বিশ্বাসঘাতকতা। দেখা গেছে, বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে যুদ্ধে জয়লাভ করেও বিজয়ীরা খুব কম ক্ষেত্রেই লাভবান হয়। এ পন্থায় প্রথম যুদ্ধে তারা জয়লাভ করে বটে, কিন্তু পরিণতিতে তারা তাদের সেই বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ জয়ের শিকারেই পরিণত হয়। আল্লাহ্ ঘোষণা করেছেন ঃ "আল্লাহ্ খিয়ানতকারী বিশ্বাসঘাতকদের চালবাজী সফল করেন না।"[৪৩]

জাতিতে জাতিতে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণতি গড়ায় সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্রের দিকে। মানুষ তখন যুদ্ধকালীন সময়ের মতই নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত হয়। আমরা দেখছি যে, বর্তমান যুগ এক দুর্যোগের মধ্যে পড়ে আছে। ফলে সর্বত্র ভীতির সঞ্চার পরিলক্ষিত হচ্ছে। আর অধুনা যুদ্ধের জন্য সর্বত্র যে নগ্ন প্রস্তুতি ও প্রতিযোগিতা—তার কারণ এটাই। বস্তুত আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এ ধরনের গজব এভাবেই নেমে আসার কথা। এজন্যই ইসলাম ওয়াদা পূরণের ওপর এত বেশি জোর দিয়েছে—এমন কি সে ওয়াদা বিশ্বাসঘাতকের সাথে হলেও। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা করার চেয়ে ওয়াদা পালন করা অধিক শ্রেয়।

মিথ্যা ও ভণ্ডামি প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রচুর সুযোগ ও অবকাশ সত্ত্বেও আধুনিক মানুষ আর আগের মত মোটেও সত্যনিষ্ঠ নয়। একথাও বলা যায় যে, যন্ত্রের এ যুগের মিথ্যা অত্যন্ত খারাপ রূপ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে। ফলে এখন মিথ্যাই হয়েছে

www.nagorikpathagar.org

আধুনিক নৈতিক বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। আগের যুগের মত সততাকে আর তেমন সম্মান করা হয় না। আধুনিক সকল দুঃখ-দুর্দশার কারণ হলো রাজনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এ ভণ্ডামি। মিথ্যা ও প্রতারণাই যে আগের চেয়ে অধিক মাত্রায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিপর্যস্ত করে তুলছে, সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ।

মেকিয়াভ্যালি তাঁর 'দি প্রিন্স' নামক পুস্তকে যে সব অভিমতের অবতারণা করেছেন তা যে নৈতিকতা ও ন্যায় আচরণের দিক থেকে সমর্থনযোগ্য নয়, তা মেকিয়াভ্যালি নিজেও জানতেন। কিন্তু অধুনা অনেকেই মেকিয়াভ্যালির মত সমর্থন করেন। কিন্তু সেই নীতিহীন মতকে তাঁরা সমর্থন করছেন নীতি-নিষ্ঠার ভড়ং দিয়ে। 'দি প্রিন্স' গ্রন্থ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, মধ্যযুগের মানুষ বর্তমান যুগের মানুষ অপেক্ষা অধিক সত্যনিষ্ঠ ছিল। কেননা বর্তমান যুগে অনেকেই মুখে মেকিয়াভ্যালির নীতিকে প্রত্যাখ্যান করলেও কার্যকলাপে তাঁর অনুসরণ করতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইসলাম রাজনীতিতেও মিথ্যা ও ভণ্ডামিকে সব সময়ই পরিহার করে এসেছে। কিন্তু আজকের যুগের মানুষ এ মিথ্যা ও ভণ্ডামিকেই যুক্তিযুক্ত মনে করে কূটনীতির প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে এবং তার ব্যবহার সুকৌশলে করছে বিস্তৃত। শত্রু বা মিত্রের সাথে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার সাহায্যে সম্পর্ক স্থাপনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো ইসলামের প্রাথমিক বিজয়সমূহ। যাঁরা মুহাম্মদ (স)-এর বাণী প্রচার করেছিলেন—ইসলামের সেই প্রথম দিককার খলীফাদের জীবনী আলোচনা করলে দেখা যায়, তাঁদের আচরণ ও কার্যকলাপ সরলতা, সততা ও সত্যবাদিতার দৃষ্টান্তে পূর্ণ। তাঁরা, তাঁদের দূতগণ বা তাঁদের প্রতিনিধিরা যা লিখতেন, বলতেন ও ওয়াদা করতেন, তা সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ছিল। তাঁদের কথা ছিল স্পষ্ট, অলঙ্কারবিহীন এবং সরল। রসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, "যে ব্যক্তি ঝগড়া-বিবাদ করে না—যদিও তা যথার্থ হয়—যে ব্যক্তি মিথ্যা বলে না—এমন কি আকার-ইঙ্গিতেও এবং যে ব্যক্তির নৈতিক চরিত্র নির্মল, বেহেশতের উপকণ্ঠে, মাঝখানে এবং শীর্ষস্থানের এক বাড়িতে যথাক্রমে তারা সবাই আমার মেহমান হবে।"

আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করে এবং রসূলুল্লাহ্ (স)-এর আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে যে কেউ এ সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন যে, মিথ্যা ও ভণ্ডামি আল্লাহ্র প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করার চেয়েও খারাপ। কারণ আল্লাহ্ মিথ্যাবাদীকে অভিশাপ দিয়েছেন আর মুনাফিকদের জন্য সবচেয়ে জঘন্য দোযখে স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। প্রথম দৃষ্টিতে হয়ত কেউ এ কঠোর মনোভাব গ্রহণের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করতে পারবে না। কিন্তু ভণ্ডামির সুদূরপ্রসারী কুফল সম্পর্কে—ক্ষণিকের জন্যও কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন যে, বর্তমান বিশ্ব-দুর্নীতির এটাও একটা কারণ। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে বলা যায়, যে সমস্যা আজকের বিশ্বকে গ্রাস করে

www.nagorikpathagar.org

ফেলেছে তার প্রধান ও প্রাথমিক কারণ কি ভণ্ডামি নয় ? 'লীগ অব নেশন্স'-এর সংগঠকগণ যদি সততা ও বিশ্বস্ততার ওপর ভিত্তি করে এটাকে প্রতিষ্ঠা করতেন, তাহলে কি এর এমন পরিণতি হত ? এর ব্যর্থতাই কি সেই ব্যাপক দুর্নীতির কারণ নয়—যার প্রকাশ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রত্যক্ষ করা গেছে ? আজ যে জনকল্যাণ ও মানবাধিকারের পবিত্রতা সম্বন্ধে নীতিবাক্য প্রচার করা হচ্ছে তা যদি সরল, সত্য এবং প্রতারণামুক্ত হত, তাহলে কি 'জনকল্যাণ' ও 'অধিকার' শব্দের অর্থ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারত ? অথচ এ প্রশ্ন এখন এন্তার।

বস্তুত ভণ্ডামি আজ মানুষের শুভেচ্ছাকে পর্যন্ত সন্দেহের বস্তুতে পরিণত করেছে। তাই অধুনা কেউ যদি স্বাধীনতা, সমতা ও ন্যায়বিচারের কথা এবং স্থায়ী সুখ ও শান্তির কথা বলেন, তাহলে মানুষ তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে এবং চিন্তা করে যে, মিথ্যার আবরণে সত্যকে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা চলছে।

ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভণ্ডামি খুব বেশি ক্ষতিকর না হলেও কোনও রাষ্ট্র ও তার শাসকেরা যদি আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির হাতিয়ার হিসেবে ভণ্ডামির ব্যবহার চালু করে তাহলে তার কুফল অত্যন্ত ভয়াবহ না হয়ে পারে না। মিথ্যা, বিশ্বাসঘাতকতা ও ভণ্ডামির ওপর ভিত্তি করে প্রণীত সব রকমের নীতিকে মুহাম্মদ (স)-এর বাণী নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং আল্লাহ্র সব ধর্মেই এসব মিথ্যাচার প্রত্যাখ্যাত। কারণ তা সকল সংঘাতের কারণ ও সভ্যতা ধ্বংসের সহায়ক।

www.nagorikpathagar.org

অষ্টম অধ্যায়

সভ্যতার আধ্যাত্মিক রক্ষাকবচ

সভ্যতার যিম্মাদার

ইসলামী সভ্যতার ভিত্তি হলো নৈতিকতা ও অধ্যাত্মবাদ আর বস্তুবাদী সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে প্রয়োজনবাদ। এখন প্রশ্ন হলো, এ দু'য়ের মধ্যে কোন্‌টা সভ্যতার ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তারকারী হিসেবে অবদান রাখতে পারে। এ প্রশ্নের বিশদ আলোচনা করলে এমন কতক্‌গুলো বিষয় আবিষ্কৃত হবে, যেগুলো সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী এবং এমন কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে জানতে পারব যেগুলো বিশ্বের দুর্গতির কারণ।

হক বা 'অধিকার' কথাটা দিয়ে আমরা কি বুঝি—এর ওপর কার বিশেষ হাত রয়েছে—সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারীদের না ধর্মপ্রাণ লোকদের ? হাজার হাজার বছরের ইতিহাস আমাদের এ শিক্ষাই দেয় যে, সভ্যতা কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় আটকে থাকেনি বা এটা কারও একচেটিয়া সম্পদ নয়। বস্তুত সভ্যতা স্বর্ণের মত মূল্যবান বস্তুর সাথে তুলনীয়। স্বর্ণ যেমন হস্তান্তরিত হতে হতে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে আবার তার পূর্ব স্থানেই ফিরে আসতে পারে, সভ্যতার ব্যাপারটিও ঠিক সেই রকম।

সুতরাং সভ্যতা বিশেষ কোন জাতির সম্পদ নয়। এর থেকে তারাই উপকৃত হয়, যারা এটাকে রক্ষা করতে পারে। যখন কোন জাতি সভ্যতার দায়িত্ব বহন করতে অপারক হয়, তখন তারা একে এমন লোকের হাতে অর্পণ করে যারা সে সভ্যতাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন জাতিই সভ্যতার একক অধিকারী নয় বা এককভাবে কেউই সভ্যতাকে ধরে রাখার মত বিশেষ গুণে গুণান্বিত ছিল না।

নৃতত্ত্ব বিজ্ঞানে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অস্পষ্ট ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও এ বিজ্ঞান মানুষের দৈহিক পার্থক্যের কথা আলোচনা করেছে। কিন্তু মানুষের মন ও মানসিকতার কোন পার্থক্য আছে কিনা সে সম্পর্কে এ বিজ্ঞানে তেমন কিছুই বলা হয়নি। সহজাত ও আধ্যাত্মিক পার্থক্যের ভিত্তিতে আমরা যদি মানুষের শ্রেণীবিভাগ করতে চাই এবং এভাবে যদি আমরা আবিষ্কার করতে চাই যে, বিভিন্ন জাতির মধ্যে কোন্ জাতি সভ্যতা ও সংস্কৃতি বহন করতে সক্ষম, তাহলে আমাদের সত্যিকারের বিজ্ঞান ছেড়ে অনুমানের ওপর নির্ভর করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অবশ্য একথা সত্য যে, আধুনিক নৃতত্ত্ব জ্ঞানের সাহায্যে আমরা অন্তত একটা বিষয় পরিমাপ করতে সক্ষম হব যে, কোন্ বিশেষ মানব গোষ্ঠী অপর কোন্ মানব গোষ্ঠী অপেক্ষা বুদ্ধিমত্তার দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু এ জ্ঞানের সাহায্যে আমরা মানুষের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক চরিত্র এবং তাদের সহজাত আবেগ ও তার প্রকাশ সম্পর্কে জানতে পারব না। অন্য কথায় সভ্যতার বাণী বহন করতে সক্ষম কোন জাতির গুণাবলী নির্ধারণ করতে যে নৈতিক উৎকর্ষের প্রয়োজন তা অনুধাবন করতে নৃতত্ত্ব বিজ্ঞান আমাদের পরিচালিত করতে পারে। কিন্তু এটাই সব নয়। কেননা এ ভূমিকা পালন করার জন্য মানুষের আরো যে বহু সংখ্যক আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি প্রয়োজন এবং প্রয়োজন এ দুই শক্তির মধ্যে ভারসাম্যের সে কথাটাও এ সঙ্গে ভুললে চলবে না।

পৃথিবীর মানুষের মধ্যে যে জাতিগত পার্থক্য রয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে। ফিরাউনদের কথাই প্রথমে ধরা যাক। প্রাচীন মিসরবাসী যে সভ্যতা অর্জন করেছিল ; তার প্রকাশস্বরূপ এবং ফিরআউনদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার সাক্ষ্য হিসেবে তারা পিরামিড তৈরী করেছিল।

সভ্যতার বিকাশে মিসর সর্বপ্রথম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মিসরই মানুষকে কৃষি, প্রাসাদ নির্মাণ ও লিখতে শিখিয়েছিল। এর পরে আসে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, ফিনিশীয়, আসারীয়, চ্যালডানীয়, পারসিক, গ্রীক, কার্থেজিনীয়, চীনা, ভারতীয়, রোমান ও আরব সভ্যতা। এদের পরে আসে ইউরোপীয় জাতিসমূহ এবং সম্প্রতি আমেরিকার কথা। সভ্যতার অগ্রগতিতে এরা সবাই কিছু না কিছু অবদান রেখেছে।

আমরা যদি ধরে নিই যে, সভ্যতার উৎপত্তি হয়েছিল মিসর এবং বর্তমানে তার সর্বোচ্চ বস্তুগত প্রকাশ ঘটেছে আমেরিকায় এবং পীত জাতির ভাগ্য এবং বিশ্বের এ এলাকার ওপরে তাদের প্রভাবের কথা যদি আমরা ক্ষণিকের জন্য স্থগিত রাখি, তাহলে আমরা পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা, ইউরোপ ও আমেরিকার এলাকাসমূহকে আলোচ্য সভ্যতার আওতাভুক্ত দেখতে পাই। এ বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদগণ একমত যে, ককেশীয় জাতি তিন ভাগে বিভক্ত। এ তিন ভাগের শারীরিক গঠনেও আবার যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে এবং তাদের আবাসভূমি পূর্ব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল। একেবারে উত্তরে আছে 'নরডিকরা' (Nordics), তাদের দক্ষিণে আছে 'আলপাইনরা' (Alpines) এবং এদের দক্ষিণে আছে ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীরা (Mediterraneans)। নরডিকরা লম্বা। তাদের চোখ নীল ও মাথা লম্বাটে। আলপাইনদের মাথা গোলাকার এবং ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের মাথা লম্বাটে, চোখ ও চুল কালো। কিন্তু দৈহিক গড়নে নরডিকদের চেয়ে খাটো।

www.nagorikpathagar.org

তবে, শারীরিক গঠনের পার্থক্যের ওপর কালক্ষেপ করা বা এসব জাতির অতীত ও বর্তমান নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই। কারণ এর থেকে আমরা প্রাচীন সভ্যতা গঠনের কোন উপকরণ খুঁজে পাচ্ছিনে। আমাদের হাতে এমন কোন মাপকাঠি নেই, যার সাহায্যে আমরা বলতে পারি, আরবদের আগে কারা সভ্যতার মশাল বহন করে এনেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাহায্যে ককেশীয় জাতির যে তিনটে শারীরিক গঠনমূলক পার্থক্য নির্ধারণ করা হয়েছে, সেখানেও দেখা যায় যে, কোন জাতিই বিশেষ উপাদানের জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত নয়। বিচ্ছিন্ন বৃটেনেও উপরিউক্ত তিনটে জাতির সংমিশ্রণ দেখা যায়। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জে আলপাইনদের চেয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের সংখ্যাই তুলনামূলকভাবে বেশি। এর থেকে আমরা যে জিনিসটা পাই তা হলো, একটা জাতির মধ্যে কোন গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য থাকে।

সঠিকভাবে শারীরিক গঠনের পার্থক্য নির্ধারণ করতে সক্ষম হলেও আমরা তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি ও কোন নির্দিষ্ট জনগণের ওপর সে শক্তির প্রভাব নির্ধারণ করতে সক্ষম হই না। বিভিন্ন জাতির রক্তের সংমিশ্রণের উপজাত ফল হিসেবে ধরে নিলেও আমরা এ শক্তির প্রভাব সম্পর্কে বেশি কিছু জানতে পারি না। ফলে, ন্যায়সঙ্গতভাবেই আমরা প্রশ্ন করতে পারি, এ সভ্যতা কাদের ? আমরা কি বলতে পারি, এটা বিশেষ একটা জাতির এবং অন্যদের এতে কোন অংশ নেই ?

ফিরাউন আমলের মিসরীয়দের মত প্রাচীন জাতিসমূহ কি বর্তমান কালের মত বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে গঠিত ছিল না, যেখানে ভূমধ্যসাগরীয় অধিবাসীদের প্রাধান্য বেশি ছিল ? কোটি কোটি বছরের অজানা ইতিহাসের সাথে কি মানব সভ্যতার কয়েক হাজার বছরের জানা ইতিহাসের তুলনা করা যায় ?

উপরোক্ত তিনটি জাতির মধ্যকার কোন এক বিশেষ জাতিই প্রাচীন সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে পশ্চিম বিশ্বে বিরাজমান ছিল, নাকি তারা ছিল উক্ত তিন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত কোন এক বিশেষ জাতি? একটা বিষয় আমরা কোন অবস্থাতেই এড়িয়ে যেতে পারি না। তা হলো, সভ্যতা কোন এক বিশেষ গোষ্ঠীর বা জাতির একচেটিয়া সম্পদ নয়, কোন এক জাতি এটাকে লালন করে নাই বা এ সভ্যতা কোন এক বিশেষ জাতির ছাপ বহন করে না। সভ্যতা কোন প্রাকৃতিক বংশানুক্রমিক শক্তিরও সৃষ্টি নয় বা এটা কোন অধিকৃত সম্পদ নয় বা এ সভ্যতার ওপরে শারীরিক বলে বলীয়ান কোন শক্তিশালী জাতির মৌরসী মোকাররী স্বত্বও নেই।

আধ্যাত্মিক অবস্থার উপজাত ফল হলো সভ্যতা—বস্তুবাদী সংস্কৃতি এর প্রশাখা মাত্র। দুইজন মানুষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়, কিন্তু তেমন কোন দৈহিক পার্থক্যের উপাদান আধ্যাত্মিক অবস্থার সাথে সাধারণত যুক্ত থাকে না। আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ হিসেবে কতিপয় দৈহিক উপাদান সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করার

www.nagorikpathagar.org

যতই আমরা চেষ্টা করি না কেন, সে রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব নয়। কারণ এ আমরা পাল্টাতে পারব না যে মানব ইতিহাসে বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞান ও মৌলিকত্বের কোন জাতির কখনও একচেটিয়া অধিকার ছিল না। একমাত্র আত্মিক আে মানুষের জীবনের অন্ধকার বিদূরিত করতে পারে—অবশ্য তার জন্য যদি ক্ষেত্র করা হয়। এ আত্মিক ও নৈতিক চরিত্রই বস্তুত সভ্যতার রক্ষাকবচ—জড়বাদী শক্তি নয়। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন কত চমৎকারভাবেই না ঘোষণা করে "একথা সত্য সুনিশ্চিত যে আল্লাহ্ কোনও কওমের অবস্থার পরিবর্তন করে যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অন্তরের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়–।"[১]

দৈহিক অবস্থা যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করা যায়, তেমনি আধ উপাদানও লাভ করা যায় বলে যদি আমরা ধরে নিই, তবু এ ব্যাপারে সন্দেহ যে, অন্যান্য দুর্বোধ্য প্রভাব আধ্যাত্মিক শক্তিকে গঠন ও লালন করে এবং দৃঢ় ি ও নৈতিকতার সভ্যতার সূত্রপাত ঘটায় ও তাকে রক্ষা করে।

আত্মার প্রকৃতি ও গভীরতা সম্পর্কে আমরা অজ্ঞ, যেমন আমরা অজ্ঞ আধ্য কার্যাবলীর কারণ ও ফল এবং সূত্র ও তার প্রভাব সম্পর্কে। ফলে, মানুষের ৈ পার্থক্য নির্দেশ করার মত আমরা বিভিন্ন জাতির আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যের প নির্দেশে বৈজ্ঞানিক ধারা প্রয়োগ করতে পারি না। অতীত ও বর্তমান ইতিহাস করে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জাতির মানুষ অর্জন ও নৈতিক আচরণে সমান আগ্রহী এবং সাধারণভাবে তারা সূত্র বা ' নির্বিশেষে একটা সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রহণ করতে পারে।

কোন বিশেষ এলাকার আবহাওয়া ও অন্যান্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ক সীমিত পার্থক্য আমরা যদি উপেক্ষা করি, তাহলে আমরা সকল মানুষের ' সমতার কথা নির্বিঘ্নে মেনে নিতে পারি। অবশ্য এর বিপক্ষে আর কিছু আছে তা আমাদের জানা নেই। যুগে যুগে জ্ঞান ও প্রথম পদক্ষেপ, অজ্ঞতা ও দুর্নীতির মানুষের ভাল বা মন্দ প্রবৃত্তির ওপর সমানভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। বিভিন্ন ত মধ্যে বসবাস করার ফলেই মানুষের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়েছে বলে যদি ' ধরে নিই, তাহলে আমরা সে সবকে একটা সাধারণ আত্মিক শক্তির লক্ষণ বে করতে পারি। অন্য কথায় বলা যায়, সকল মানুষের মানসিক সম্পদ সমান।

এ মতবাদ নাকচ করতে এটা বলাই যথেষ্ট যে কিছু কিছু দৈহিক, গো বৈশিষ্ট্য আপনা হতেই আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে রূপান্তরিত হয়, যার ফলে একটা অপর জাতির ওপর স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে। আমরা যথার্থই বলে দৈহিক বা আধ্যাত্মিক বৈশিষ্ট্যে এমন কোন পার্থক্যের ইঙ্গিত নেই যাতে সভ্যতা গোষ্ঠীর একাংশের একচেটিয়া অধিকারে থাকতে পারে বা তা ইসলামী শ

www.nagorikpathagar.org

নির্ধারিত দায়িত্ব সার্বিকভাবে গ্রহণ করতে সে গোষ্ঠীকে বাধা দিতে পারে। এটা যখন স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে, তখন গোষ্ঠীগত মতবাদ ধসে পড়বে, যেমন ধসে পড়বে সভ্যতার ক্ষেত্রে শক্তির বদলে শক্তি প্রয়োগের মতবাদ। অবশ্য যদি প্রমাণ করা যায় যে, প্রকৃতি বিশেষ কতিপয় লোককে জ্ঞানার্জন ও উন্নতি লাভ করার জন্য বেছে নিয়েছে, তখন তাদের অনুকরণ করার জন্য তারা অন্যকে বাধ্য করতে পারবে এবং কেবল তখনই এ বাধ্যবাধকতা ন্যায়সঙ্গত হবে।

একশ্রেণীর লোকের ওপর অপর শ্রেণীর প্রভাব সব সময় জ্ঞান-বিজ্ঞান বা অভিজ্ঞতার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করতে পারে না। তদুপরি, জাতিসমূহের আচরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সাময়িকভাবে পরাস্ত শক্তি বিজয়ী শক্তির জ্ঞান অভিজ্ঞতার সাহায্যে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করে। শাসক গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হওয়ার এ আকাঙ্ক্ষা কোন গোত্রেরই সহজাত নয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পরাজিত জাতি অনেক ক্ষেত্রে বিজয়ী জাতির কাছ থেকে লাভবান হয় না। অপরপক্ষে, বশবর্তিতার ফলে তারা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে।

বলা যায়, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতি অনুযায়ী এক জাতির ওপর অপর জাতির অগ্রাধিকার কোন প্রাকৃতিক কারণে ঘটে না এবং স্বেচ্ছাচারীকে স্বেচ্ছাচারের অনুমতি দেয়া হয় শুধু দুর্বলের অধিকারকে খর্ব করার জন্য। ইসলামী শরীয়ত এ নীতিকে তীব্রভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে। শরীয়ত আইন-সম্মতভাবে সকলের জন্য সমান অধিকার স্বীকার করে, ধার্মিক ও দয়ালু লোককে বিশ্বাস করে এবং ঘোষণা করে যে, সব লোক মিলেই গঠিত হয় একটা পরিবার এবং এর মধ্যে সবচেয়ে দয়ালু ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করতে পারে।

রসূলুল্লাহ্ (স) ঘোষণা করেছেন, "একজন অনারবের ওপরে একজন আরবের কোন অগ্রাধিকার নেই একমাত্র আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ও আল্লাহ্ তাকে জনকল্যাণ ও শান্তির জন্য যে ভালবাসা দিয়েছেন, তা ছাড়া।" দৈহিকভাবে শক্তিশালী বা উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া বেশি ধন-সম্পত্তির অধিকারী বা সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তিই সর্বোত্তম উন্নত চরিত্রের অধিকারী নয় বরং আধ্যাত্মিক দিক থেকে দয়ালু ব্যক্তিই উন্নত চরিত্রের অধিকারী। কারণ সদয় আত্মা আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যে উজ্জ্বল যা তাকে খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং ভাল কাজের তাকিদ দেয়।

সভ্যতার সংরক্ষণ ও স্থায়ীকরণ

ইসলামী সভ্যতার রক্ষাকবচ হলো আধ্যাত্মিকতা এবং সহৃদয় ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরাই সভ্যতার অভিভাবক। আমি আগেই বলেছি যে, সব মানুষই সমান। মানুষের মননশক্তি ও আবেগের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে মানবীয় বিজ্ঞান

www.nagorikpathagar.org

ব্যর্থ হয়েছে এবং মানুষের বাহ্যিক পার্থক্যের জন্য এক জাতি অপর জাতি থেকে অধিক সভ্য বা সভ্যতা গঠনে পারদর্শী নয় বা বিশেষ কোন জনগোষ্ঠী সভ্যতার একচেটিয়া অধিকারী নয়।

মানবেতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সভ্যতা একটা মশালের মত, যা যুগে যুগে এক জাতির হাত থেকে অন্য জাতির কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। আরও দেখা গেছে, কোন জাতি হয়ত এক সময় সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করেছে এবং পরবর্তীকালে তাদের গৌরব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে।

আমরা যদি একটার পর একটা জাতির গত পাঁচ হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করি তাহলে দেখব যে, প্রত্যেকটা জাতির ক্ষেত্রে একটা নিয়ম অপরিবর্তনীয় রয়েছে। এ নিয়মটি হলো—জাতির উত্থান ও পতন। একটা পাথর ওপরের দিকে নিক্ষেপ করলে একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত সে ওপরের দিকে উঠতে থাকে এবং তারপর সোজা মাটিতে পড়ে যায়। একটা পাথরের উত্থান-পতনের সাথে একটা জাতির উত্থান-পতনের তুলনা করা যায়। ক্রমোন্নতির দিকে ধাবিত জাতি ও পতনোন্মুখ জাতির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য দেখা যায়। অনেক জাতি তাদের উত্তরাধিকারীদের এমন অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে যে, তারা অতীত গৌরব সম্পর্কে এমন উদাসীন, যেন তাদের ও তাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে কোন বন্ধন নেই।

জাতিসমূহের উত্থান-পতনের কারণসমূহ আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি ? ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় যারা বিশ্বাসী তারা জাতির উত্থান-পতনের কারণ অর্থনৈতিক বলে ধারণা করেন। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ; "মানব জাতির মধ্যে কালের পরিবর্তন আমিই করে থাকি ...।"[২] ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যায় যারা বিশ্বাসী, তাদের মতে বস্তুগত কারণেই কোন জাতির উত্থান-পতন ঘটে। যেমন, প্রাকৃতিক কারণে যথা—বৃষ্টি, আবহাওয়া ইত্যাদির জন্য ভূমির পরিবর্তন, নতুন পথ আবিষ্কার, কোন যন্ত্রের আবিষ্কার, খনির উৎপাদন বৃদ্ধি বা এ ধরনের উন্নতি যা জীবনের বস্তুগত উপাদান বৃদ্ধি করে। তাঁরা আরো দাবি করেন যে, এসব উপাদানই জাতিকে সভ্য করে ও জাতীয় উন্নয়নে সাহায্য করে। আর অর্থনৈতিক অবনতির সাথে সে জাতিরও পতন ঘটে।

আর এক দলের মতে, কোন জাতির শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যের ওপর এবং সে শক্তি তারা উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়ে থাকে। একই ধরনের ঐতিহ্যপূর্ণ শ্রেষ্ঠ জাতির সংমিশ্রণে এ শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং জাতিসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির সংমিশ্রণে তাদের এ শক্তি আরও বৃদ্ধি পায় এবং জাতিসমূহের মধ্যে তারা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে চিহ্নিত হয় এবং এভাবে তারা জ্ঞানের ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোগ করে।

www.nagorikpathagar.org

কিন্তু এসব ধারণা জাতির উত্থান-পতনের রহস্য উদ্ঘাটনে অপ্রতুল। কোন জাতির উত্থান-পতন, তাদের সভ্যতার উন্নতি অবনতি অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াই ঘটেছে। প্রাচীন মিসর ও ব্যাবিলনীয়রা সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করেছিল, ধূসর মরুভূমিকে তারা শস্যভাণ্ডারে রূপান্তরিত করেছিল। মরুভূমি তাদেরকে সভ্য করেনি। আগাগোড়া সে দেশ উর্বর থাকা সত্ত্বেও তাদের উত্থান-পতন ঘটেছে।

উপদ্বীপ থেকে আরবদের বহির্গমন ও সম্প্রসারণ, তাদের দ্বারা প্রাচীন ও বর্তমান সভ্যতার যোগসূত্র স্থাপন এবং বিজ্ঞান ও শিল্পের উন্নতি সাধন অর্থনৈতিক কারণের জন্য হয়নি। এমনকি আরব, রোমান, মিসর ও ব্যাবিলনীয়দের পতন, অনুর্বর ভূমি, পরিবর্তিত জলবায়ু বা নতুন রাস্তা ও নতুন দেশ আবিষ্কারের জন্য হয়নি।

প্রায়ই দেখা গেছে, আর্থিক সংকটই জাতিসমূহের উন্নতির কারণ হয়েছে। প্রয়োজনের তাকিদে তারা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছে এবং অসম্ভবকে সম্ভব করেছে এবং এভাবেই তারা বিশ্বে শক্তিশালী সভ্যতার সৃষ্টি করেছে। উদাহরণস্বরূপ গ্রীক, আরব ও ফিনিশীয়দের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ আমেরিকা ও মধ্য আফ্রিকা হাজার হাজার বছর ধরে কোন সভ্যতাই গড়ে তুলতে পারেনি। আমেরিকার সভ্যতা গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত উত্তরাধিকারীদের দ্বারাই।

আরও বলা যেতে পারে যে, কোন জনগোষ্ঠীর অখণ্ড কৌলীন্য তথা অন্য জাতির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকাই তাদের অধঃপতনের কারণ বলে কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই—এর উল্টো দিকটাই বরং ঠিক বলে মনে হতে পারে। বলা হয়ে থাকে যে, বিদেশী লোকের আকস্মিক আক্রমণের ফলেই প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটে। আরবদের পূর্বপুরষরা নীল নদ উপত্যকার অধিবাসীদের সাথে মিশে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা গড়ে তোলে এবং তারাই পিরামিড নির্মাণ করে। একথা সব সময় ঠিক নয় যে, কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর ক্রমাগত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির জন্য নতুন বল সঞ্চার করা একটা পূর্বশর্ত।

সংক্ষেপে বলা যায়, সভ্যতার বিকাশ ও বিলোপ সাধনে অর্থনৈতিক ও নৃতাত্ত্বিক মতবাদের কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা নেই। উভয় মতবাদই বিষয়টার কোন একটা বিশেষ দিকের প্রতি আলোকপাত করতে পারে মাত্র, সব দিকের প্রতি তা সমভাবে আলোকপাত করতে পারে না।

এ সম্বন্ধে আমরা যদি কোন সুনির্দিষ্ট সমাধানে পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, সভ্যতার বিকাশ ও বিলোপ সাধনে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক কারণসমূহের অবদান সবচেয়ে বেশি, আর নৈতিক গুণগুলোই মানুষের সভ্যতার নির্ধারিত উপাদান। এর সমর্থনে পবিত্র কুরআনে অসংখ্য আয়াত রয়েছে ঃ

www.nagorikpathagar.org

"একথা সত্য সুনিশ্চিত যে, আল্লাহ্ কোনও কওমের অবস্থার পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়।"৩

"ঠিক যেমন ফিরাউনের দল এবং তাদের আগেও যারা আমার আয়াতসমূহ মিথ্যা সাব্যস্ত করতে চেয়েছিল—তাদের আল্লাহ্ পাকড়াও করলেন, তাদেরই অপরাধের কারণে—আল্লাহ্ বড়ই কঠোর সাজা দানকারী।"৪

"কারণ আল্লাহ্ কোনও কওমকে একবার যে নিয়ামত দান করেছেন, তা নিজে পাল্টাতে চান না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তা পরিবর্তন করে।"৫

"যদি সেই জনপদের বাসিন্দারা ঈমান আনত, পরহিযগার হত, তাহলে আমি অবশ্যই তাদের জন্য আসমান-যমীনের ভাণ্ডার-দ্বার খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যাই জানল। তাই ত আমি ওদের কাজকর্মের জন্য পাকড়াও করলাম।"৬

"আমি যবুর কিতাবে উপদেশ বর্ণনার পরে লিখে দিয়েছিলাম ঃ "পৃথিবীর ওপরে আমারই নেক বান্দাদের উত্তরাধিকার কায়েম হবে।"৭

"আল্লাহ্ পাক ওয়াদা করেছেন তাদের সাথে—তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছ, আর নেক কাজ করেছ—পরে তাদের আমি অবশ্যই দুনিয়ার বুকে আধিপত্য করার সুযোগ দান করব—যেমন তাদের পূর্বেকার লোকদের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি দান করেছিলাম। আর তাদের জন্য—তাদেরই জীবন ব্যবস্থাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেব—যা তাদের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।"৮

"আল্লাহ্ একটি জনপদের উদাহরণ উল্লেখ করেছেন, যা সুখ-শান্তিতে সমৃদ্ধ ছিল। চারদিক থেকে রুজী-রোজগার সেখানে আসত। কিন্তু সেখানকার লোকজন আল্লাহ্ তা'আলার দান নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হলো। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কাজকর্মের দরুন তাদের ভয় ও ক্ষুধার পোশাক পরিয়ে দিলেন।"৯

"কত বেশুমার জনপদ আমি পিষে ফেলেছি—যারা জালিম, গুনাহ্গার ছিল। আর তাদের পরে আবার অন্য সম্প্রদায়কে দাঁড় করিয়ে দিয়েছি। তারপরে যখন তারা টের পেল ঃ আমার আযাব এই এসে পড়েছে, তখন তারা সেখান থেকে পালাতে শুরু করল। না, তোমরা মোটেই পালাতে পারবে না—বরং সেখানেই ফিরে যাও, যেখানে বসে তোমরা আমোদ-ফুর্তি করছিলে—আর তোমাদের বাড়ি-ঘরে। হয়ত কেউ তোমাদের খোঁজ-খবর নেবে। তারা বলল ঃ হায় পোড়া কপাল আমাদের ! আমরা ত জুলুমবাজী করেছি। তারপরে তারা বারবার ফরিয়াদ করতে থাকল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের কাটা ফসলের মত স্তূপ করে ফেললাম। আর আগুন নিভে গেল।"১০

দৃঢ় বিশ্বাস, উন্নত সংস্কৃতি ও যোগ্য পেশা ছাড়া কোন জাতিই পৃথিবীতে জ্ঞান ও সভ্যতার বাণী নিয়ে এগিয়ে আসেনি। অতীতে যে সব জাতি ধ্বংস হয়ে গেছে, তাদের পদাংক অনুসরণ না করলে কোন জাতিরই বিশ্বাস, নৈতিক আচরণ এবং

www.nagorikpathagar.org

অস্তিত্ব বিলোপ হয় না। দৃঢ় বিশ্বাস, পবিত্র নৈতিক চরিত্র ও ন্যায়পরতার আইনকে ক্ষেপণাস্ত্রের জ্বালানির সাথে তুলনা করা যেতে পারে বা সেই জাতিকে বিশ্বাস ও সততা অনুপাতে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

মানুষের সাধারণ সংস্কৃতি ও প্রথাকে যদি নৈতিক বল হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তাহলে সেগুলোই একটা জাতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এসব গুণের অবনতি ঘটলে একটা সভ্য জাতি কিছু দিন স্থিতিশীল অবস্থায় থাকার পর বিলুপ্ত হয়ে যায় নিষ্প্রাণ সমাজের মত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কোন জাতির আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ওপর যদি বস্তুবাদ প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং বস্তুবাদের নিরিখেই যদি জীবন পরিচালিত হয় তাহলে সেই জাতির অধঃপতন ঘটে। অন্য কথায় বলা যায়, ভোগ-বিলাস ও লালসার আকাঙ্ক্ষা আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষার স্থান দখল করলেই ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় তথা উন্নতি ও অবনতির মধ্যে চিহ্নিত রেখা হলো আরাম-আয়েশের আকাঙ্ক্ষা।

অনেকে মনে করেন, জড়বাদী শক্তির ভ্রান্তি দূর করে দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ উন্নতির চরম শিখরে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সম্পদ, জ্ঞান, উড়োজাহাজ, ট্যাংক বা কামান বা জড়বাদী জীবনের আওতায় অন্য কোন যন্ত্রপাতি সভ্যতার পতন ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। যে জাতির বিশ্বাস শিথিল হয়ে পড়েছে, আচার-আচরণ বিপথে পরিচালিত হচ্ছে বা আইন-কানুন বিকৃত হয়ে পড়েছে, সেই জাতির ধ্বংস ঠেকানো যায় না।

বিদ্বান ব্যক্তিগণ মনে করেন না যে, পার্থিব উন্নতির জন্য তীক্ষ্ণ মানসিক শক্তির প্রয়োজন আছে। মানুষের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও মেধা ছাড়াই একটা জাতির অগ্রগতি কিছুকাল অব্যাহত থাকতে পারে—আল্লাহ্‌র বিচার না নেমে আসা পর্যন্ত। ভোগ-বিলাসীদের বিচার ও সভ্যতা পতনের ভার আল্লাহ্‌র হাতেই রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, "দুনিয়ার বুক তাতে সুন্দর শ্যামলিমায় সুশোভিত হয়ে উঠল আর দুনিয়ার বাসিন্দারা ভাবতে লাগল ঃ তারাই ত এসবের মালিক। এসবের ওপরে তাদেরই কর্তৃত্ব রয়েছে। কিন্তু আমার নির্দেশ যখন দিনে কিংবা রাতে পৌঁছাল তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হলো যে, সে জায়গা দেখে কেউ বলতে পারবে না, গতকালও এখানে কিছু ছিল।"[১১]

এখানে রাতে অথবা দিনে আদেশ পাঠানোর অর্থ আকস্মিকতা। কারণ, কিভাবে একটা সভ্যতা ধ্বংস ও সভ্যতার অধিকারীদের পতন হয়, তা যেন কোন বাহ্যিক উপকরণ দ্বারা প্রমাণিত না হয় এবং ব্যাপারটা বুঝে উঠা যেন তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, যেমন বোঝা যায় না মন ও আত্মার শক্তিকে। আত্মা ও মনের শক্তিই সভ্যতার উত্থান ও পতনের মৌলিক কারণ।

www.nagorikpathagar.org

একটা সভ্যতা ধ্বংসের কারণ, তার পরিণতি এবং কত দ্রুত তা ধ্বংস হলো, তা নির্ণয় করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। এর জন্য আমরা দুটো কারণ নির্দেশ করতে পারি, যা সকলেই মেনে নিতে পারেন। এ কারণ দুটো হল—আরামপ্রিয় জীবন ও বিশ্বাসহীনতা।

একটা জাতির জন্য একবার যদি একটা আধ্যাত্মিক ভিত্তি ও পবিত্র আবাসভূমি প্রস্তুত করা যায় তাহলে তা উত্তরোত্তর জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় ও উন্নতির পথে ধাবিত হয়। বিশ্বাস ও নৈতিক আচরণ তাদেরকে যেমন ঐক্যবদ্ধ করে বলে সবকিছু নিয়মমত চলতে থাকে, তেমনি সেই বিশ্বাস ও নীতি বিপথে পরিচালিত হওয়া থেকেও তাদের বিরত এবং দ্বিধা ও হতাশা থেকে মুক্ত রাখে। হয়ত কোন জাতি তাদের নাগালের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর জিনিস নিয়ে জীবন উপভোগ করত। সুন্দর জিনিস নিয়ে মত্ত থাকাকালে সে জাতি যদি আরাম-আয়েশে গা ভাসিয়ে দিতে শুরু করে এবং অন্য জাতির সাথে ভোগ-বিলাসের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে থাকে, তখন সত্যের বাণী তার কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে পড়ে। এর কারণ তাঁর ধৈর্যহীনতা ও পার্থিব জিনিসের প্রতি লোভ। পরবর্তী পর্যায়ে সে জাতি তাদের সভ্যতার গোড়ার কথা ভুলে যায়, তাদের নৈতিক উত্তরাধিকারের প্রত্যেকটা দিক সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলে এবং সত্যের দিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। যে ঐতিহ্য এতদিন তাদের বেঁধে রেখেছিল তা হারিয়ে যায়, যে শক্তি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছিল, তা ধসে পড়ে। তখনই দেখা দেয় বন্ধ্যাত্বের খেলা। শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে দেখা দেয় বিস্তর হাঙ্গামা। আল্লাহ্ তখন অন্য এক জাতিকে সভ্যতার সংরক্ষণকারী নিযুক্ত করেন, নবী করীম (স)-এর ভাষায়—যাদের 'পেট খালি' এবং যারা সত্যকে ভালবাসে, জড়বাদীরা যেমন ভালবাসে তাদের বিলাসপূর্ণ জীবনকে।

বিলাসী জীবন ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ। প্রথম দিকে যখন সহজ-সরল ভাবে সত্যের বাণী কোন জাতির নিকট প্রচারিত হয়, তখন তারা এর প্রতি অনুগত হয় বা বুঝতে পারে। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে তাদের উত্তরাধিকারীদের কাছে দায়িত্বের বোঝা বেড়ে যায়, এবং তখন সত্যকে অনুধাবন করতে বেশি চেষ্টা, স্বচ্ছ দৃষ্টি ও অবিরত সতর্ক থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অশ্বারোহী সৈন্যদলের বিজয়ী সেনাপতি যে সভ্যতার পত্তন ঘটাল—কয়েক যুগ পরে সেই সাম্রাজ্যে এলো পরিবর্তন। প্রয়োজন হলো অন্য এক সেনাপতির, তিনি তাঁর পদ্ধতিতে গড়ে তুললেন অন্য এক সাম্রাজ্য। শুরু হলো নতুন এক সভ্যতা। এভাবেই সময়ের বিবর্তনে আজ হয়ত নতুন কোন প্রতিষ্ঠানে কোন ম্যানেজার হাজার হাজার শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং কোন সাম্রাজ্যে ব্যাংকের পরিচালককে বিলিয়ন বিলিয়ন মুদ্রা দেখাশোনা করতে হচ্ছে।

www.nagorikpathagar.org

এ পরিস্থিতিতে সভ্যতার ধারক-বাহকদের একনিষ্ঠ হৃদয়, পবিত্র মন ও দৈহিক স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। কারণ তাদের বোঝা অনেক বেড়ে গেছে। ইত্যবসরে ভোগ-বিলাসের জীবন শুরু হওয়ায় জ্ঞানী মানুষেরা সমাজে অপাংক্তেয় হয়ে পড়বেন। আর আনন্দজনক বস্তুর শেষ পরিণতি হবে অনিবার্য। কারণ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন, "আল্লাহ্ তা'আলা কোনও লোকের বুকে দুটো হৃৎপিণ্ড তৈরী করেন নি।"[১২] এভাবেই নতুন যুগের মানুষ তাদের পূর্ব-পুরুষদের সংস্কৃতি বহন করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে, ধসে পড়ে, তারা আত্মাকে বঞ্চিত করে এবং নিজেদেরই বক্র পথের শিকারে তারা পরিণত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার সময় হয়ত তাদের পূর্ব-পুরুষরাই সততা, ধর্মনিষ্ঠা ও শিষ্টাচারমূলক কাজের জন্য শহীদ হয়েছেন, সে সময়ে তাঁরা সন্তুষ্টির সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন। উত্তরাধিকারীদের উচিত ছিল, তাদের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করা এবং তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা। কিন্তু জড়বাদ ভাবধারায় এরা বস্তুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পূর্ব-পুরষদের সাধনা ভুলে যায়।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ধর্মীয় বিশ্বাসই সভ্যতা গঠনের প্রাথমিক শক্তি। ধর্মীয় বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার পর সভ্যতার পতন ঘটে। তদুপরি ধর্মীয় বিশ্বাস উন্নতির সহায়ক এবং তা ন্যায়পরায়ণতায়, আইন প্রণয়নে ও দৈহিক আচরণে শক্তি যোগায়। সব শক্তিই সভ্যতাকে গড়ে তোলে এবং সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে দেয়। মানুষের আত্মা সম্পদ লাভে, সফলতায় এবং পৃথিবীর উত্তম বস্তু লাভ করে আনন্দিত হয় বলেই এসব বিষয়ে আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে। এসব বস্তুর পর্যাপ্ত প্রাপ্তি যদি মানুষের মনকে আল্লাহ্ থেকে ভুলিয়ে রাখে, তাহলে আল্লাহ্র নির্দেশ তাদের মধ্যে কার্যকর হয় না। ফলে সে ধরনের মানুষের প্রচেষ্টা পাপের পথে পরিচালিত হয় এবং পূর্বের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির ভাগ্যও যে পথে পরিচালিত হয়েছিল, সেই পথেই সে পরিচালিত হয়।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকের পৃথিবীতে আল্লাহ্র এই বিচারের ব্যাপারেও সন্দেহ উত্থাপিত হতে দেখা যাচ্ছে। মুসলমান, খৃস্টান ও য়াহূদীদের মধ্যে ধর্মপরায়ণতার তেমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, যদিও মুসলমানদের প্রতিক্রিয়াশীল এবং খৃস্টান ও য়াহূদীদের প্রগতিশীল বলে গণ্য করা হয়। তাদের বিশ্বাস যেন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে দয়া যেন বিদায় নিয়েছে। মানুষ আজ পার্থিব বস্তুর মোহে ব্যস্ত এবং সর্বত্রই অকৃতজ্ঞতার ছাপ বিদ্যমান। আল্লাহ্র ওয়াদা কি নিকটবর্তী ? আমরা প্রার্থনা করি, আল্লাহ্ হেন সভ্যতার হেফাজত তাদের হাতে ছেড়ে দেন যাদের 'পেট খালি'। কারণ তারা সত্যকে ভালবাসে, যেমন সভ্যতার দাবিদাররা ভালবাসে ধন-দৌলতকে। এসব লোকই সভ্যতার উত্তরাধিকারী

www.nagorikpathagar.org

হবে, তারা এর সাথে আরও জ্ঞান যোগ করবে এবং সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে আরও উন্নত হবে এবং এ পৃথিবীতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিশ্বাসকে করবে পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

অনুসন্ধিৎসু মাত্রই মুহাম্মদ (স)-এর বাণীতে তা-ই পাবেন, যা অগ্রদূতগণ পেয়েছিলেন এবং অগ্রদূতগণ এ বাণীর মধ্যে আধ্যাত্মিকতা, জ্ঞান, আল্লাহ্ ভক্তি ও সৎ পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। সত্যিই, আজও এ বাণীর মধ্যে সেই পথের সন্ধান বিদ্যমান, যে সম্বন্ধে এক সময় উপহাস করে বলা হত ঃ "আমরা যদি তোমার সাথে সঠিক পথে চলতে থাকি তাহলে আমাদের বাস্তুভিটা থেকে উৎখাত করা হবে ...।"[১৩] কিন্তু কুরায়শরা যখন মুহাম্মদ (স)-এর পথ অনুসরণ করেছিলেন, তখন তাদের স্বদেশভূমি থেকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল—দাসোচিত জীবন যাপন করার জন্য নয়—পৃথিবীতে সম্মান ও গৌরব অর্জন করার জন্য।

নতুন বিশ্ব-বিধান

উপরোক্ত পটভূমিকায় ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতি নির্বিশেষে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য একটা উপযুক্ত বিধান বা পদ্ধতি আবিষ্কারের ব্যাপারে আমরা আমাদের সকল প্রয়াস নিয়োগ করতে পারি। এ কাজ করতে গিয়ে আমাদের বিশ্বের যাবতীয় একগুঁয়েমি সিদ্ধান্ত পরিহার করতে হবে এবং যাবতীয় মতবাদের ব্যাপারে পক্ষপাতহীন হতে হবে। এ প্রচেষ্টায় আমরা যদি সফল হই, তবে তা হবে সকলের জন্যই কল্যাণকর। আর যদি ব্যর্থ হই, তাহলেও আশা করতে পারি যে, সত্য ও ন্যায় পথ আবিষ্কারের ব্যাপারে আমাদের এ প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে হয়ত আর কোন দলকে অনুপ্রাণিত করবে।

যে সব মতবাদ কিছু দিন আগেও বাস্তব বলে মনে করা হত, কিন্তু সামাজিক বিবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতির ফলে সেগুলো আজ সভ্যতার পক্ষে ক্ষতিকর বিবেচিত হচ্ছে, সেই সব মতবাদ আমাদের অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবী আজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছে এবং এ ধরনের সঙ্কট আগে আর দেখা যায়নি। ইতিহাসের জ্ঞান থেকে আমরা বলতে পারি, গত এক যুগে যে সমস্ত ঘটনা আধুনিক পৃথিবীকে আতঙ্কগ্রস্ত করেছে, সেই ধরনের ঘটনা আগে আর ঘটেনি। তাতার আক্রমণকে এখনও পৃথিবীর একটা জঘন্যতম দুর্যোগ বলে মনে করা হয়। কিন্তু বর্তমানের বিমান হামলায় যে ব্যাপক নরহত্যা ও ধ্বংসলীলা সাধিত হয়, তার সাথে তাতারদের আক্রমণের কোন তুলনাই হয় না। আধুনিক জ্ঞানের অপব্যবহারের ফলেই এভাবে মানুষকে ধ্বংস করা সম্ভব হচ্ছে। সেজন্য বিশ্বকে নিশ্চিত পতন ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য আমাদের অবশ্যই একটা নতুন উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

এ নতুন পদ্ধতির প্রকৃতি কেমন হবে ? পৃথিবীর সব লোকের সামনেই এটা একটা সমস্যা। ডাক্তার যেমন রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন, তেমনি আমরাও যদি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করি তাহলে একটা সমাধান অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

এ ব্যাপারে প্রথমেই যে প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেবে—তা হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ এত উন্নত হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক সভ্যতা বহুবিধ দোষে দুষ্ট কেন ?

আধুনিক সভ্যতার মনোযোগ আকর্ষণকারী উপাদান হল 'গতি' (speed)। এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করা যেতে পারে। জীব-জন্তুকে যানবাহনের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগাবার উপায় শিখতে মানুষকে কত শত বছর ব্যয় করতে হয়েছিল ? পশুর টানার উপযুক্ত চাকা আবিষ্কার করতে মানুষের আরও কত শত বছর লেগেছিল এবং নৌকার পাল ব্যবহার করার পূর্বে মানুষ বাতাসকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিল এবং সেই শত শত বছরে মানুষের চলার গতি কতটুকু বর্ধিত হয়েছিল ? তখনকার অগ্রগতি যদি আজকের রেল ও স্টীমার চালনার বাষ্পীয় যন্ত্রের সাথে তুলনা করি তাহলে দেখা যাবে যে, গত দেড়শ বছরে পৃথিবী অতি আশ্চর্যজনকভাবে এক লাফে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এর সাথে আমরা বিদ্যুৎ শক্তি, টেলিগ্রাফ ও বেতার যোগাযোগ আবিষ্কার এবং আকাশে বিমানের কর্তৃত্ব যুক্ত করতে পারি। গত বিশ বছরে যে অভূতপূর্ব দ্রুততা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে, তা যদি আমরা পর্যালোচনা করি, তাহলে বর্তমান যুগ ও পরবর্তী যুগের মধ্যে যে কতটা পার্থক্য সূচিত হতে পারে, সে সম্পর্কে আমরা সহজেই আঁচ করতে পারব। দু'শ বছর আগেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই মানুষের চলার সর্বোচ্চ গতি ছিল দৈনিক প্রায় একশ মাইল। অথচ আজকাল এ গতি শব্দের গতিকেও ছাড়িয়ে গেছে এবং আমরা নিশ্চিত ধরে নিতে পারি যে, যতই দিন যাবে মানুষের চলার গতি ততই বাড়তে থাকবে।[১৪]

এ গতিকে যদি আমরা পার্থক্যের মাপকাঠি হিসেবে ধরে নিই, তাহলে আমাদের যুগে অর্জিত গতি এবং আমাদের পূর্ব-পুরুষদের সময়ে অর্জিত গতির মধ্যে যে ব্যবধান, তা-ই হবে আমাদের সভ্যতা পরিমাপের মানদণ্ড। বাষ্পীয় যন্ত্র যেমন প্রাচীন যুগকে আধুনিক যুগ থেকে পৃথক করেছে, তেমনি ইলেক্ট্রোনিক্স ও ক্রমোন্নয়ন-গতি আমাদের যুগকে পরবর্তী যুগ থেকে পৃথক করবে।

আমাদের যুগের দুর্ভাগ্য এই যে, অতীত ও ভবিষ্যৎ যুগের যোগসূত্র রক্ষাকারী হিসেবে আমাদের যুগকে নিষ্ঠুর পরিবর্তনের কাছে অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এমতাবস্থায়, বর্তমান যুগের সদস্য হিসেবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামনে একটা বিশ্ব-নিয়ম রেখে যাওয়ার কোন যোগ্যতা আমাদের আছে কি ? বাষ্পীয়-পূর্ব যুগের চিন্তাধারার সাথে আমাদের চিন্তাধারার যে পার্থক্য, আমরা যে পদ্ধতি ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের সন্তুষ্টির জন্য রেখে যেতে চাই, তার মধ্যেও তেমনি পার্থক্য থেকে

www.nagorikpathagar.org

যেতে পারে। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, মানুষ এখনও নিজের সম্পর্কে অজ্ঞ এবং এখনও তার কাছে দেহ ও মনের রহস্য অনুদ্‌ঘাটিত। ফলে আজও মানুষ মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম। তাই কোন এক বিশেষ যুগের মানুষের পক্ষে অন্য আর এক যুগের জন্য কোন নিয়ম উদ্ভাবন করা কঠিন। মানুষ প্রাণী ছাড়া আর কিছুই নয়, তবে তাকে যথেষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতাও তার একটা বিশেষ গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবী একটা অভিন্ন পথ অনুসরণ করে চলেছে। আস্তে আস্তে সভ্যতার বিকাশ হচ্ছে এবং তা ক্রমান্বয়ে এক দেশ থেকে অন্য দেশে বিস্তার লাভ করছে। এক জাতির মধ্যে সভ্যতা লোপ পেতে শত শত বছর সময় লেগেছে এবং অন্য জাতির মধ্যে তার উন্মেষ ঘটতেও সময় লেগেছে কয়েক শতাব্দী। এভাবেই মানুষ নিজ বুদ্ধিমত্তা সভ্যতার অগ্রগতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়েছে এবং তার যথেষ্ট অগ্রগতির সাধন করতে পেরেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের হঠাৎ বিস্ফোরণে পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে এবং মাটির মধ্য থেকে বেরিয়েছে অনেক নতুন জিনিস। এর ফলেই মানুষ ভীত-সন্ত্রস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে এবং কি ঘটছে তা জানতে চাইছে।

বস্তুত কয়েক যুগের মধ্যে সভ্যতার প্রকৃতি এমনভাবে পাল্টে গেছে যে পুরাতন ও নতুন কেউ কাউকে যেন চিনতেই পারছে না। উদাহরণস্বরূপ, আমরা মিসরের থেবিসের (Thebes) পার্শ্ববর্তী এক গ্রাম্য সরদারের কথা উল্লেখ করতে পারি। প্রাচীনকালে তার পূর্ব-পুরুষরা যেভাবে বসবাস করত, লোকটা এখনও ঠিক সেভাবে বসবাস করছে। বর্তমান শতাব্দীর গোড়ার দিকে সে তার ছেলেকে শিক্ষার জন্য আমেরিকায় পাঠায়। ছেলেটা সেখানে বিয়ে করে স্ত্রীকে নিয়ে তার গ্রামের বাড়িতে ফেরে। ফিরে এসে ছেলেটি দেখে যে, তার পিতা এখনও ফিরাউনের আমলের মতই লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ করছে, হিকসস (Hyksos) আমলের ঘরের মত ঘরেই বসবাস করছে এবং 'খুফু' (Khufu) আমলে মানুষের যে চিন্তাধারা ছিল সেই চিন্তাধারাই লালন করছে। পিতা-পুত্রের যখন পুনরায় দেখা হলো, তখন স্বভাবতই তারা একে অপরকে চিনতে পারল না। যেন ছেলে আর এক গ্রহ থেকে তার পিতার কাছে নেমে এসেছে। সুতরাং তারা একত্রে বসাবস করতে ও একে অপরকে সহযোগিতা করতে ব্যর্থ হলো।

ধরে নেয়া যাক যে, পিতা-পুত্রের সাক্ষাতের সময় তিন হাজার বছর পূর্বে মৃত আর একজন 'থেবিস' (Thebes) সরদারকে আল্লাহ্ কবর থেকে জীবিত করে তুলে নিয়ে এলেন—ধরা যাক তিনি ছিলেন 'রামসেস' (Ramses)-এর আমলের একটা গ্রামের সরদার এবং বর্তমান পরিবারের পূর্ব-পুরুষ। ধরে নেয়া যাক—আমেরিকা

www.nagorikpathagar.org

থেকে পুত্রের ফিরে আসা উপলক্ষে উক্ত পরিবারের আনন্দোৎসবে যোগদানের জন্যই তার এই আগমন। এখন গ্রামবাসী কার মধ্যে নিকটতর সম্বন্ধ দেখতে পাবে—বর্তমান সরদার এবং তিন হাজার বছর পূর্বে মৃত সরদারের মধ্যে, না বর্তমান সরদার ও তার বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করা ও মাত্র ত্রিশ বছরের কম সময় ধরে বিদেশ প্রবাসী পুত্রের মধ্যে ?

উৎসবে উপস্থিত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে তাদেরই চোখের সামনে জন্মগ্রহণ করা এবং নতুন একটা পৃথিবী থেকে সদ্য প্রত্যাগত পুত্রের চেয়ে তিন হাজার বছর আগে মৃত সরদারের সাথে, তাদের পূর্ব-পুরুষ বর্তমান সরদারের চাল-চলন ও আচার-ব্যবহারে অনেক বেশি মিল খুঁজে পাবে।

একটা পরিবারের আচার-আচরণ পরিবর্তন করতে তিন হাজার বছর যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে ত্রিশ বছরে তা সম্পূর্ণ বদলে গেছে। এ ধরনের আমূল পরিবর্তন শুধু মিসরেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটছে। গত এক শতাব্দীতে—প্রচণ্ড এক ভূমিকম্প যেন পৃথিবীর চেহারাকে এমনভাবে পাল্টে দিয়েছে এবং অতীতের সাথে আমাদের ব্যবধান এত বেশি দুস্তর করে তুলেছে যে, মনে হয়—আমরা এক নতুন গ্রহে উপনীত হয়েছি।

এই আমরা, যারা এই হঠাৎ পরিবর্তনের শিকার ; এই আমরা, যারা যন্ত্রকে শাসন করছি এবং যন্ত্রও যাদের শাসন করছে ; এই আমরা, যারা যন্ত্রকে অজানা লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করছি, যন্ত্রও তাদের আরও গভীর অজানার দিকে নিয়ে যাচ্ছে—তাদের পক্ষে কি ভবিষ্যতের জন্য একটা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করা সম্ভব ? আমরা যদি বিশ্বাস করি, আমরা একটা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে পারব, তাহলে তা নিজেকে প্রতারণা করা ছাড়া আর কিছুই হবে না এবং এর পরিণতিও হবে অপ্রতিরোধ্য। সুতরাং নতুন নিয়ম প্রবতর্নের যে কোন পথ পরিহার করাই হবে আমাদের পক্ষে উত্তম। এ পর্যায়ে আমাদের আরো উচিত হবে ধ্বংসাত্মক অস্ত্রপাতির ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং যে সমস্ত কারণ আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তুলছে—সেগুলোর প্রসার বন্ধ করা। বস্তুত আমরা যেটাকে 'নতুন নিয়ম' বলছি, কেবলমাত্র এ পন্থায় আমরা তা সম্ভব করে তুলতে পারি।

আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছি এবং বিশ্বকে নতুন আদর্শে সংগঠিত করার প্রস্তাব শুনেও আশান্বিত হয়েছি। তারপর আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আরও ভয়াবহ দাবানল প্রত্যক্ষ করলাম এবং আরও উৎসাহব্যঞ্জক কথা শোনলাম। কিন্তু ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে মারণাস্ত্র ব্যবহারকারীদের মনোভাব এবং ১৯৩৯-৪৫ সালে সংঘটিত যুদ্ধে মারণাস্ত্র ব্যবহারকারীদের মনোভাবের মধ্যে কি কোন পার্থক্য দেখা গেছে ? হায়, সেই একই শৃঙ্খলিত মন অতীত এবং বর্তমানের নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে—একই

www.nagorikpathagar.org

যন্ত্র, বস্তু, পরিবহন, যোগাযোগ এবং অপ্রতিরোধ্য গতির আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। তারা শুধু দ্বিধাগ্রস্ত নয়, বোঝার ভারে ন্যুব্জদেহ এবং কুব্জপৃষ্ঠও বটে।

যৌবনে আমরা এই আলোচ্য নতুন নিয়ম সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে শোনতাম। কিন্তু এখনও যখন এই ধরনের কথা শুনতে পাই, তখন আমরা সন্দিহান ও শঙ্কিত হয়ে পড়ি। কারণ এর মধ্যে আছে শুধু প্রতারণা আর ব্যর্থতা।

প্রাচীন সভ্যতার অগ্রগতি হয়েছিল হাজার হাজার বছরে ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে এবং এতে করে মানুষ নিজেকে সেই সভ্যতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিল। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার সাথে খাপ খাওয়াতে মানুষের অনেক সময় লাগবে—যেমন আমরা এখনও পারিনি।

আজকের এই বিরাট দায়িত্ব বহন করার মত ক্ষমতা বিশ্বের নেতৃবৃন্দের আছে কিনা এবং এ দায়িত্বের গুরুত্ব অনুধাবন করার বুদ্ধিমত্তা সাধারণ মানুষের আছে কিনা, সে সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু যে মহাশক্তি এ বিশ্বকে পরিচালনা করছে, সেই মহাশক্তির ওপর রয়েছে আমার অগাধ বিশ্বাস। আমাদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা একমাত্র প্রকৃতিই পূরণ করতে পারে। আঘাত সামলিয়ে ওঠার মত শক্তি মানুষ জন্মগত সূত্রেই পেয়েছে এবং মানব জাতির অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা ও তার উন্নতি বিধান করার মত কৌশল, যোগ্যতা ও পরিবর্তিত অবস্থায় মানিয়ে নেয়ার মত ক্ষমতা মানুষের আছে। যে কোন ভয়াবহ ও কঠিন পরীক্ষার মধ্যে টিকে থাকার দুর্বার ইচ্ছায় মানুষ নিশ্চয়ই একটা উপযুক্ত এবং নতুন বিশ্ব নিয়ম আবিষ্কার করবে, যা যন্ত্র ও ক্রমবর্ধমান গতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে সক্ষম। আমি 'উপযুক্ত' ও 'নতুন' কথা দুটো এজন্যই বললাম যে, পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন বিশ্ব নিয়ম চাপিয়ে দেয়া হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। কারণ প্রত্যেকটা আবিষ্কার, প্রতিটি পরিস্থিতি ও পদ্ধতি প্রকৃতিগতভাবে পরিবর্তন, ধ্বংস ও ক্ষয়ের বীজ বহন করে চলে।

মানব জাতির ওপর যে সব দুর্যোগ আপতিত হয়েছে, তার বেশির ভাগ দুর্যোগের কারণ হলো অনুমান ও অজ্ঞতা। আর মানুষের ওপর যে সব বিপদ আসে, তার বেশির ভাগই সৃষ্টি হয় তার নিজস্ব শত্রুতা ও উস্কানিমূলক ছলনা থেকে।

ক্ষমতা ও পদমর্যাদার উন্নতি সাধনের প্রতি মানুষের যে সহজাত প্রীতি ও অহমিকা রয়েছে তা উপেক্ষা করে আমরা যদি একটা দৃষ্টান্তমূলক নিয়ম চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করি, তবে তা নিয়ন্ত্রণহীন বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরিতে ঢাকনি লাগাবার শামিল হবে। মানব প্রকৃতির সাথে মিল নেই—এমন কোন প্রস্তাবিত নিয়ম চালু করা হলে মানুষের প্রকৃতিই তাকে ধ্বংস করে দেবে। কারণ কোন দৃষ্টান্তমূলক নিয়ম মানুষের নিকট অসহনীয় হলে তা তারা উলোট-পালট করে একটা নতুন নিয়ম

www.nagorikpathagar.org

সৃষ্টি করবেই। মহৎ আদর্শ প্রচারকারী প্রতিটি ধর্ম এবং মানুষের চিন্তাধারার ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই আমার এই বক্তব্যের সত্যতা স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা খৃস্টধর্ম ও সাম্যবাদের কথা বলতে পারি। এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য দুহাজার বছরের। এ দুই মতবাদের ব্যাপারে মানুষের উল্লিখিত আদিম প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া কি ? উভয়েই কি একটা মহৎ ও দৃষ্টান্তমূলক নিয়ম স্থাপনের চেষ্টা করেনি ? তাদের মধ্যে মহৎ আদর্শের সর্বোচ্চ প্রকারের আর কি বাকি আছে ? অথচ তাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কষ্ট ভোগ ছাড়া মানুষ কি পেয়েছে ? খৃস্টধর্মে যুদ্ধ নিষিদ্ধ। কিন্তু সেই খৃস্টধর্মের নামে ও খৃস্টধর্মের জন্য যত রক্তপাত ঘটানো হয়েছে, তা মানবেতিহাসের অন্য কোন ধর্মে দেখা যায় না। তাছাড়া, যে ইউরোপীয় মহাদেশ খৃস্টধর্মের লীলাভূমি, সেই ইউরোপ গত এক হাজার বছর ধরে যুদ্ধ ও ধ্বংসের আবর্তে ঘুরপাক খেয়েছে। যীশুখৃস্টের মহান, দয়াপূর্ণ ও নম্র বাণী আজ কোথায় ? মানুষের স্বার্থপরতা, অন্যের ওপর শাসন ও আধিপত্য করার ঘৃণ্য প্রবৃত্তি কি সে ধর্মকে কলুষিত করেনি ? মানুষ কি তার ঘৃণ্য প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য যীশুর বাণীকে কাজে লাগায়নি ?

সাম্যবাদ বা কমিউনিজম সম্পর্কে বলা যায়, এর বাণী বিশ্বের কাছে নতুন কিছু নয়। অনেক দিক থেকে এ মতবাদ পারস্যের 'মাজদাক' (Mazdakite) মতবাদের সাথে তুলনীয়। এ 'মাজদাক' মতবাদ পারস্যকে ধ্বংস করেছিল। প্রাচীনকালে বর্বরদের লুটতরাজের ফলে যে রক্তপাত সংঘটিত হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি রক্তপাত ঘটেছে পৃথিবীতে কমিউনিজমের নামে। কমিউনিজমের আর কি বাকি আছে?

তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে, দৃষ্টান্তমূলক বা পূর্ণাঙ্গ কোন বিশ্বনিয়ম এ পৃথিবীর জন্য শুধু স্বপ্নই হয়ে রইল, কারণ মানব প্রকৃতি তা প্রত্যাখ্যান করেছে। সুতরাং এ ধরনের নিয়ম অনুসন্ধান করার জন্য অনুরোধ করা কি আমাদের জন্য বাঞ্ছনীয় হবে ? বা যে নিয়ম পৃথিবীর জন্য খাপ খায় তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে ? সাধারণ আইন যেমন ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে তেমনি সেই নিয়ম বা আইন গোত্র ও জাতিসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্যায়কে সীমিত রাখবে, শান্তি স্থায়ী করবে, যুদ্ধের ভয়াবহতাকে কমিয়ে আনবে এবং মানব প্রবৃত্তিকে সেই গ্রহণযোগ্য পথে পরিচালিত করবে যে পথে সংঘর্ষ ছাড়াই সামরিক প্রয়োজন মিটানো সম্ভব। এ ধরনের নিয়মই সকলের জন্য উৎকৃষ্ট জীবন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে। এ ধরনের নিয়ম ব্যক্তি, সম্প্রদায় ও জাতি সকলেরই সমর্থন পেতে পারে। কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির মাধ্যমে বিশ্ব আজ অনেকটা এক হয়ে গেছে।

www.nagorikpathagar.org

অন্য কথায়, এ নতুন নিয়মের মধ্যে এমন কতকগুলো বিধান থাকবে যা বিশ্বের সর্বত্রই প্রযোজ্য হবে এবং কালক্রমে তা প্রথা ও সাধারণ আইনে পরিণত হবে। তখন তা সকলের জন্যই হবে গ্রহণযোগ্য এবং সমগ্র বিশ্বেও তা প্রতিপালিত হতে পারবে।

অধিকার বনাম কর্তব্য

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ও পরে পৃথিবীর বহু বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কিভাবে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন একটা বিশ্ব-নিয়ম উদ্ভাবন করার চেষ্টা করেছেন যা বিশ্বকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার দুঃখ-দুর্দশা থেকে রক্ষা করতে পারে, সে সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি।

এ কাজে যে সমস্ত সংস্থা আত্মনিয়োগ করেছিল, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রসিদ্ধ লেখক এইচ. জি. ওয়েলস-এর নেতৃত্বাধীনে গঠিত লণ্ডনের কতিপয় বিশিষ্ট লোকের একটা সংস্থা। অনেক তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনার পর এই সংস্থা মানবাধিকার সম্বলিত একটা কর্মসূচী প্রণয়ন করে এবং এ কর্মসূচীকে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়।

এ সংবিধানে এগারটি ধারা ছিল, যেগুলোর মধ্যে উক্ত দলের মতে, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছিল। তাঁরা দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, কোন রাষ্ট্র বা প্রচলিত প্রথা, আইন ও সংবিধান এ সব মানবাধিকার নাকচ করতে পারবে না। কারণ এ সংবিধানই হবে বিশ্বের মৌলিক আইন এবং এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ প্রত্যেকটি আইনই বাতিল বলে গণ্য হবে।

এ সংবিধানের প্রধান প্রধান ধারা ছিল সম্পত্তির পবিত্রতা রক্ষা, শিক্ষার অধিকার, ধর্ম বিশ্বাসের স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, কাজ করার অধিকার এবং সমাজের কাছ থেকে দুর্বলের আশ্রয়ের অধিকার।

প্রাচ্যের দুজন প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ মহাত্মা গান্ধী ও জওহর লাল নেহেরুর কাছে উক্ত দল তাঁদের কর্মসূচী প্রেরণ করেন এবং এ দুজন চিন্তাবিদের মতামত ও পরামর্শ চেয়ে পাঠান। কিন্তু তাঁদের উত্তর ছিল ভিন্ন রকমের।

গান্ধী তাঁর উত্তরের মধ্যে সর্বপ্রথম একটা প্রশ্ন উত্থাপন করেন ঃ এ ধরনের অধিকার ঘোষণার বাস্তব ফল কি এবং কে এ সব অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে ও রক্ষা করার ভার নেবে ? তিনি অভিমত দেন যে, এ দল সমস্যার ভ্রান্তপথে যাত্রা শুরু করেছে এবং বিশ্বের যা প্রয়োজন তা হলো মানুষের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা। এ উত্তরে ওয়েলস সাহেব অত্যন্ত রেগে যান এবং গান্ধীকে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। কারণ তাঁর মতে, গান্ধী জড় বিশ্বাসের অধিকারী বলে সহযোগিতা করতে অস্বীকার

www.nagorikpathagar.org

করেছেন। তাই তিনি গান্ধীকে প্রতিক্রিয়াশীল ও বর্তমান যুগের প্রয়োজন সম্পর্কে অজ্ঞ বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু ওয়েলস সাহেব গান্ধীর প্রতি সুবিচার করেছিলেন কি ? তাঁর অভিমত কি বিবেচনা ও আলোচনার দাবি রাখে না ?

জওহর লাল নেহেরুর উত্তর ওয়েলস সাহেবের মনঃপুত হয়েছিল। জওহর লাল নেহেরুর অভিমতকে বাস্তব ও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার উপযোগী বলে তিনি মন্তব্য করেন। অবশ্য কয়েকটি ছোট-খাট ব্যাপারে ওয়েলস সাহেব নেহেরুর মতকে সমর্থন করতে পারেননি। নেহেরু বলেন যে, কিলগ ব্রিয়ান্ড চুক্তি (Kellog Briand pact) যুদ্ধকে যেমন বেআইনী ঘোষণা করতে ব্যর্থ হয়েছিল, তেমনি প্রস্তাবিত ঘোষণাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে। কারণ এ ঘোষণা বাস্তবায়িত করার কোন সুনির্দিষ্ট পন্থা উদ্ভাবন করা হয়নি। তিনি বলেন, বর্তমান বিশ্বের অশান্তির জন্য দায়ী হলো সাম্রাজ্যবাদ ও পুঁজিবাদ তথা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতির দুর্নীতি। সুতরাং ঘোষিত কর্মসূচীর অধিকারসমূহ ভোগ করার জন্য উক্ত পদ্ধতির পরিবর্তন প্রয়োজন সর্বাগ্রে। নেহেরুর মতে, সমাজতন্ত্রই এ সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ। মানুষের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা তখনই নিশ্চিত হবে, যখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

আমি স্বীকার করি যে, মানুষের অধিকারের কথা অহরহ উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রায়ই তা ভঙ্গ করা হয়েছে। কিন্তু তবু আমি নেহেরুর মতকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনে বরং গান্ধীর সাথে এ ব্যাপারে আমি অনেকটা একমত। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা তাদের কর্তব্য উপলব্ধি করে যতদিন পর্যন্ত নৈতিক আচরণ, আইন ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত না হবেন, ততদিন পর্যন্ত মানুষের অধিকার যেভাবে আছে, সেভাবেই থেকে যাবে এবং তা কার্যকর করা সম্ভব হবে না।

সুতরাং নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন একটা নৈতিক আচরণবিধি প্রণয়ন করার চেষ্টা খুবই ন্যায়সঙ্গত। এ নতুন নিয়মের ভিত্তি হবে কর্তব্য। অধিকারকে সাম্যের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ না করে কর্তব্যকেই সাম্যের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সম্ভবত এটাই হবে আক্রমণ প্রতিহত করার এবং অন্যের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করার প্রকৃষ্ট পন্থা।

আমরা যদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অধিকারের দাবিদারদের প্রতি নয় বরং কর্তব্য পালনকারীদের প্রতি সম্মান দেখাতে জনগণকে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি, তাহলে আমরা কর্তব্যকে নৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে সফলকাম হব এবং এ ভাবেই আদর্শ পৃথিবীর জন্য আমরা একটা নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে পারব। মার্জিত ব্যক্তির নির্দিষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে কর্তব্য—প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমরা যদি এ সত্যের ওপর আলোকপাত করতে পারি, তাহলে মানুষ অন্যের অধিকারের

www.nagorikpathagar.org

প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে। বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অধিকার রক্ষা করার চেয়ে এ পদ্ধতিতে অধিকার রক্ষা করা সহজতর হবে এবং তা মানুষের জন্যও হবে কল্যাণকর। এ প্রশিক্ষণ মানব সংস্কারের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এটাই ছিল নবী ও সংস্কারকদের অনুসৃত নীতি। এ ধরনের পদ্ধতি প্রবর্তন, অন্য কথায় মানব সমাজের কর্তব্য পালনকারীদের প্রশংসা করার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা মোটেই কঠিন কাজ হবে না।

প্রত্যেক নবীই নরহত্যা, চুরি, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা নিষিদ্ধ করেছেন এবং অপরের প্রতি নিজের কর্তব্য পালনের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন– অধিকারের কথা বলেননি। অপরের প্রতি ক্ষতিকর কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকতে আমরা যদি অভ্যস্ত হই এবং এটাকে আমরা যদি বিশ্বজনীন উদাহরণে পরিণত করতে পারি, তাহলে তা হবে নতুন নিয়ম সৃষ্টির পথে একটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ—যদিও বাহ্যিক দিক থেকে মনে হবে যে এটা একটা নেতিবাচক পদক্ষেপ মাত্র।

উদাহরণস্বরূপ হত্যা ও যুদ্ধের কথা ধরা যায়। এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার শিক্ষা মানুষকে দেয়া হয়নি, কারণ কতর্ববোধ বিনা অপরাধে বা বে-আইনীভাবে কোন লোকের জীবন নষ্ট করতে প্রত্যেকটা মার্জিত লোককেই বাধা দেয়। এ প্রশিক্ষণ মানুষকে যুদ্ধ করা থেকে নিবৃত্ত করে। ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে একজন সৈনিকের কর্তব্যকে সেভাবেই বিচার করতে হবে, যেভাবে সর্বত্র জনগণ একজন জল্লাদের কর্তব্যকে বিবেচনা করে থাকে। এ ধরনের প্রশিক্ষণ, নৈতিক আচরণ ও আইন যুদ্ধ রোধ করতে মানুষের সম্পাদিত চুক্তি ও ঘোষণার চেয়ে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

জীবনের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার কাজ সত্যই দুরূহ। কিন্তু তাই বলে কি গত এক-দুই যুগের মধ্যে অনেক মতবাদ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়নি? সুতরাং উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যে কোন অবস্থায় কর্তব্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কতিপয় বিশ্বজনীন মৌলিক প্রথা কেন সৃষ্টি করা সম্ভব হবে না? মানুষের যেসব প্রবৃত্তি দুর্নীতির উৎস বলে মনে করা হয়, কর্তব্য পালনের মাধ্যমে সে সব প্রবৃত্তিকে গর্ব অনুভব করার শিক্ষাদান বোধ হয় অসম্ভব হবে না।

পানিতে ডুবে যাওয়া লোককে বাঁচিয়ে বা নিজেকে বিপদাপন্ন করে আগুন নিভিয়ে মানুষ গর্ব অনুভব করে। এখন যদি এ মানুষকে অহিংসা, আত্মবিসর্জন এবং এমন কি শাহাদত বরণের শিক্ষায় অভ্যস্ত করানো হয় এবং সে যদি বুঝতে পারে যে, এসব কাজ করার মধ্যেই সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার ও পূর্ণ বীরত্ব নিহিত রয়েছে, তাহলে সে তার প্রবৃত্তিগুলোকে পরার্থপরতায় ও সমাজের সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত করবে।

www.nagorikpathagar.org

ক্ষমতার দাপটে যারা অন্যকে গ্রাস করেছে এবং ধ্বংস করেছে তাদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার বদলে যারা কর্তব্য সম্পাদনে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, তাদের স্মৃতিকে কেন আমরা অমর করে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করি না ? কোন্‌টা কর্তব্য তা শিক্ষা দিতে হলে এবং কর্তব্য পালনের বিষয়কে সর্বোচ্চে তুলে ধরতে সত্যের দুর্গ গড়তে হবে এবং তা অমর করে রাখতে হবে। এভাবেই আমরা স্বাভাবিক আচরণের মাধ্যমে সংস্কার সাধন করতে পারব এবং নতুন নিয়ম রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে পারব।

বর্তমান যুগের যে ব্যক্তি দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করেছে এবং যে স্বীকার করে যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থায়ী বিশ্ব-নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব, যুদ্ধকে সম্পূর্ণ বেআইনী ঘোষণা করার ব্যাপারে সে পিছিয়ে থাকবে—একথা বিশ্বাস করা কঠিন। এ উদ্দেশ্যে নবীগণ যে পথ দেখিয়ে গেছেন তার চেয়ে উত্তম পথ আর কি আছে। সেই পথ হলো কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অপরাধ উচ্ছেদের পথ।

হত্যাকে ঘৃণা করার মত যুদ্ধকে ঘৃণা করার শিক্ষা আমরা মানুষকে দিচ্ছি না কেন ? কতিপয় রাষ্ট্রকে নিরস্ত্রীকরণ করে বা কতিপয় সশস্ত্র দেশকে শান্তির অভিভাবক নিযুক্ত করে কি শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব ? যদি তাদের মধ্যে কর্তব্যের পবিত্রতার ওপর ভিত্তিশীল আত্মসংযম ও নৈতিক প্রশিক্ষণ না থাকে তাহলে সশস্ত্র অভিভাবকদের লালসার পরিণতি যে যুদ্ধ, সে যুদ্ধ রোধ করার উপায় কি ?

বস্তুত এ ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া অসম্ভব নয় এবং এতে যে ফল পাওয়া যাবে তা হবে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য। মানব সভ্যতার প্রাথমিক যুগে মানুষ আত্মসংযমী ছিল এবং এর জন্য তারা যথেষ্ট গর্ব অনুভব করত। মানব পুণ্যের ইতিহাস সুদীর্ঘ। যুগে যুগে মানুষ তার সেই পুণ্যের ফল ভোগ করে আসছে। সামাজিক প্রথা ও ধর্মের মাধ্যমে মানুষ স্বার্থ ত্যাগ করতে শেখে এবং তা তাদের সহজাত আবেগে পরিণত হয়। কারণ যে প্রবৃত্তির জন্য মানুষ পুণ্যবান হয়, সেই প্রবৃত্তির জন্যই সে আক্রমণপ্রবণ হয়ে ওঠে।

দান করে মানুষ গর্ববোধ করে। কারণ বেশি দান-খয়রাত করে তারা প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি বিধান করে। কিন্তু যখন তারা পার্থিব ধন-সম্পদ অর্জন করে গর্ব অনুভব করে, তখন তারা একই প্রবৃত্তির সন্তুষ্টি বিধান করে স্বার্থপরতা ও দাম্ভিকতার মাধ্যমে।

উদাহরণস্বরূপ, আমরা যদি আমাদের ছেলেমেয়েদের এ শিক্ষা দান করি যে, ছুটির দিনে নতুন জামা-কাপড় পরে আত্মপ্রসাদ ও আনন্দ লাভ করা তাদের উচিত নয়, কারণ তাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের ছেয়েমেয়েরা নতুন জামা-কাপড় পরতে পারে না। তাহলে আমরা তাদেরকে নতুন জামা-কাপড় পরে বাহ্যিক চাকচিক্য

www.nagorikpathagar.org

প্রদর্শন করা থেকে স্বেচ্ছায় বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তুলতে পারি এবং দম্ভের প্রবৃত্তিকে আত্মসংযমে রূপান্তরিত করে কর্তব্য পালনের প্রতি ধাবিত করতে পারি।

মানুষের ইতিহাসে এটা কোন নতুন অভিজ্ঞতা নয়—মানবেতিহাসের ওপর যে সব ধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছে, সে সব ধর্মের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের সাথে এ অভিজ্ঞতার মিল আছে।

মানুষের যে কোন স্বাভাবিক প্রবণতা সার্বজনীন কিন্তু তার প্রকাশ হয় ভিন্নরূপে। কারণ মানুষের আত্মা রূপ লাভ করে নৈতিক শিক্ষা ও বিশেষ প্রথার প্রভাবে—যার লক্ষ্য হলো মানুষের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সাধন করা। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যারা পৃথিবীকে সংঘবদ্ধ করতে চায়, তাদের মনেও সেই সহজাত প্রবৃত্তি থাকা উচিত। এ ব্যাপারে নবীগণের প্রদর্শিত পথই উৎকৃষ্ট পথ। কারণ তাঁরা মানুষের প্রবৃত্তিকে এমনভাবে পরিচালনা করেছিলেন যা নৈতিক মান ও সাধারণ কল্যাণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। আমরা যদি আজ মানবাধিকার ঘোষণার পরিবর্তে তাদের কর্তব্যের কথা ঘোষণা করতাম এবং সেই কর্তব্যগুলো সম্মান ও পবিত্রতায় আচ্ছাদিত করতে পারতাম, তাহলে আমরা হয়ত একটা ন্যায়সঙ্গত নতুন নিয়ম অর্জনে সফলকাম হতাম। অন্য কথায়, যে আইন ও প্রথা এ নিয়মের ভিত্তি, সেই আইনকেই পরিবারের সদস্যদের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, দেশের প্রতি ও অন্যান্য প্রাণীর প্রতি মানুষের কর্তব্য নির্ধারণ করার ক্ষমতা দিতে হবে। তাহলেই ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য এ পদ্ধতি কার্যকর ও স্থায়ী পদ্ধতি হিসেবে গৃহীত হতে পারবে।

www.nagorikpathagar.org

লেখকের কথা

১. ক্রিস্টোফার এইচ. ডাওসন, দি ডিনামিক্স অব ওয়ার্লড হিস্টরি, জন জে মুলয় (পুনর্মুদ্রণ ; নিউইয়র্ক ঃ দি আমেরিকান লাইব্রেরী, ১৯৬২) পৃঃ ১০৫।

২. যে সব প্রখ্যাত মুসলিম আইনজ্ঞ ও ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের জীবদ্দশায় মিসর ও তুরস্কের সর্বোচ্চ অফিস শেখ আল ইসলাম-এ অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁরা 'আল-রিসালা আল-খালিদা' (মূলগ্রন্থ) পাঠ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এদের মধ্যে ছিলেন তুরস্কের শেখ আল-ইসলাম ও পরলোকগত আহমদ হামদি আকসেকি। জনাব হামদি এই পুস্তকখানা তুর্কী ভাষায় অনুবাদ করার সুপারিশ করেন এবং অনূদিত বইখানা প্রকাশের তত্ত্বাবধান করেন। এ বই-এ চল্লিশ পাতার একটা ভূমিকাও তিনি লিখে দেন। আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং ওয়াশিংটন ডি.সি.র ইসলামী কেন্দ্রের পরিচালক ডঃ মাহমুদ হোবাল্লাহ্ এই ইংরেজি পুস্তক পাঠ করেছেন এবং এ পুস্তকে ব্যবহৃত সূত্র ও বর্ণনা অনুমোদন করেছেন।

www.nagorikpathagar.org

প্রথম অধ্যায়

হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন বৃত্তান্ত

১. বার্নার্ড লুইস—দি এরাব্‌স ইন হিস্টরি (দ্বিতীয় সংস্করণ, পুনঃমুদ্রণ ; নিউইয়র্ক ঃ হারপার এ্যান্ড ব্রাদার্স, ১৯৬০) পৃঃ ৩৬।

২. মহানবীর প্রধান সঙ্গিগণকে বলা হয় সাহাবা (একবচন–সাহিব)।

৩. আবূ বকর, ওমর, উসমান ও আলী—নিষ্ঠাবান খলীফা (৬৩২–৬৬১ খৃস্টাব্দ)। আরবী ভাষায় 'অর্থোডক্স' শব্দটির অর্থ হলো—প্রকৃত, সঠিক পথে পরিচালিত, যথার্থ। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এ শব্দটিকে যেভাবে ব্যবহার করেছেন সেভাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। তাঁরা 'অর্থোডক্স খলীফা' হিসেবেই ব্যবহার করেছেন। এ চারজন খলীফা মুসলমানদের কাছে সম্মানীয় এজন্য যে, তাঁরা মহানবীর সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁর আদর্শ অনুসারে জীবন যাপন করেন। কোন বিষয়ে তাঁদের মতামত অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের সিদ্ধান্ত দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪. আরবী খলীফা, উত্তরাধিকার।

৫. বিস্ময়কর যে, এ বাণী সম্পর্কে পশ্চিমা দেশগুলোতে ষড়যন্ত্রের পরিবর্তে নীরব থাকার পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়েছে—যা আল্লাহ্‌র নাম করে বহু অন্যায় করার ও আলোকোজ্জ্বল উন্নয়নের পরিপন্থী।

৬. টর আঁদ্রে—মুহাম্মদ ঃ দি ম্যান এ্যাণ্ড হিজ ফেথ ; থিয়োফিল মেনজেল অনূদিত। (লণ্ডন ঃ জর্জ এ্যালেন এ্যাণ্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯৩৬), পৃঃ ১১ (পুনর্মুদ্রণ ঃ নিউইয়র্ক ঃ বার্নস এ্যাণ্ড নোবল, ১৮৫৭)। ইসলাম সম্পর্কে পশ্চিমারা যা জানে তার চেয়ে বেশি মুসলমানরা খৃস্ট ও য়াহূদী ধর্ম সম্পর্কে জানে। খৃস্ট ও য়াহূদীদের ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে মুসলমানরা সব সময় শ্রদ্ধা ও আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন।

৭. উইলফ্রেড কান্টওয়েল স্মিথ, ইসলাম ইন মডার্ণ হিস্ট্রি, নিউইয়র্ক ঃ দি নিউ আমেরিকান লাইব্রেরী, (১৯৫৭) পৃঃ ১০৯।

৮. কা'বা গৃহ হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক নির্মিত বলে জানা যায়। এ গৃহে পূর্বে অবিশ্বাসীদের পূজ্যদেবীর মূর্তি ছিল। পরবর্তীকালে মুসলমানদের প্রধান ইবাদত

www.nagorikpathagar.org

গৃহে রূপান্তরিত হয় এবং এই গৃহকে উপলক্ষ করেই মুসলমানরা মক্কায় হজ্জ্ব পালন করেন। ঘরটির গঠন কাঠামো অত্যন্ত সাদাসিধা।

৯. পিতার দিক থেকে মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার ছিল বনূ হাশিম বা হাশিমী। মুহাম্মদ (স)-এর প্রপিতামহ হাশিমের নামানুসারে এ বংশের নামকরণ করা হয়। হাশিমের এক ভাই মুত্তালিবের নামানুসারে সেই বংশের নামকরণ করা হয় বনূ মুত্তালিব এবং উমাইয়া নামক অপর এক পুত্র উমাইয়া বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই তিন পরিবার—এই অধ্যায়ে যাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে—বনূ আব্দ মানাফ উপগোত্রের অন্তর্গত যা সাধারণভাবে কুরায়শ নামে খ্যাত। এই সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলে দাঁড়ায়—হাশিমের পুত্র আবদুল মুত্তালিব (সুতরাং এখন থেকে এ বংশকে হাশিমী বলে আখ্যায়িত করা হবে, মুত্তালিবীয় বলে নয়) আবূ তালিবের পিতা এবং মুহাম্মদ (স)-এর পিতা আবদুল্লাহ্।

১০. নবুয়ত পাওয়ার পর যখন তিনি তাঁর গোত্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করেন, তখনও তাঁর কাছে একটা দায়িত্ব অত্যন্ত প্রিয় বলে বিবেচিত হয়। তা ছিল 'হিলফুল ফুজুল'-এ তাঁর সদস্যভুক্তি। এ সংঘটি তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন আশ্রয়হীনদের আশ্রয় এবং মক্কার পথিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য। এ সংঘটি প্রতিষ্ঠিত হয় একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে। ইয়েমেনের একজন লোক মক্কার একটা শক্তিশালী গোত্রের একজন লোকের কাছে কিছু মাল বিক্রয় করে। উক্ত ব্যক্তি সেই মালের দাম দিতে বা উক্ত মাল ফেরত দিতে অস্বীকার করে। হতভাগ্য লোকটি তখন কা'বার আঙ্গিনায় দাঁড়িয়ে শহরে একজন পথিক হিসেবে সাহায্য প্রার্থনা করে। কুরায়শদের অনেকে তাঁর সাহায্যার্থে এগিয়ে আসে এবং তার মাল ফেরত পাওয়াতে সাহায্য করে। পরে তারা আবদুল্লাহ্-ইবন-জুদান-এর গৃহে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে যে, তারা এখন থেকে অন্যায় কাজ প্রতিরোধ করবে এবং ন্যায়বিচার কায়েম করবে। মুহাম্মদ (স) তখন এ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ বছর। তিনি এ প্রতিজ্ঞায় এত বেশি খুশী হন যে, যখন তিনি ইসলাম প্রচার শুরু করেন তখন তিনি তা ইসলামে একটা বৈধ সংঘ হিসেবে স্বীকার করে নেন। ইসলামের সফলতার যুগেও তিনি এ সংঘের নীতির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন এবং তা মেনে চলারও আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

১১. ফাতিমা হলেন হযরত হাসান ও হযরত হুসাইনের মাতা। তাঁর স্বামী ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর চাচাত ভাই এবং চতুর্থ খলীফা। 'আশরাফ' হিসেবে পরিচিত তাঁর হাজার হাজার উত্তরাধিকার এখনও সারা বিশ্বে রয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

১২. এ. আর. আযযাম—বাতাল আল-আবতাল মুহাম্মদ (দ্বিতীয় সংস্করণ। কায়রো ঃ দি হাউজ অব এরাবিক বুকস্ ১৯৫৪) পৃঃ ১৬।

১৩. কুরআন ৯৬ ঃ ১ – ৫।

১৪. ঐ ৭৪ ঃ ১ – ৭।

১৫. আঁদ্রে (পূর্বে উল্লিখিত)।

১৬. কুরআন ৩ ঃ ৩০, ৩৭।

১৭. আয্যাম (পূর্বে উল্লিখিত)।

১৮. সূরার অর্থ কুরআনের অধ্যায়।

১৯. স্টেনলি লেনপোল দি স্পিসেজ এ্যাণ্ড টেবল-টক অব দি প্রফেট মুহাম্মদ (লণ্ডন ঃ ম্যাকমিলান এ্যাণ্ড কোং, ১৮৮২) পৃঃ ৩৩।

২০. আয্যাম (পূর্বে উল্লিখিত)। তিনি ওয়ালিদের পুত্র আবূ আল-ওয়ালিদকে 'উৎবা' বলে ডাকতেন। এটা ছিল ঐতিহ্যবাহী সম্মানসূচক আহ্বান।

২১. কুরআন ১১ ঃ ২৭। নূহ (আ)-কেও তাঁর লোকেরা এ কথা বলেছিল।

২২. ঐ ৪৯ ঃ ১৩।

২৩. ঐ ২৮ ঃ ৫৭।

২৪. এ শহরকে পরে 'মদীনাতুর রসূল' (নবীর শহর) বা আল-মদীনা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২৫. 'হিজরা' শব্দের শাব্দিক অর্থ বাস্তুত্যাগ। শব্দের ব্যুৎপত্তির দিকের চেয়ে ঐতিহাসিক দিক থেকে বিচার করলে শব্দটিকে 'পলায়ন' অর্থ হিসেবে ধরাই যুক্তিযুক্ত। মুসলমানদের বর্ষ গণনা 'হিজরী' থেকেই শুরু (অর্থাৎ ৬২২ খৃস্টাব্দ থেকে হিজরী সাল গণনা করা হয়।)

২৬. আরবী শব্দ 'বাদাউ' (একবচন- বাদু) থেকে ইংরেজি শব্দের উৎপত্তি। এর অর্থ যাযাবর—স্থায়ী জনগোষ্ঠীর সাথে যার পার্থক্য বিদ্যমান।

২৭. শব্দগত অর্থে 'লীগ' অর্থাৎ নবী ও তাঁর অনুসরণকারীদের বিরুদ্ধে একদল লোকের সাধারণ সন্ধি বা অঙ্গীকার।

২৮. 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত (মক্কার নিকটবর্তী একটা এলাকা)। ৬২৮ খৃস্টাব্দ।

২৯. লেনপোল (পূর্বে উল্লিখিত)।

৩০. কুরআন ৫ ঃ ৩।

www.nagorikpathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়
মহানবীর বাণীর মৌলিক নীতি

১. কুরআন ২ ঃ ৬২।
২. ঐ ২ ঃ ১১২।
৩. ঐ ৪ ঃ ১২৫।
৪. ঐ ২ ঃ ১৩৬।
৫. ঐ ৯৬ ঃ ১ – ৫।
৬. ঐ ৭৪ ঃ ১ – ৭।
৭. ঐ ৪২ ঃ ৫২ – ৫৩।

৮. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাবের পূর্বে আরব উপদ্বীপে আরবের গোত্রগুলো নিজস্ব মূর্তির উপাসনা করত। মুহাম্মদ (স) তাদেরকে এ শিক্ষা দেন যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং সব ইবাদতই তাঁর প্রাপ্য। অন্য সব উপাস্যকে পরিত্যাগ করার তিনি আহ্বান জানান—পবিত্র কুরআনে যাকে 'অংশীদার' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

৯. কুরআন ৬ ঃ ৭৬–৮০।

১০. 'জাহেলিয়া' অর্থ অজ্ঞতার যুগ। এখানে মুহাম্মদ (স) ও ইসলাম প্রচারের পূর্বে আরব উপদ্বীপের কথা বলা হয়েছে।

১১. 'কিতাবী জনগণ' বলতে এখানে সেসব লোককে বোঝানো হয়েছে, যারা কোন ঐশী গ্রন্থের (যেমন, বাইবেল) অনুসরণ করে ; বিশেষ করে খৃস্টান ও য়াহূদী।

১২. 'আত্মসমর্পণ' কথাটি এখানে মুহাম্মদ (স) প্রচারিত ধর্ম ইসলাম-এ যেভাবে অর্থ করা হয়েছে, সেভাবেই গ্রহণ করা হয়েছে—আল্লাহ্র প্রতি আত্মসমর্পণ।

১৩. কুরআন ৩ ঃ ৬৪।
১৪. ঐ ২৯ ঃ ৪৬।
১৫. ঐ ৫ ঃ ৮২।
১৬. ঐ ১৬ ঃ ১২৫।
১৭. ঐ ২ ঃ ৬২।
১৮. ঐ ২ ঃ ১৩৬।
১৯. ঐ ৪২ ঃ ১৩।
২০. ঐ ২৩ ঃ ৫১ – ৫২।
২১. ঐ ৩ ঃ ৫২।
২২. ঐ ৫১ ঃ ৫৬ – ৫৭।

www.nagorikpathagar.org

২৩. ঐ ৫৭ ঃ ১ – ৩।

২৪. ঐ ২২ ঃ ৪০।

২৫. খোজা গোত্র ছিল তখন মূর্তি উপাসক।

২৬. প্রথম অধ্যায়ের ২৮ নং পাদটীকা দেখুন।

২৭. কুরআন ২ ঃ ২২১।

২৮. ঐ ৯ ঃ ২৮।

২৯. ঐ ৪ ঃ ৪৮।

৩০. আলী (খৃস্টাব্দ ৫৬৬–৬৬১)-এর কথা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তিনি ছিলেন মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা—তিনি মুহাম্মদ (স)-এর কন্যা ফাতিমাকে বিয়ে করেন। আলী (রা) ছিলেন চতুর্থ খলীফা।

৩১. মু'আবিয়া ছিলেন কুরায়শ বংশের উমাইয়া শাখার লোক। তিনি উমাইয়া শাসনের প্রবর্তক। দামিশ্‌কে তিনি তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন এবং এ শাসনামলের (৬৬১–৭৫০) প্রথম খলীফা (৬৬১–৬৮১ খৃস্টাব্দ)।

৩২. খারেজীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল গঠন করে। আলী (রা) ও মু'আবিয়ার সংঘর্ষের সময় আলী (রা)-এর বিরুদ্ধাচরণকারীরাই এ দল গঠন করে। তাঁরা খিলাফতের ওপর কুরায়শদের একচেটিয়া দাবির বিরোধিতা করে—ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দীতে যে রক্তপাত হয়, তার জন্য এরাই মূলত দায়ী।

৩৩. কুরআন ৮৯ ঃ ২৭ – ৩০।

৩৪. ঐ ৩৮ ঃ ৪ – ৭।

৩৫. ইসলামের একজন বিচক্ষণ সমরনায়ক। প্রথম দুই খলীফার আমলে খালিদ বহু দেশ মুসলমানদের পতাকাতলে নিয়ে আসেন। সেনাপতি আবূ উবায়দা এই আদেশ দিয়েছিলেন বলেও ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে।

৩৬. আমর ইবনুল আস নীল উপত্যকা দখল ও উত্তর আফ্রিকার বার্বারদের বশীভূত করেন। এরপর তিনি ওমর (রা) কর্তৃক উক্ত এলাকার গভর্নর নিযুক্ত হন। ওমরের গৃহীত ব্যবস্থা পরবর্তী যুগে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩৭. কুরআন ১২ ঃ ১০৬।

৩৮. শরীয়ত বলতে শুধু আইন বোঝায় না– ধর্ম, আইন ও ধর্মমত বোঝায়।

৩৯. কুরআন ৯ ঃ ১২২।

৪০. ঐ ৪৭ ঃ ২৯।

৪১. ঐ ১৫ ঃ ৮৮ – ৮৯।

৪২. ঐ ১৭ ঃ ৮২।

৪৩. ঐ ৩ ঃ ১৫৯।

www.nagorikpathagar.org

৪৪. ঐ ৯ ঃ ১২৮।

৪৫. একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তর আফ্রিকায় আরবের লোক যেমন হেলাল ও সুলায়মান উপজাতির লোক যায়। তাদের শতাব্দীব্যাপী শত্রুতা ছিল বার্বার 'জনতা' উপজাতির সাথে। তারা উভয়েই ছিল মুসলমান।

৪৬. লেখক ১৯২৯ সালে সেখানে ছিলেন।

৪৭. প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান ও অস্ট্রিয়ানরা।

৪৮. কুরআন ৪৯ ঃ ১৩।

৪৯. ঐ ৯০ ঃ ১১ –১৭।

৫০. ঐ ৮৯ ঃ ১৭ – ২৬।

৫১. ঐ ১১ ঃ ২৭।

৫২. ঐ ২৩ ঃ ৫১ – ৫২।

৫৩. ঐ ৩ ঃ ১০৩।

৫৪. ঐ ৩ ঃ ৬৪।

৫৫. ঐ ৪২ ঃ ১৩।

৫৬. ঐ ২ ঃ ১৩৬।

৫৭. ঐ ২ ঃ ২৫৬।

৫৮. ঐ ৮ ঃ ৬১।

৫৯. ইবনে বতুতা চতুর্দশ শতকের একজন খ্যাতনামা মুসলমান পরিব্রাজক। নিজ দেশ মরক্কো থেকে যাত্রা করে সব মুসলিম দেশ ভ্রমণ শেষে তিনি জীবনের প্রান্তসীমায় নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যে সব দেশ ভ্রমণ করেন, সেই সব দেশের জনগণ, শাসনকর্তা, সামাজিক প্রথা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তাঁর বর্ণনা অতিরঞ্জিত ও ভুল থেকে মুক্ত না হলেও চতুর্দশ শতকের মুসলিম বিশ্ব সম্পর্কে জানার এক নির্ভরযোগ্য তথ্য বলে বিবেচিত।

তৃতীয় অধ্যায়
সমাজ সংস্কার

১. কুরআন ৬৬ ঃ ৪।

২. ঐ ৬ ঃ ৩৩।

৩. ঐ ২১ ঃ ৯২।

৪. এই প্রেক্ষিতেই ইসলাম কোন লোককে যাজক হতে নিষেধ করে এবং যাজক সম্প্রদায় সৃষ্টির অনুমতি দেয় না।

৫. কুরআন ১০৭ ঃ ১ – ৩।

www.nagorikpathagar.org

৬. ঐ ৫৯ ঃ ৯।
৭. ঐ ৫৯ ঃ ১০।
৮. ঐ ৪৯ ঃ ১০।
৯. ঐ ৯ ঃ ৭১।
১০. ঐ ৩ ঃ ১০৪।
১১. ঐ ১৩ ঃ ১১।

১২. যে পদ্ধতিতে ইসলাম মদকে নিষিদ্ধ করে তা হলো—প্রথমে প্রচার এবং পরে আইন প্রণয়ন। এতে বোঝা যায়, ইসলাম ধাপে ধাপে কিভাবে মদকে নিষিদ্ধ করে।

১৩. কুরআন ৩ ঃ ১৬৯।

১৪. তা ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। এ সময় আমি মুসলিম প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে ছিলাম। এ বাহিনী তখন লিবিয়ায় ইতালীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ছিল। লিবিয়ার তিনটি রাজনৈতিক বিভাগ ছিল যথা—ফেজান, ত্রিপলিতানিয়া ও সাইরিনাইকা।

১৫. লেঃ জেঃ স্যার জন ব্যাগট গ্লুব, দি গ্রেট এরাব কন্‌কোয়েস্ট (লণ্ডন ; হডার এ্যাণ্ড স্টাউটন লিমিটেড, ১৯৬৩), পৃঃ ৩৬৮।

১৬. কুরআন— ৫১ ঃ ১৯। পবিত্র কুরআন অনুবাদের অসুবিধার এটা আর একটা দৃষ্টান্ত। 'সা'ইল' শব্দটিকে ফকির হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে এবং যে সাহায্যের প্রার্থনা করে ; এবং 'মাহরুম'-এর অর্থ বলা হয়েছে ঃ জাতিচ্যুত হয়েছে এমন ব্যক্তি অথচ হওয়া উচিত ছিল, উদারতা থেকে যাকে বঞ্চিত করা হয়েছে বা প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্য কষ্ট ভোগকারী।

১৭. প্রচলিত ধারণা হলো, সিন্দুকে রক্ষিত সোনা ও রূপা ততক্ষণই বৈধ মাল হিসেবে বিবেচিত হয়, যতক্ষণ এর মালিক বার্ষিক যাকাত বা ভূমির শতকরা আড়াই ভাগ গরীবদের প্রদান করে। সিন্দুকে সোনা-রূপা রাখা যদিও ধর্মের দিক থেকে গ্রহণীয় কাজ বলে বিবেচিত হয় না।

১৮. কুরআন ৯ ঃ ৩৪–৩৫।
১৯. ঐ ২ ঃ ২৭৫।
২০. ঐ ২ ঃ ২৭৬।
২১. ঐ ৮০ ঃ ১–১০।
২২. ঐ ৪৯ ঃ ১১।
২৩. ঐ ৪ ঃ ১৪৫।
২৪. ঐ ২ ঃ ২৭৬।
২৫. ঐ ৩ ঃ ৯২।
২৬. ঐ ১০৭ ঃ ১–৩।

www.nagorikpathagar.org

২৭. ঐ ৮৯ ঃ ১৭–১৮।

২৮. জাঙ্গী সাম্রাজ্যের (১১২৭–১২৬২) প্রতিষ্ঠাতা জাঙ্গীর পুত্র। তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করেন এবং ল্যাভান্টের ফ্যান্‌ক রাজাদের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। তিনি পরোক্ষভাবে সালাহ্‌উদ্দীনের উত্থানের জন্য দায়ী ছিলেন।

২৯. কুরআন ৬০ ঃ ৪।

৩০. ঐ ৯ ঃ ৬০।

৩১. ঐ ৯৯ ঃ ৭–৮।

৩২. সাসানীয়রা ছিল পারস্যের ক্ষমতাসীন শাসক। ৬৩৭ খৃস্টাব্দে খলীফা উমর (রা)-এর নেতৃত্বে আরবরা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে।

৩৩. ৬৩৭ খৃস্টাব্দের জুন মাসে আরব সেনাধ্যক্ষ সাঈদ ইবনে আবি আক্কাস কর্তৃক বিজিত হওয়ার পূর্বে সাসানীয়দের রাজধানী ছিল Ctesiphon। আরবরা এই শহরকে মাদাইন হিসেবে আখ্যায়িত করে।

৩৪. কুরআন ৪৯ ঃ ১৩।

৩৫. ঐ ১১ ঃ ২৭।

৩৬. ঐ ১৬ ঃ ৯০।

৩৭. ঐ ৪ ঃ ১৩৫।

৩৮. ঐ ৫ ঃ ৮।

৩৯. ঐ ৪ ঃ ৫৮।

৪০. ঐ ৬ ঃ ১৫৩।

৪১. ঐ ৫৫ ঃ ৭–৯।

৪২. মধ্যযুগের একজন মুসলিম আইনবিশারদ। ইমাম অর্থ যে কোন ধরনের নেতা।

৪৩. 'বুকস' অর্থাৎ কিতাব বলতে আসমানী কিতাব বোঝানো হয়েছে, যেমন বাইবেল, কুরআন।

৪৪. একজন উমাইয়া খলীফা (৭১৭–৭২০), যিনি আল্লাহ্‌-ভীরু ছিলেন—তাঁর মাতৃকুলের পিতামহ ওমর ইবন্‌ আল-খাত্তাব নয়।

৪৫. বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফা আল-মামুন (৮১৩–৮৩৩) সাংস্কৃতিক অগ্রগতির অগ্রদূত। তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর সময়ে আব্বাসীয় রাজত্ব স্বর্ণশিখরে উপনীত হয়।

www.nagorikpathagar.org

৪৬. 'আলীদু'র' ছিল মুহাম্মদ (স)-এর জামাতা ও চতুর্থ খলীফা আলী (রা)-এর পক্ষভুক্ত লোক। তাঁরা আব্বাসীয় শাসনের অবসান করে আলী (রা)-এর উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে লোক নিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল।

৪৭. মুসলমানদের অধীনে সাবেইনরা 'যিম্মী' হিসেবে মর্যাদা লাভ করে।

৪৮. ম্যাজিয়ানস্ বা মাজুস্রা ছিল জরথুস্ত্রের অনুসারী। তাঁরা কিতাবী লোক বলে আখ্যায়িত না হলেও মুসলমানরা তাদেরকে 'যিম্মী'র মর্যাদা দেয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্র

১. কুরআন ১৫ ঃ ৯।

২. ঐ ৪ ঃ ৮০।

৩. ঐ ৩ ঃ ১৫৯। আরবী শব্দ 'আমর'-এর কোন আসল প্রতিশব্দ ইংরেজিতে নেই। 'আমর'-এর অর্থ হলো—আল্লাহ্ ও মুসলমানরা যে ব্যাপারে আলোচনা করা প্রয়োজন মনে করেন, সেই বিষয়।

৪. কুরআন ৪২ ঃ ৩৮।

৫. প্রথম খলীফা আবূ বকর (রা) সাধারণ সভায় খলীফা নির্বাচিত হন। এ সভায় সমগ্র সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করে।

৬. মুসলমানদের ইতিহাসে এমন অনেক শাসনকর্তা আছেন, যাঁদের অনেকে খলীফার কিছু কিছু এলাকায় নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন এবং পরে খলীফার অনুমতি পান। এ ধরনের শাসনকর্তাকে সাধারণত সুলতান বা রাজা বলা হয়।

৭. মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞগণের মতে 'ইজমা' (সাহাবাগণের চূড়ান্ত মত) শাসনতান্ত্রিক আইন বা অন্যান্য আইনের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। গুরুত্বের দিক থেকে আইনের সূত্র হলো-(১) কুরআন, (২) হাদীস, (৩) ইজমা এবং (৪) কিয়াস।

৮. কুরআন ১৬ ঃ ৯০।

৯. ঐ ৫ ঃ ৮।

১০. ঐ ৪ ঃ ১৩৫।

১১. ঐ ৩৮ ঃ ২৬।

১২. ঐ ২ ঃ ১৪৩।

১৩. ঐ ১৬ ঃ ৯২।

১৪. ঐ ২ ঃ ১৪৩।

www.nagorikpathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

১. এ সন্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে লেখকের 'আল-রিসালা আল-খালিদা' (আরবী সংস্করণ) দেখুন (দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ দি হাউস অব এরাবিক বুকস, ১৯৫৪), পৃঃ ৯২-৯৭। আরও দেখুন ডঃ মুহাম্মদ হামিদুল্লাহ (ভারতের হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক আইন বিভাগের অধ্যাপক) লিখিত পুস্তক Corpus des Traites et Letters diplamatiques d Islama L Epoque du Prophet et des Khalifes Orthodoxes (Paris : G. P. Mai sonneuve, 1935)

২. কুরআন ২২ ঃ ৩৯-৪১।

৩. ঐ ২২ ঃ ৪১।

৪. ঐ ৮ ঃ ৬১।

৫. ঐ ৫ ঃ ৪৯।

৬. ঐ ৪৯ ঃ ৯।

৭. ঐ ৪৯ ঃ ৯-১০।

৮. আরবদের দ্বারা আলেকজান্দ্রিয়া পুনর্দখলের পর (বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে ৬৪৬) বেশ কিছু মিসরীয় খৃস্টান গ্রামবাসী গভর্নর আমর ইবনুল আ'স-এর নিকট অভিযোগ করে যে, তারা বিদ্রোহীদের সাথে যোগ না দেওয়া সত্ত্বেও আলেকজান্দ্রিয়ার বাইজেন্টীয় বাহিনী তাদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং অর্থ ছাড়াই জোর করে খাদ্য গ্রহণ করে। তারা উল্লেখ করে যে, মিসরের প্রথম আত্মসমর্পণের পর আমর-এর সাথে যে চুক্তি হয়, তাতে তাদের ওপর কর আরোপ করা হয়। ম্যানুয়েলের আক্রমণের সময় তাদেরকে রক্ষা করা হয়নি। ফলে তারা মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। আমর তাদের অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ দেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিজিত লোকদের সাথে তাদের চুক্তি ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধের ক্ষেত্রে আরবরা অত্যন্ত বিবেচকের মত কাজ করতেন। তাঁরা কর, প্রতি ব্যক্তির ওপর ধার্য কর আদায় করতেন এবং একই সাথে তাঁদের আশ্রিত ব্যক্তিদের প্রতি যে দায়িত্ব ছিল তাও যথাযথভাবে পালন করতেন। [লেঃ জেঃ স্যার জন ব্যাগট গ্লুব, দি গ্রেট এরাব কনকোয়েস্ট (লণ্ডন ঃ হডার এ্যাণ্ড স্টাউটন লিমিটেড, ১৯৬৩) পৃঃ ২৮৪-২৮৫]।

৯. কুরআন ৪ ঃ ১।

১০. ঐ ১৬ ঃ ৯২।

১১. ঐ ৫ ঃ ৮।

www.nagorikpathagar.org

১২. ঐ ৮ ঃ ৭২।
১৩. ঐ ৮ ঃ ৫৮।
১৪. ঐ ৪৭ ঃ ৩৫।
১৫. ঐ ২ ঃ ১৯৩।
১৬. ঐ ২ ঃ ২১৭।
১৭. ঐ ৯ ঃ ৭৩।
১৮. ঐ ৯ ঃ ১২-১৫।
১৯. ঐ ২ ঃ ১৯৩।
২০. ঐ ২ ঃ ১৯১।
২১. ঐ ৮ ঃ ৬৫।
২২. ঐ ৯ ঃ ৩৬।
২৩. ঐ ৮ ঃ ৬০।
২৪. ঐ ২ ঃ ১৯৩।
২৫. ঐ ৮ ঃ ৬১।

২৬. লেখক 'জিহাদ'-কে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ হিসেবে পুরোপুরি মনে করেন, যা একবার শুরু হলে বিজয় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

২৭. কুরআন ৮ ঃ ১৫-১৬।
২৮. ঐ ৪৯ ঃ ১৩।
২৯. ঐ ৪ ঃ ৯৪।
৩০. ঐ ৬ ঃ ৮-৯।
৩১. ঐ ৪ ঃ ৯০।
৩২. ঐ ২ ঃ ২৫৬।
৩৩. ঐ ১ ঃ ৯৭-৯৯।
৩৪. ঐ ২ ঃ ১৯০।
৩৫. ঐ ৫ ঃ ২।
৩৬. ঐ ৫৫ ঃ ৭।
৩৭. ঐ ৪ ঃ ১৩৫।
৩৮. ম্যাথিউ-৫ ঃ ৩৯. ৪১ (রাজা জেমস্-এর কথা খৃষ্টানদের বাইবেল)।
৩৯. ঐ ২৬ ঃ ৫২।
৪০. কুরআন ৩ ঃ ১০৪।
৪১. ঐ ৪৯ ঃ ৯।

৪২. লেখক এখানে বলতে চান যে, এই অধ্যায় বা এই বই-এর অন্য কোন অধ্যায়ে মুসলমানদের রাজা বা তাদের নেতাদের পক্ষে তিনি এককভাবে কিছুই বলেন

www.nagorikpathagar.org

নি—সমসাময়িক বিশ্বের অন্যদের (ভাল বা মন্দ) মতামত থেকে তাদের পার্থক্য ছিল খুব কম। এই বই লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করার—বিশ্বাস, আইন, বিজ্ঞান ও জীবন-যাপন পদ্ধতি আলোচনা করার, যা পবিত্র কুরআনে ঘোষিত হয়েছে এবং যা মহানবী প্রচার করেছেন।

৪৩. 'মুসতাজির' ও 'মুসতামিন'-এর যথার্থ অর্থ 'আশ্রিত' নয়। এর অর্থ হলো—যে চায় তাকে আশ্রয়ের অনুমতি, বন্ধুত্ব, কাজের চুক্তি ইত্যাদি সম্পাদন করা। অন্য কথায়, মুসলমানরা নিজেদের এলাকায় যাকে ব্যবসা, কৃষিকাজ বা অন্য কোন পেশা গ্রহণ বা কাজ করার জন্য বসতি স্থাপনের অনুমতি দেয়।

৪৪. কুরআন ৯ঃ৬।

৪৫. ঐ ৯ঃ৬।

৪৬. ঐ ২ঃ১৯৪।

৪৭. ঐ ৪২ঃ৪০।

৪৮. আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা আমাদের বিশ্বযুদ্ধে জীবন ধ্বংস করা সম্ভব করেছে। এটা পরিষ্কার যে, ইসলাম এ ধরনের ধ্বংস নিষেধ করেছে। যে কোন মুসলিম আইনজ্ঞ, যিনি পবিত্র কুরআনের নীতি দ্বারা পরিচালিত, এই পরিস্থিতিতে দুঃখ ভোগ করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণ করতে রাযী হবেন না—কারণ তাতে শত্রুদের জীবন ধ্বংস হবে।

৪৯. মহানবীর একজন সঙ্গী (সাহাবী)।

৫০. ইসলামের একজন নেতৃস্থানীয় আইনজ্ঞ (৭১৫–৭৯৫) যিনি আইন বিজ্ঞানের নীতি প্রণয়ন করেন, যা তাঁর নামেই অভিহিত (মালিকী) টর্ট-এর উপর মুসলিম আইন সম্পর্কে তাঁর লেখা 'সংক্ষিপ্তসার' সবচেয়ে প্রাচীন।

৫১. খলীফা ওমর (রা)-এর সময়কার একজন সেনাধ্যক্ষ। সিরিয়া ও ইরাক জয় করার সময় তিনি মুসলমানদের পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন।

৫২. আভিরোস (১১২৬–১১৯৮) নামেও পরিচিত। এরিস্টটলের দর্শনের ব্যাখ্যা প্রদানকারী।

৫৩. কুরআন–৩৩ ঃ ২৬–২৭। জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে এই ঘটনা বনূ কুরায়যা গোত্রকে বেষ্টন করেছিল। যা জানা যায় তা হলো, মিত্রশক্তি (আযহাব গোত্র) মদীনা অবরোধ করলে তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং প্রতিকূল অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে। মুসলমানরা বিপথগামী হয় এবং তারা ভীত হয়ে পড়ে। বনূ কুরায়যা তখন চুক্তি ভঙ্গ করে মুসলমানদের আঘাত করে। আর একটা কারণ হলো, তারা আউস গোত্রের এলাকায় পড়ে। এই গোত্র (গোত্রের নেতা সাদ ইবনে মা'আদ) তাদের সতীর্থ ছিল এবং তারা তাদের প্রতি ন্যায়বিচার করে। তারা এক শর্তে আত্মসমর্পণ করে। তা

www.nagorikpathagar.org

হলো—শুধু তারাই তা পালন করবে। আরও বলা হয়ে থাকে যে, তাদের মৃত্যুদণ্ড য়াহূদী আইন মুতাবিক (যেহেতু তারা য়াহূদী ছিল) দেওয়া হয়েছিল এবং সাদ নিজেই তাদের আইন মুতাবিক বিচার করেছিলেন। এই ঘটনার সব কিছুই আমাদের কাছে রহস্যাবৃত। সুতরাং মনে হয়, এটাই শেষ নয়। আরও কিছু ঘটনা আছে যা আমাদের কাছে অজ্ঞাত রয়েছে।

৫৪. কুরআন ৪৭ : ৪।

৫৫. মহানবীর সঙ্গী (সাহাবী) আল-হাসান ইব্‌ন মুহাম্মদ আল-তামিমি থেকে উদ্ধৃত।

৫৬. কুরআন ৪ : ৯২।

৫৭. ঐ ৭৬ : ৮–৯।

৫৮. ঐ ২ : ২০৪।

৫৯. ঐ ৮ : ৬১–৬২।

৬০. ঐ ৪ : ৯৪।

৬১. ঐ ৬০ : ৮–৯।

৬২. ঐ ৪ : ৯০।

৬৩. ঐ ৪২ : ১৫।

৬৪. ঐ ৩ : ২০।

৬৫. ঐ ৪৫ : ১৪।

৬৬. ঐ ২৯ : ৪৬।

৬৭. ঐ ৫ : ৪৮।

৬৮. ঐ ১০ : ১০০।

৬৯. ঐ ৩৪ : ২৮।

৭০. ঐ ২ : ২৫৬।

৭১. ঐ ২৪ : ৫৪।

৭২. ঐ ৫ : ১৩।

৭৩. স্যার থমাস আর্নল্ড রচিত 'দি প্রিচিং অব ইসলাম' : এ হিস্ট্রি অব দি প্রোপাগেশান অব দি মুসলিম ফেইথ (দ্বিতীয় সংস্করণ : লণ্ডন : কনস্টাবল এ্যান্ড কোং, ১৯১৩) দেখুন।

৭৪. স্বেচ্ছাসেবী বাহিনীর পৃথক দলের গোত্র দ্বারাই বড় আক্রমণ (৬৩৪–৬৪৪) পরিচালিত হয়, যার ফলে তৎকালীন বিশ্বের দুটো বড় সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়।

www.nagorikpathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
বাণীর বিস্তার

১. 'ইসলাম' অর্থে বোঝানো হয় আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মসমর্পণ এবং 'মুসলমান' অর্থে বোঝান হয় 'বান্দা'। আল্লাহ্‌ এক। সুতরাং তাঁর বান্দাদের উচিত আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে অবিশ্বাসীদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা। আরবরা ধর্মান্তরণের প্রস্তাব করেনি। তারা প্রস্তাব করেছিল অধীনতার। অনেকে অবশ্য এটাকে ধর্মান্তরণের প্রস্তাব বলেই মনে করে। আরবরা যেখানে গিয়েছিল, সেখানেই তারা এই অধীনতার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। দেশ জয়ের পর আরবরা অবিশ্বাসীদের জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও যুদ্ধলব্ধ মাল হিসেবে গ্রহণ করে—এমনকি অবিশ্বাসীদের এমন কতকগুলো সংঘও তারা গ্রহণ করে, যা ছিল তাদের জন্য উপযোগী।" [হেনরী পিরেন–মুহাম্মদ এ্যাণ্ড চার্লিম্যান, বার্নার্ড মিয়াল কর্তৃক অনূদিত (পুনঃমুদ্রণ—নিউইয়র্ক ; মেরিডিয়ান বুকস, ১৯৬১) পৃঃ ১৫০–৫১]।

২. কুরআন ২২ ঃ ৩৯–৪১।

৩. বদর প্রান্তরের নিকটবর্তী একটা শুষ্ক কুয়ার নাম 'আল-কালিব'। যুদ্ধশেষে মুহাম্মদ (স)-এর বাহিনী যুদ্ধে নিহত কুরায়শদের লাশ কবর দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কুয়ার মধ্যে রাখে।

৪. অধ্যায় ৪৮।

৫. কুরআন ২ ঃ ২৫৬।

৬. ঐ ১০ ঃ ৯৯।

৭. ঐ ১৮ ঃ ১৭।

৮. মহানবীর প্রথম জীবনী লেখক আবদুল মালিক ইবনে হিশাম তাঁর 'তারিখ আর-রসূল' (লিডেন, ১৮৮১–১৮৮২ প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে মন্তব্য করেন যে, ফারাওয়ার কর্তৃত্ব মা.আন-এর ওপর ছিল, যা বর্তমান জর্দানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

৯. একটা ধূসর খচ্চর, একটা ঘোড়া, একটা গাধা, শনের জামা ও সিল্কের লম্বা ঢিলা বহির্বাস।

১০. ঝরনা।

১১. দক্ষিণ আরবের বাইজেন্টাইন খৃস্টান আরব গোত্র উত্তর আরবে বাইজেন্টীয়দের অভিভাবকত্বে শাসনকার্য চালায় এবং তারা ছিল উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী। আরব উপদ্বীপের বাইরে তারাই ছিল সর্ব প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী। তারা এই ধর্মকে আরবদের ধর্ম বলে আখ্যায়িত করে।

১২. বাহ্‌রা, জুধাম, আলী ও বাল্‌কা গোত্রের লোকদের নিয়ে হিরাক্লিয়াসের বাহিনী গঠিত হয়।

www.nagorikpathagar.org

১৩. কুরআন ২৮ঃ৫৭।

১৪. ঐ ৩৬ঃ৭৭-৭৯।

১৫. বলা হয়ে থাকে যে, এই দিন শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়ার চেয়ে মুহাম্মদ (স) তাঁর নিজের ওপর বিজয়ী হন এবং এই বিজয় ছিল বড় বিজয়। কারণ মক্কার লোকদের কাছ থেকে কুড়ি বছর যাবত নিষ্ঠুর আচরণের পরিবর্তে তিনি এমন ব্যবহার করেন, যা দৃষ্টান্ত হিসেবে বিদ্যমান।

১৬. কুরআন ২৮ঃ৫৭।

১৭. ঐ ১৮ঃ১৭।

১৮. ক্রিস্টোফার ডাউসন তাঁর 'দি অরিজিন্স অব ইউরোপ' গ্রন্থে মুসলমানদের বিজয়ের মূল কারণ হিসেবে ধর্মীয় আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন। 'মুহাম্মদ ও চার্লিম্যান' গ্রন্থে হেনরী পিরেন মুসলমানদের বিজয়ের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আরব বিজয়ের কাহিনী নজিরবিহীন। আটিলা, চেঙ্গিস খান এবং তৈমুর লং যেভাবে দ্রুততার সাথে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তার সাথে মুসলমানদের ত্বরিত বিজয়ের ব্যাপারটি তুলনা করা যেতে পারে। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং ইসলামের বিজয় ছিল স্থায়ী ; ইসলামের প্রথম খলীফাগণ যেসব দেশে ইসলাম প্রচার করেন সেই সব দেশের প্রায় প্রত্যেকটিতে এখনও ইসলাম ধর্মের অনুসারী আছে। খৃস্ট ধর্মের প্রসার হয় ধীরগতিতে অথচ ইসলাম ধর্মের প্রসার হয় যেন বিদ্যুতের গতির মত। আরবরা একটা নতুন বিশ্বাসের অধিকারী হয়েই আবির্ভূত হয়। তাই বলে তারা ধর্মোন্মাদ ছিল না। তারা তাদের অধীনস্থ প্রজাকে ধর্মে দীক্ষিত করার আশাও পোষণ করত না। [হেনরী পিরেন-মুহাম্মদ এ্যাণ্ড চার্লিম্যান, বার্নার্ড মিয়াল কর্তৃক অনূদিত (পুনঃমুদ্রণ—নিউইয়র্ক মেরিডিয়ান বুকস, ১৯৬১) পৃঃ ১৪৯-৫০]।

১৯. কুরআন ৩ঃ২০।

২০. স্যার থমাস আর্নল্ড—দি প্রিচিং অব ইসলাম (দ্বিতীয় সংস্করণ লণ্ডন ঃ কনস্টাবল এণ্ড কোং লিমিটেড, ১৯১৩), পৃঃ ৬০।

২১. ঐ

২২. শব্দগতভাবে 'আদুদ আদ দৌলা'র অর্থ 'রাষ্ট্রের সহায়তাকারী শক্তি বা বাহু'। ৯৪৯ থেকে ৯৮৩ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাগদাদের প্রকৃত শাসনকর্তা ছিলেন।

২৩. পারস্যের বিরুদ্ধে আল-জিসর যুদ্ধে আরবরা পরাজয় বরণ করে। আল-হিরা শহরের উত্তরে ইউফ্রেতিস তীরবর্তী এলাকায় ৬৩৪ খৃস্টাব্দে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আল-হিরা শহরের দক্ষিণে কুফা ও নযফ-এর মধ্যবর্তী আরবরা ৬৩৫ খৃস্টাব্দে বুয়াইব যুদ্ধে জয়লাভ করে। এই স্থানটিও ইউফ্রেতিস-এর তীরে।

www.nagorikpathagar.org

২৪. মুসলমানদের কাছ থেকে সংগৃহীত এক রকমের কর। এই কর সংগ্রহ করা হতো দুস্থদের জন্য।

২৫. কুরআন ৫ ঃ ৮২।

২৬. স্যার থমাস আর্নল্ড—দি প্রিচিং অব ইসলাম (দ্বিতীয় সংস্করণ লণ্ডন ঃ কনস্টাবল এ্যাণ্ড কোং, ১৯১৩), পৃঃ ৮৮।

২৭. স্যার থমাস আর্নল্ড—দি প্রিচিং অব ইসলাম, পৃঃ ৮৯–৯০।

২৮. ঐ পৃঃ ৯০।

২৯. ঐ পৃঃ ৮১–৮২।

৩০. কুরআন ২ ঃ ২৫৬।

৩১. 'মুহাম্মদ এণ্ড চার্লিম্যান' গ্রন্থে হেনরী পিরেন মন্তব্য করেন যে, মুসলমানরা যে দেশ জয় করে, সেই দেশের মানুষের মনও জয় করতে তারা সমর্থ হয়েছিল।

৩২. জেন সোমস নিকারসন-এর মতে, "পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের ইতিহাস ছিল নিষ্ঠুর ও নির্দয় কার্যকলাপের ইতিহাস এবং স্পেন থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করার জন্য স্পেনীয়রা চরম নিষ্ঠুর পন্থা গ্রহণ করে।" (এ শর্ট হিস্টরি অব নর্থ আফ্রিকা—নিউইয়র্ক ঃ দি ডেভিন এডায়ার কোম্পানী ; ১৯৬১), পৃঃ ৭৫।

৩৩. কুরআন ১০ ঃ ৯৯।

৩৪. ঐ ৬ ঃ ১০৯।

৩৫. মুসলমানরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই কথা বিশ্বাস করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের জীবন ও সম্পত্তি রাষ্ট্র বা সম্প্রদায় কর্তৃক নষ্ট করা হয় না, এমনকি তারা অন্য চিন্তা বা মতবাদে বিশ্বাসী হলেও।

৩৬. ডাব্লু, ডাব্লু গ্রাফ ভন বডিসিন (লিপজিগ)।

৩৭. এডলফ্ হেলফিরিচ (বার্লিন)।

৩৮. স্যার থমাস আর্নল্ড—দি প্রিচিং অব ইসলাম।

৩৯. এই যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর কমাণ্ডার আবদুর রহমান গাফিকি নিহত হন এবং পশ্চিম ফ্রান্সে চার্লস মার্টেল-এর বাহিনী আরবদের বাহিনীকে পরাভূত করে।

৪০. স্যার থমাস আর্নল্ড—দি প্রিচিং অব ইসলাম।

৪১. কুরআন ২ ঃ ১৪৩।

সপ্তম অধ্যায়
বিশ্ব-অশান্তির কারণ

১. ফ্যাসিস্ট শাসনের পূর্বে ১৯২০–২১ সালে ইতালীর প্রধানমন্ত্রী নিতি লিবিয়াতে যে কাজ করেছিল, সেই সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে।

www.nagorikpathagar.org

২. কুরআন ৪ ঃ ৯৪।

৩. 'বলশেভিকবাদ-এর আস্তানা হলো পশ্চিম ইউরোপ এবং তখন থেকেই তা হলো ইংরেজ বস্তুবাদীদের বিশ্ব-ধারণা' [অসওয়ার্ল্ড স্পেনগ্‌লার—দি আওর অব ডিসিশান, অনুবাদ—চার্লস অব আটকিনসন (নিউইয়র্ক, আলফ্রেড এ. নফ. ইনকরপোরেটেড ১৯৩৪) (পৃঃ ৯৭)]।

৪. 'বস্তুবাদ ও সমাজবাদকে তুলনা করা যায় পূর্ব পৃষ্ঠার নিম্নে লিখিত পরপৃষ্ঠার প্রথম কথার সাথে এবং এজন্যই এর সংজ্ঞা অনুসন্ধানের চেষ্টা (১৯৪৮ থেকে) ব্যর্থ হয়েছে' (ঐ, পৃঃ ১১২)।

৫. রমযান মাসের শেষ দিনে ইফতার করার পর।

৬. কুরআন ৯ ঃ ৬০।

৭. পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ 'এবং যাদের সম্পত্তির মধ্যে (গরীবদের জন্য) একটা অংশ নির্দিষ্ট রয়েছে ; (৭০ ঃ ২৪)।

৮. ইজতিহাদ-এর ক্ষেত্রে মুসলিম আইন, কুরআন, হাদীস এবং ইসলামে ব্যবহারতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকা দরকার—এসব ব্যাপারে কিন্তু ব্যবহারতত্ত্ববিদ-গণের সাথে পরামর্শ প্রয়োজন।

৯. 'খুম' বলতে বোঝায় যুদ্ধলব্ধ মালের এক-পঞ্চমাংশ, যা মুসলমানদের ট্রেজারিতে জমা হয়।

১০. অনারব অমুসলিমরা যে নতুন ভূখণ্ডে বসবাস করত, তাকে বলা হতো 'উলূজ'।

১১. শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাইজেন্টীয় সাম্রাজ্যের চুতর্দিকে গড়ে তোলা সীমান্ত ফাঁড়ির কথা বলা হয়েছে।

১২. অনেকে অভিযোগ করেন যে, ওমর একাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এককভাবে সিদ্ধান্ত নেন নি। তাঁর এই কাজ ছিল একটা বৈধ দৃষ্টান্তের অনুসরণ মাত্র। মুসলমানদের খায়বর দখল করার পর মহানবী (স) খায়বরের জনগণের মধ্যে জমি ফিরিয়ে দেন এবং আবদুর রহমান ইবন্ আউফ-এর বিরোধিতাও ছিল পবিত্র কুরআনের অন্য একটা আয়াত-নির্ভর।

১৩. কুরআন ১৭ ঃ ৩৫।

১৪. ঐ ১৪ ঃ ৩১।

১৫. ঐ ১৬ ঃ ৯০।

১৬. ঐ ৮ ঃ ২৫।

১৭. ঐ ৭ ঃ ৩১।

১৮. ঐ ২৮ ঃ ৫৮।

১৯. ঐ ১৭ ঃ ১৬।

www.nagorikpathagar.org

২০. একজন সাহাবী ও মহানবীর জীবনী লেখক।

২১. সাহাবী।

২২. প্রথম এবং সম্ভবত মহানবীর জীবনী লেখকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।

২৩. ৭৫২-৯০৩ খৃস্টাব্দের মধ্যে সাম্রাজ্যের মধ্যে শক্তিশালী শাসক হিসেবে পরিচালিত উযীর পরিবার কর্তৃত্ব ও জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তাদের স্থান ছিল খলীফার পরে।

২৪. খলীফা মামুন ৮২০ খৃস্টাব্দে খুরাসানের তাহির ইবন-আল হোসাইনকে বাগদাদের পূর্বাঞ্চলের মুসলমান এলাকা পুরস্কার হিসেবে দান করেন।

২৫. ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কী সাম্রাজ্য নানা বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়। এই সময় প্রধান উযীরগণ সাম্রাজ্যের গৌরব রক্ষার্থে সচেষ্ট হন।

২৬. মামলুকরা প্রথম দিকে ক্রীতদাস ছিল এবং দশম শতাব্দীতে তাদেরকে মিসরে আনা হয়। তারা মিসরে দুটো সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে (প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) যার স্থায়িত্বকাল ছিল দুইশত পঞ্চাশ বছর। পশ্চিম এশিয়ায় মোগলদের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ তারা রোধ করে এবং প্যালেস্টাইন, লেবানন ও সিরিয়ার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়।

২৭. বিশেষ কোন শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বের মতবাদ 'প্রভু' শ্রেণীর মতবাদের পূর্বে বিশেষভাবে ব্যাপ্তি লাভ করে।

২৮. গ্রেকো-তুর্কী যুদ্ধের (১৯১৯-১৯২৩) পর।

২৯. লামারটাইন অতি অল্প কথায় বর্ণনা করেন ঃ "মুহাম্মদ একটা আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি করেন, যার মধ্যে সব ভাষা ও শ্রেণীর লোক একীভূত হয়েছিল।"

৩০. কুরআন ২৯ ঃ ৫৬।

৩১. ঐ ৪৯ ঃ ১৩।

৩২. ঐ ৯ ঃ ২৪।

৩৩. মধ্যপ্রাচ্যের কৃষক ও বেদুইনদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ফলেই আমার এই অভিজ্ঞতা হয়।

৩৪. কুরআন ২ ঃ ২৫৬।

৩৫. ওমর যখন এই কথা বলেন, তখন তিনি খলীফা ছিলেন এবং তখন তিনি বিশ্বের দুটি বড় সাম্রাজ্য রোমান ও পারস্য জয় করেন। তবু তিনি একজন স্বাধীন ভৃত্যের অনুকূলে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করার বাসনা করেন।

৩৬. কুরআন ৫৯ ঃ ১৯।

www.nagorikpathagar.org

৩৭. জীবন, বন্দেগী, সমাজ এবং রাষ্ট্র সবকিছুই শাশ্বত জীবনের উপায় মাত্র। ইসলামে এই পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করা স্বর্গীয় রাজত্ব কায়েমের উপায় মাত্র।

৩৮. কুরআন ৩ ঃ ১১০।
৩৯. ঐ ৪২ ঃ ১৩।
৪০. ঐ ৯১ ঃ ৭–১০।
৪১. ঐ ৮ ঃ ৭২।
৪২. ঐ ১৬ ঃ ৯১–৯২।
৪৩. ঐ ১৩ ঃ ৫২।

অষ্টম অধ্যায়

সভ্যতার আধ্যাত্মিক রক্ষাকবচ

১. কুরআন ১৩ ঃ ১১।
২. ঐ ৩ ঃ ১৪০।
৩. ঐ ১৩ ঃ ১১।
৪. ঐ ৩ ঃ ১১।
৫. ঐ ৮ ঃ ৫৩।
৬. ঐ ৭ ঃ ৯৬।
৭. ঐ ২১ ঃ ১০৫।
৮. ঐ ২৪ ঃ ৫৫।
৯. ঐ ১৬ ঃ ১১২।
১০. ঐ ২১ ঃ ১১–১৫।
১১. ঐ ১০ ঃ ২৪।
১২. ঐ ৩৩
১৩. ঐ ২৮ ঃ ৫৭।

১৪. ১৯২৩ সালে উট ও ঘোড়ায় চড়ে ত্রিপলিতানিয়ার (লিবিয়া) গেরিয়ান থেকে কায়রো আসতে তেষট্টি দিন সময় লাগে (প্রত্যেক দিন ৮ থেকে ১০ ঘণ্টার পথ অতিক্রম করে)। ১৯৪৭ সালে বিমানযোগে আমেরিকায় যেতে আমার সময় লাগে মাত্র সাত ঘণ্টা। এখন জেট বিমানে এই যাত্রা মাত্র তিন ঘণ্টায় সম্পন্ন করা যায়। মহাকাশযাত্রী জন গ্লেন তিন ঘণ্টায় এই পৃথিবী দু'বার পরিভ্রমণ করেন এবং দুবার সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করেন।

www.nagorikpathagar.org

নির্ঘণ্ট

অ

অস্ট্রিয়া ৬৫, ১৭৯, ১৯৩

অধ্যাত্মবাদ ৭৩, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৯

আ

আর্নেস্ট রেনান ২৩

আবূ সুফিয়ান ২৪, ৪৩, ১৫৭

আলেকজান্ডার ২৪

আবদুল আযীয ইবনে সউদ ২৫

আবদুল্লাহ ২৫

আমিনা ২৫

আবদুল মুত্তালিব ২৫, ৩১

আবূ তালিব ২৬, ২৭, ২৮, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৫০

আবদ মানাফ ২৬, ৮১

আল-আমীন ২৭

আলী ২৮, ৩৯, ৫৮, ১৮৬

আবূ বকর ২৯, ৩৫, ৩৯, ৯২, ৯৩, ৯৭, ১০৫, ১৪২, ১৮৫, ১৮৮

আবুল ওয়ালিদ ৩২

আবিসিনিয়া ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ১১২, ১৫০, ১৯৮

আবূ লাহাব ৩৬

আকাবা ৩৮

আউস ৩৮, ১৮৬

আনসার ৩৮, ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৭০ ৮৩, ১৮৬

আহ্যাব ৪৩

আল ফুজুর ৫১, ৫২

আদম ৫৪, ১৮০, ১৮৭

আমর ৬১, ৯৬

আর-রহমান ৬৪

আফগানিস্তান ৬৫, ৭২

আদিয়া ইবনে হাতিম ৬৭

আবূ ইসহাক আল-সিরাজী ৬৭

আলবেনিয়া ৭২

আলজিয়ার্স ৭২

আবুল মালেক ৭৬

আবূ হাজম ৭৬

আবূ যর ৮৮, ১৮১

আল-শাতিবি ৯৮

আল-মামুন ৯৯

আহল আল-হাল ওয়াল আকদ ১০৩

আমেরিকা ১১৫, ১৮৩, ২১০, ২১৫, ২২২

আবূ ওবায়দা ১১৯

আবূ জান্দাল ১২৩

আল-হারিস ১৪৪

আর্নল্ড ১৪৮, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৭২

আল-মুতিম ইবনে আদী ১৫১, ২০৫

আল-কালিব ১৫২

আম্মান ১৫৩

আল-ফারাক ১৫৩-১৫৫

আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহ ১৫৪

আজিজাত ১৫৫

আব্বাস ১৫৭

আকিক গোত্র ১৫৭

আলজিরিয়া ১৬১

আল-মুতাসিম ১৬২

আদুদ আদ-দৌলা ১৬২

আল-জিসর ১৬৩

আল-মুতাওয়াক্কিল ১৬৩, ১৬৪

আল-হাকিম ১৬৩, ১৬৪

আন্দালুসিয়া ১৬৪

আত্তালিয়া ১৬৫

আন্টিয়ক ১৬৫

আল-আকসা ১৬৭

www.nagorikpathagar.org

আটলান্টিক প্যাক্ট ১৭৯
আবদুর রহমান ইবনে আউফ ১৮৫, ১৮৬
আহল-আল-সূরা ১৮৭
আত্তাব ইবনে আসিদ ১৯১
আলস্টার ১৯৪
আয়ারল্যান্ড ১৯৪
আলেকজান্দ্রিয়া ১৯৪
আবূ হুযায়ফা ১৯৮
আলপাইন ২১০, ২১১

ই
ইয়েমেন ৩৯, ১৫৭
ইবরাহিম ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৫১, ৫৪, ৭০
ইসমাঈল ৪৩, ৪৮, ৫৪
ইহ্সান ৪৮
ইসহাক ৪৮, ৫৪
ইয়াকুব ৪৮, ৫৪
ইরাক ৬৫, ৭২, ১১৯, ১৬২, ১৮৬, ১৯৪
ইরান ৬৫, ৭২, ১৯৪
ইবনে বতুতা ৭১, ১৯৯
ইউনুস ইবনে ওবায়েদ ৭৬
ইবনুল মুনকাদির ৭৭
ইথিওপিয়া ৯৪
ইবনুল কায়্যিম ৯২
ইন্দোনেশিয়া ১০১
ইজমা ১০৬, ১২৩
ইমাম ১০৪, ১০৬, ১০৯, ১৮৭
ইবনে রুশদ ১৪২, ১৪৩
ইকরামা ইবনে আবূ জাহল ১৪৪
ইমাম বুখারী ১৪৪, ১৪৫
ইবনে উমায়ের ১৫৩
ইব্রাহীম ১৬২
ইসাবেলা ১৬৪
ইংল্যান্ড ১৬৪, ১৯৪
ইউসাব ১৬৮
ইতালী ১৬৯, ১৭৮, ১৮৩
ইজতিহাদ ১৮৫
ইবনে মাসুদ ১৯১
ইবনে হিশাম ১৯১

ঈ
ঈমান ৪৮
ঈসা (আ) ৩৯, ৫৪, ৬৫, ৭০
উ
উযযা ২৫
উসমান ২৯, ৩৫, ১২৩, ১৮৬
উৎবা ইবন রাবি'আ ৩১
উমাইয়া ইবন খালাফ ৩৩, ১৫৬
উমর ৩৫, ৭৮, ৯৩, ৯৬, ১০৫, ১৬৬
উম্মা ৪১, ৪৬
উমরা ৪৫
উমর ইবন আবদুল আযীয ৯৯
উফরা ১৫৫
ইউফ্রেতিস ১৬৩
উসামা বিন মুনকিদ ১৬৫
উপনিবেশবাদ ১৭৬, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০
উলুজ ১৮৫, ১৮৬

এ
একত্ববাদ ৩১
এড্রিয়াটিক ৭২
একনায়কত্ব ৯১
এইচ. জি. ওয়েলস ২২৬, ২২৭

ও
ওহুদ ৪৫
ওহী ৪৬
ওয়াসিল ইবনে আতা ১৩৯
ওয়াহশী ১৪৪

ক
কার্ল মার্কস ২৫
কমিউনিজম ২৫, ২২৫
কা'বা ২৬, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ১৫৫
কুরায়শ ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ১১৪, ১৩৩, ১৫১, ১৫২, ১৫৫, ১৫৭, ১৯৮, ২২০
কিয়ামত ২৯
কর্দফান ৫১

www.nagorikpathagar.org

কটর ৭২
কান্দাহার ৭২
কিলগ ব্রিয়াস্ত ২২৭
কিলগ ব্রিয়াস্ত প্যাক্ট ১১৫
কিন্দাহ ১৫৭
কায়রো ১৬২, ১৯৩
ক্রুসেডার ১২০, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭
কনস্ট্যান্টিনোপল ১৭৩, ১৭৪
কিয়াস ১৮৯
কোপরুলু ১৯৩
ককেশীয় ২১০

খ
খাদীজা ২৭, ২৮, ৩৭
খযরজ ৩৮, ৩৯, ১৮৬
খ্রীষ্ট ৪৪, ৯৫, ১৩৪
খুজা'অ ৪৪, ৫৬, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৪
খারেজী ৫৮, ১৩৯, ১৪০, ১৮১
খালিদ-বিন-ওয়ালিদ ৬১, ১২০, ১৪২, ১৫৪
খসরু (দ্বিতীয়) ৯৪, ৯৫, ১৯২
খালিদ আল-কাসরি ১৬২
খোরাসান ১৬৮
খুমস্ ১৮৫
খারাজ ১৮৬
খুফু ২২২

গ
গণতন্ত্র ৫২, ৯১
গ্যালিসিয়া ৬৫
গ্রানাডা ১৭৩, ১৭৪
গ্রীস ১৯৫

ঘ
ঘাসান ১৫৩

চ
চীন ২৪, ৯৯, ১৬০, ১৯৪
চেঙ্গিস খাঁ ৬৫, ৬৭, ১৪১

জ
জওহর লাল নেহেরু ২২৬, ২২৭
জিব্রাইল ২৮, ৩২, ৪৬
জর্দান ৪৫, ১৫০, ১৫৪, ১৫৫
জড়বাদ ৭৬
জনমত ৮১, ৮২, ৮৬, ১০৪, ১৭৪
জরোস্ট্রীয়বাদ ৯৫
জিযিয়া ১১৬, ১১৭, ১২০, ১৫৯, ১৬৩
জাতিসংঘ ১৩২, ১৩৩
জাওয়াফ ১৫৪
জাফর ইবনে আবু তালিব ১৫৪
জেরুযালেম ১৬৫, ১৬৭
জেন্না ডিওস ১৭৪
জার্মানী ১৮৩
জায়দ ইবনে আসলাম ১৯১

ট
টর আঁদ্রে ২৯
টলেডো ১৭১

ড
ডানজিগ ১৯৫
ডেনিসন রস ২৯
ডি. অহসন ১৭৩

ত
তওরাস ১৬১
তালহা ২৯, ৩৫, ১৮৬
তায়েফ ৩৭, ৪৫, ১৫১, ২০৫
তুরস্ক ৬৫, ৭২, ১৬৪, ১৭৯, ১৯৪, ১৯৫
তুয়ারেগ ৮৪, ৮৫
তুফায়লা ১৫৩
তাল্লাহ ১৫৩
তিহামা ১৫৭
তিউনিসিয়া ১৬১
তাহিরী ১৯৩
ত্রিপলিতানিয়া ৮৪

www.nagorikpathagar.org

থ

থেবিস ২২২

দ

দোযখ ৩০
দেবতা ৩১
দানিস্তার ৬৫
দানিয়ুব ৬৬
দামেশক্ ৯৩
দিদিল ইবনে আলী আল-খুজায়ী ৯৯
দারুল ইসলাম ১১৬, ১৪৫
দারুল সুলেহ ১১৬
দারুল হরব ১১৬, ১৪৫
দিল্লী ১৯৩

ধ

ধনতন্ত্র ১৮২, ১৮৩

ন

নূহ ৩০, ৫৪, ৭০
নুবা ৫১
নজদ ৭২, ১৫৭
নুরুদ্দিন মাহমুদ ৯৩
ন্যায়বিচার ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০৮, ১১৮
নজরান ১৫৭
নসর ইবনে হারুন ১৬২
নেপোলিয়ান ১৭৯
নেস্টোরিয়ান ১৬১
নরডিক ২১০
নীল নদ ২১৫

প

পৌত্তলিকতা ৩১, ৩৫, ৩৯, ৪১, ৪২ ৭১, ১২৪
পারস্য ৪৫, ৪৬, ৯৪, ৯৫, ১৬১, ১৮১, ২২৫
পোল্যাণ্ড ৬৫
পোল ৬৬
পোলিশ ৬৫
পিরেনিজ ৭১ ১৭০
প্রজাতন্ত্র ৯১
পাকিস্তান ১০১
প্যালেস্টাইন ১৫৩
পয়শিয়ার ১৭৩
পর্তুগীজ ১৭৮
পিরামিড ২১০, ২১৫

ফ

ফাতিমা ২৭, ১৯১, ১৯২
ফেজ্জান ৮৪
ফ্রান্স ১৪৪, ১৬০, ১৬৪, ১৬৯, ১৭৮, ১৭৯
ফ্রেডারিক বেক ১৫৩
ফারাওয়া ইবনে উমর-আল যোধামী ১৫৩, ১৫৪
ফুসতাত ১৬২
ফার্ডিন্যাণ্ড ১৬৪
ফ্রাইজিয়া ১৬৫
ফ্রাঙ্কিস ১৭৩
ফিনহল ১৭৩
ফ্রান্সিসকো স্যাভেরিও নিত্তি ১৭৮
ফিরাউন ২১০, ২১১, ২২২

ব

বন্দিগী ২৩
বার্নার্ড লুইস ২৩
বহুত্ববাদ ৩১
বনূ হাশিম ৩৪, ৩৭
বৌদ্ধ ৪০
বদর ৪২, ৬৩, ১৫১, ১৫২
বাইজেন্টাইন ৪৫, ৯৫, ১২০, ১৩৪, ১৫৩, ১৫৯
বিদায় হজ্জ্ব ৪৬
বাহরায়েন ১৫৭
বেসারাবিয়া ৬৫
বলকান ৬৫, ৬৬, ৭২, ১৭০, ১৯৪
বনূ-বকর ১৩৩, ১৫৬
বাইবেল ১৩৪
বনূ-নাদির ১৪২, ১৪৩
বনূ-কুরায়জা ১৪৩

www.nagorikpathagar.org

বুয়াইদ ১৬২
বনূ-তায় ১৬৩
বনূ-নুমায়ের ১৬৩
বনূ-তাগলিব ১৬৩
বডিসিন ১৭১
বেজিবাস ১৭৩
বার্মেকী ১৯৩
ব্যাবিলনীয় ২১৫

ভ
ভারত ১৪৪
ভিয়েনা ৬৫, ৬৬

ম
মু'আবিয়া ২৪, ৫৮
মক্কা ২৫, ২৬, ২৯, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪১,৪২, ৪৫, ৭২, ১১২, ১৪৪, ১৪৮, ১৫০, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭
মর্য়ম ৩৪
মহাত্মা গান্ধী ২২৬
মানবাধিকার ২৩০
মুত'ইম ইবন আদী ৩৮
মুহাজির ৩৯, ৪৩, ৪৫, ৭০, ৮০, ৮৩, ১০৫, ১১২, ১৮৬
মিসর ৪৫, ৫৭, ৬১, ৭২, ১০৮, ১৫৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৪, ১৯৩, ২১০, ২২৩
মুতা ৪৬, ১৫৩
মিনা ৪৬
মদীনা ৪৭, ১৪৮, ১৫১, ১৫৪
মূসা ৫৪, ৬৫, ৭০, ৭১, ১৪১
মেসোপটেমিয়া ৫৭
মলডানিয়ান ৬৬
ম্যাগাইয়ার্স ৬৬
মন্টিনিগ্রো ৭২
মিসুরাতা ৮৪
মারুর ইবনে সোয়াইদ ৮৮
ম্যাজিয়ান ১০০
মাওয়ালী ১১৩
মুসতামিন ১৩৯
মুতাজিলা ১৩৯
মালিক ১৪২
মাদিয়াত ১৫৫
মুতিম ইবনে আদিয়ে ১৫১
মুসান্না ১৬৩
ম্যানডেভিল ১৬৭
মুজারিব ১৭২
ম্যাক্সওয়েল ১৭৩
মাজদাক ১৮১, ২২৫
মালে-গনিমত ১৮৫
মামলুক ১৯৩
মেকিয়াভ্যালি ২০৭

য
যবুর ২১৬
যমযম ৪৩
যায়দ ৩৭, ১৫৪
যাকাত ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৩, ১১৪, ১১৮, ১৮৮
যিম্মী ৭৩, ১১৬, ১২০, ১২১
যীশু ৩৪, ৯৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৪১, ১৭৪

র
রাশিয়া ১৭৯, ১৮৩, ১৯৩
রামসেস ২২২
রাজতন্ত্র ৯১
রাবাহ্ ইবনে রাবিয়াহ ১৪২
রিন্ড ১৬৫
রোম ৪৫, ৯৪, ১৬০, ১৮১
রোমান ৪৬, ৯৪
রুমানিয়া ৬৫
রিয়াদ ৭২

ল
লরেন ১৯৫
লা'ত ২৬
লীগ অব নেশনস ৪১, ১১৩, ১১৫, ১৩৭, ১৯৫, ২০৮
লেন পুল ৪৪
লুইস ১৬৪

লোম্বার্ড গ্রুপ ১৬৫
লিবিয়া ১৭৮

শ

শিরক ৫৭, ৫৮, ৬০
শায়েখ-উল-ইসলাম ৬৬
শ্রেণী-সংগ্রাম ৯২, ৯৪, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৮, ১৯০, ১৯২
শালিমেন ৯৫
শাতিল-আরব ১৯৪

স

সালাত ২৩
সাহাবী ২৩
সিরিয়া ২৪, ৪০, ৪৫, ৭২, ১৫৩, ১৫৪, ১৬১, ১৬২, ১৬৪
সীজার ২৪, ৭৮, ৯৫, ১৯২
সিয়র ২৫
সাফা ৩০
সওর ৩৯
সুদান ৫১
সেলিম ৬৬
সেটিনজ ৭২
স্কোডার ৭২
সুলায়মান ৭৬
সুদ ৮৮, ৯২
সাম্য ৬৬, ৯১, ৯৪, ৯৬, ৯৭, ১০৮, ১১৭, ১৩৯
সাম্যবাদ ৯২, ১৮২, ১৮৩
স্বাধীনতা ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৯
সাসানীয় ৯৫
সেক্সন ৯৫
স্বৈরতন্ত্র ৯৯
স্পেন ৯৯, ১৬৪, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৩
সাবেইন ৯৯
সাকিফায়ে বনি সাইদা ১০৫
সালাহ্উদ্দিন ১২০, ১৬৭
সোহায়েল ইবনে আমর ১২৩
সেন্ট পিটার ১৩৪
সুফিয়ান ইবনে উমাইয়া ১৪৪, ১৫৬, ১৫৭
সেলজুক ১৪৮
সালমাওয়াহ ১৬২
সেন্ট ডেনিন ১৬৫

হ

হাশিমী ২৭, ৩১
হেরা ২৮
হিজরত ৩৯, ১৫১
হিন্দু ৪০
হাজেরা ৪৩
হুবল ৪৫
হাওয়াজিন ৪৫, ১৪৪, ১৫৭
হুনায়ন ৪৫, ১৪৪, ১৫৭
হিরাক্লিয়াস ৪৬, ১২০, ১৫৩, ১৫৪,
হুদায়বিয়া ৫৬, ১১৭, ১২৩, ১৩৩, ১৪৯, ১৫২, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮
হেমস্ ৬১, ১২০
হিমালয় ৭১, ১৭০, ১৯৪
হিলফ্ আল-ফুজুল ১৩১, ১৩২, ১৩৭
হামজা ১৪৪
হুন ১৬০
হিত্তিন ১৬৭
হেলফিরিচ ১৭২
হাসান ইবনে সাবিত ২০৫
হিকসস ২২২

য়

য়াহূদী ২৫, ৩৯, ৪১, ৫৪, ৭৩, ৯৯, ১১২, ১৪৪, ১৬৪, ১৭২, ২১৯
য়াছরিব ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৮২, ১১২, ১২৫, ১৪৬, ১৫১

ইফাবা—১৯৯৯-২০০০—প্র/১৪২৪ (উ)—৫,২৫০

www.pathagar.com

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ